বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর

পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

মোহাম্মদ শফিউল আযম

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, ভারত-৭৩৪ ৪৩০
আগষ্ট ১৯৯৮

Ref.
80.37
126673
10 AUG 1999

STOCK TAKING - 2011

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একটি দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আর একটি দেশে গবেষণা করতে স্বাভাবিক কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা। আমার গবেষণা কাজে নেমে সব চেয়ে বড়ো আনন্দের ব্যাপার হয়েছে, ভারতের মাটিতে কোথাও মনে হয়নি নিজেকে এক-জন বহিরাগত বা বিদেশী, উপরন্তু কোথাও কোথাও একজন বিদেশী বলে এবং আমার গবেষণা কর্মের বিষয়টির কারণে পেয়েছি বাড়তি সহযোগিতা, বাড়তি সুযোগ। যে আন্তরিকতা এবং যে সহযোগিতা লাভ করেছি পদে পদে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করলে নিজেকে ছোট মনে হয়। তবু মুদ্রিত করে রাখার জন্য শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করছি, প্রথমে আমার গবেষণাকর্মের নির্দেশক, যাঁর নির্দেশনা নয়, স্নেহ-আন্তরিকতায় এ গবেষণা কর্ম, বয়সের শাসন এবং নিজের সৃজনশীল লেখার বিঘ্ন ঘটিয়ে যিনি সময় দিয়েছেন সীমাহীন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ড. অমুকুমার সিকদার, তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা চিরদিনের জন্য।

এর পর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট, বিশেষতঃ রেজিষ্ট্রার তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাকে গবেষণা করার শুধু অনুমতি নয়, সার্বিক সহযোগিতার জন্য। এর পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. অংকুশ ভট্ট (যাঁর অমায়িকতা ভোলার নয়), এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক রিডার, বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, আমার বন্ধুবর, সাহিত্য-প্রেমী ড.পিনাকী চক্র-বর্তী এবং তাঁর স্ত্রী মুন্নি চক্র-বর্তী। এঁরা দীর্ঘদিন আমাকে জোর করেই রেখে দিয়েছিলেন ক্যাম্পাসে তাদের বাড়ীতে। এ ঋণ, এ স্নেহ, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দুর্লভ। তথ্য সংগ্রহে গিয়ে ব্যক্তি-গত সহযোগিতা পেয়েছি বিখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণের একমাত্র ছেলে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়(বাবলুদা) এবং তাঁর স্ত্রী মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের,

(তাদের দাবী, আমি এখন তাদের ফ্যামেলি মেম্বার), সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ছেলে উত্তম ঘোষের (দোলন দা'র), গোপাল হালদারের স্ত্রী অরুণা হালদারের, (রোগে শয্যাশায়ী এই বয়স্কা মহিলা পাটনা হতে আমাকে কয়েকটি দীর্ঘ পত্র দিয়ে তাঁর প্রয়াত স্বামীর উপন্যাস বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন) বারাসাতের গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষক, গোপাল হালদার গবেষক অমিয় ধর, হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা ড· বিনতা রায় চৌধুরীর। কাজের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড· ভবতারণ দত্ত।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড· মনিরুজ্জামান, ড·সৌরেন বিশ্বাস এবং অধ্যাপক চৌধুরী জহুরুল হকের উপদেশ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতার কথা আজ বার বার মনে পড়ছে। গবেষণাপত্রের অংশ বিশেষ দেখে পরিবর্তন, পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড· দিলওয়ার হোসেন (প্রয়াত), ও ড·আবুল কাসেম। এঁরা আমার জন্য কল্পনাতীত সময় দিয়েছেন।

এ ছাড়া উপদেশ পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড· আনিসুজ্জামান স্যারের কাছ থেকে, এঁদের সবার নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আমি আবদ্ধ।

কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে সর্বাগ্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। এর পর কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরী, কলকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্র, বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নিখিলেশ রায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড· মনিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড· আবদুল মান্নান - এঁদের সবার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জুলাই ১৯৯৮

— মোহাম্মদ শফিউল আযম

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur

সূচী পত্র

			পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা		...	১
প্রথম অধ্যায় :	পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব ইতিহাস	...	৬
দ্বিতীয় অধ্যায় :	পঞ্চাশের মন্বন্তর : কারণ ও পরিণাম - একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	...	৩০
তৃতীয় অধ্যায় :	মন্বন্তরের উপন্যাস - নান্দনিক সার্থকতা বিচার		
	মন্বন্তর	...	৫৭
	পঞ্চাশের পথ	...	৭২
	উনপঞ্চাশী	...	৮৫
	তেরশ পঞ্চাশ	...	৯১
	তিলাঞ্জলি	...	১১৮
	সর্বংসহা	...	১২৭
	চিন্তামনি	...	১৩২
	কালোঘোড়া	...	১৪১
	অশনি সংকেত	...	১৪৭
	সূর্য-দীঘল বাড়ী	...	১৬৭
	ক্ষুধা ও আশা	...	১৭২
	সংশপ্তক	...	১৯৯
	খেলার প্রতিভা	...	২১২
	আকালের সন্ধানে	...	২২৮
	কত ক্ষুধা	...	২৩২
উপসংহার		...	২৫০
পরিশিষ্ট		...	২৫৯
সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা		...	২৮১

ভূমিকা

বয়োজ্যেষ্ঠ কিছু লোকের মুখে তাদের জীবনের কথা শুনতে গিয়ে জানলাম পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মন্বন্তরের উপন্যাস সমূহ সংগ্রহ করে পড়তাম। মন্বন্তরের সমস্ত উপন্যাসে যেন এক করুণ রসের ছড়াছড়ি, পড়ে বিমর্ষ হয়ে যেতো মন। উপন্যাসের প্লট, চরিত্রকে ঢেকে চোখে ভেসে উঠতো বাস্তবতা। যেন চোখের সামনে দেখছি ১৯৪৩-৪৪এর সেই ভয়াবহ দুর্যোগ। এই উপলব্ধি সম্ভব হচ্ছে যে শিল্পীদের অবদানে তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টির এবং বাস্তবতার তুলনা করার আগ্রহ জাগে মনে। কাজে হাত দেয়া হলো 'বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর' শিরোনামে গবেষণা পত্রে। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম উপন্যাস নয়, বাস্তব বিষয়-টাই বড়ো,আমাদের কাছে নয়, সে শিল্পীদের কাছে, যাঁরা পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে তাঁদের উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁদের 'শিল্প'কেও বিশ্লেষণ করতে হবে তাঁদের দৃষ্টিতে, যেখানে শিল্প সার্থকতা বড়ো নয়, বাস্তবকে সব চেয়ে বেশী স্পর্শ করাটাই বড়ো। কেন এতগুলি মানুষের হনন ? কিভাবে তা ঘটেছিল ? কারা ঘটিয়েছিল ? শাসকদের, ব্যবসায়ীদের, শিল্পীদের, রাজনীতিবিদ্দের ভূমিকা তখন কি ছিল ? সমাজের কি পরিবর্তন ঘটল ? এ প্রশ্নগুলি এবং তার বিশ্বাসযোগ্য রূপ-দান ছিল ঔপন্যাসিকদের কাছে বড়ো। কোন মহাকাব্যের মতো পরিকল্পিত চরিত্র সৃষ্টি, বীরত্বগাথা বা মহাকাহিনী সৃষ্টি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে উপন্যাসে ধরা দিল সাধারণ অসহায় গরীব মানুষ, তাদের জীবনের কাহিনী-যারা সমাজের সাধারণ অবহেলিত শ্রেণী, সে সব হাভাতেদের হত্যার পদ্ধতি, প্রস্তুতি এবং রূপায়ণ। এর সাথে কোন কোন উপন্যাসে এসেছে সে কলংকময় ঘটনা সংশ্লিষ্ট চরিত্র এবং ঘটনার নায়করা। অতএব শিল্পীদের অনুকরণে তৈরী করা হল এ গবেষণা পত্রের অধ্যায় এবং অনুসন্ধিৎসু বিষয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে পঁচিশ-ত্রিশ জন কথা-শিল্পীর শতাধিক গল্প রয়েছে। পরিমাণের দিক থেকে রচিত কবিতা ও গল্পের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, প্রবন্ধ এবং চিত্রকর্মও এতো বেশী সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের জানা মতে, ইতিহাসের অন্য কোন বিষয় নিয়ে এত পরিমাণগত সৃষ্টি প্রাচুর্য নেই।

কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখি, সাহিত্যের অনেক শাখা প্রশাখার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা হলেও সাহিত্যের গবেষণা শাখায় পঞ্চাশের মন্বন্তর গুরুত্ব পায়নি। ভয়াবহ এ মন্বন্তর নিয়ে রচিত শিল্প-ভান্ডার প্রাচুর্যে ভরপুর সত্ত্বেও আমরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাই সমালোচনার ক্ষেত্রে, পঞ্চাশের মহামন্বন্তর ও বাংলা ছোটগল্প নামে মানস মজুমদারের একটি ছোট গ্রন্থ। এছাড়া তাঁর তত্ত্বাবধানে বিনতা রায় চৌধুরীর এক মাত্র গবেষণা কর্ম পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য। সন্দেহ নেই বাংলা গবেষণা কর্মে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সাহিত্য নিয়ে এ আলোচনা 'প্রথম সৃষ্টি'। তবে এ বিষয়ের সমস্ত শিল্পকর্মকে তাঁর গবেষণার বিচরণভূমি করার কারণে হয়ত, আমরা তার আলোচনায় এক ধরণের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করি। আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে দুই বাংলার বারজন ঔপন্যাসিকের চৌদ্দটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হল। ড. বিনতা রায় চৌধুরীর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের উপন্যাস বিষয়ক অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের অনেকগুলি স্থান পায়নি বা নামমাত্র আলোচিত হয়েছে। বিশেষত পূর্ব-বাংলার উপন্যাস ছিল তাঁর কাজের বাইরে। ভুলবশত বাদ পড়েছে (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় বলেন) কমলকুমার মজুমদারের রচিত উপন্যাস 'খেলার প্রতিভা'। তবু প্রশংসা করতে হয়, তাঁর দুঃসাহসের। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে রচিত সমস্ত 'সাহিত্য কর্ম'কে গবেষণার বিষয় করার জন্য। এ ছাড়া আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর রচিত সাহিত্য নিয়ে পত্র পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ, গ্রন্থ সমালোচনা এবং রচনা সংকলনে সম্পাদকের বক্তব্য ইত্যাদি লাভ করি। পঞ্চাশের মন্বন্তর অর্ধশতাব্দীকাল আগে ঘটে গেলেও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত উপন্যাস বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে কোন প্রণালীবদ্ধ গবেষণা অদ্যাবধি হয় নি। আমরা এই গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়টিকে গবেষণার বিষয় করেছি। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্বের ইতিহাস, এ মন্বন্তরের কারণ, পরিণাম এবং এ প্রসঙ্গে রচিত উপন্যাস। বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে শৃংখলাবদ্ধ ভাবে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আলোচনা করা হল। আমরা একটা আবিষ্কারে পৌছেছি। আবিষ্কারটি হচ্ছে, উপন্যাসগুলির নান্দনিক সাফল্য-ব্যর্থতা নয়, একটি বিশেষ কালের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে ঔপন্যাসিকেরা সমাজের বিবেক হিসাবে কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এর পাশাপাশি লাভ করেছি

ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে এ মন্বন্তরের যে কারণ সম-সাময়িককালের রচিত উপন্যাসে পাওয়া যায় - পরে অনুসন্ধানী গবেষকদের সাথে তার অদ্ভুত মিল। এই আবিষ্কার আমাদেরকে বিস্মিত করে।

এ গবেষণা পত্র বিন্যস্ত তিনটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে এসেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্বের ইতিহাস। এ অধ্যায়টির প্রয়োজনীয়তা এ কারণে, এক দিনে হঠাৎ করে দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর আসেনি। এর জন্য বিশাল একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, ঔপন্যাসিকরাও উপলব্ধি করেছেন এই বিষয়টা। ফলে মন্বন্তরের কাহিনী বর্ণনায় তাঁরা উপকরণ খুঁজেছেন বা ফ্লাশ ব্যাকে চলে গেছেন মন্বন্তরের আগের অর্থাৎ পূর্বের পরিস্থিতিতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণ, ফলাফল এবং এগুলির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। এ অধ্যায়টির প্রয়োজনীয়তা এখানে, উপন্যাসেও কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে এসেছে এগুলি, বাস্তবের সাথে উপন্যাসে রূপায়িত ঘটনার তুলনা করার জন্য এ অধ্যায়টি পড়া যেতে পারে। এখানে লক্ষণীয়, বিভিন্ন উপন্যাস বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে, তার কিছু কিছু মন্বন্তর চলাকালীন বা পরপরই রচিত হয়েছে যখন মন্বন্তরের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা অনুসন্ধান এবং ফলাফল প্রকাশ হয়নি। এ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের অনুভূতি পরে বাস্তব দলিলের সাথে মিলে যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে এসেছে মন্বন্তরের উপন্যাস সমূহের নান্দনিক সার্থকতা বিচার। লেখকের উপলব্ধির বিশ্লেষণ, চরিত্রসৃষ্টির কৌশল এবং উপন্যাসের নির্বাচিত বিষয় বা কাঁচামাল, এবং প্লটের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা। প্রসঙ্গে যোগ হয়েছে মন্বন্তরের উপন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য। এর সাথে একটি কথা বলা দরকার, মন্বন্তরের উপন্যাসগুলিতে মন্বন্তর নায়ক বিষয়টা প্রধান হলেও মন্বন্তরটা সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়ায়। ফলে ঔপন্যাসিকরা প্রায় উপন্যাসে ঘটনা এবং চরিত্র দুটোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচনার সময়ও আমরা লক্ষ্য রেখেছি এই দুই বিষয়ের প্রতি।

পরিশেষে উপসংহারে দেয়া হল উপন্যাস সমূহের মধ্য থেকে আহরিত লেখকদের দৃষ্টির সম্মিলিত রূপ, মন্বন্তর সম্পর্কে ধারণা। শুধু সাহিত্য নয়, ইতিহাস

সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোড়িত 'মন্বন্তর' সংঘটিত হওয়ার মূল উৎস ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সমস্ত বিশ্লেষণের পর উপলব্ধিতে। মন্বন্তর এখনো পৃথিবীতে বিচরণ করছে। আমাদের দেশে এখন নিজেদের সরকার। কিন্তু এখনো সংকট সৃষ্টি করে মজুতদাররা, এখনও রয়ে গেছে দরিদ্র মানুষদের উপেক্ষা, অবহেলা করার নীতি, কিংবা বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ অঞ্চলের প্রতি তোষণ নীতি। এখনো গণতান্ত্রিক দেশে শ্রমের মূল্য বৈষম্য মূলক। বেলাল চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয়, "সীমান্তের এপারে ওপারে দুই বাংলাতেই অসংখ্য মানুষ এখনও ক্ষুধা পীড়িত। অশিক্ষা, অপুষ্টি ক্ষুধা এবং আদিব্যাধি এখনও অগণিত মানুষের জীবনে ছায়ার মতো সঙ্গী। সুতরাং তেরোশ পঞ্চাশকে আমরা ভুলি কেমন করে"। (ভূমিকা, লঙ্গরখানা)। এ ছবি শুধু আমাদের ঘরে আমাদের সমাজে আমাদের দেশে নয়, বর্হিবিশ্বেও দেখি একই ছবি। আমাদের শ্রেণীরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। তাই "ইথিওপিয়া, সুদান, সোমালিয়া - আফ্রিকার মানুষ যখন ঝাঁকে ঝাঁকে মরেন, তখন আমরা তেরোশ পঞ্চাশের কথা স্মরণ না করে পারি না। কাগজে কাগজে কিংবা টেলিভিশনে ছবি যখন দেখি তখন শিউরে উঠে ভাবি এই সব কঙ্কাল কি আমাদের অনাত্মীয় ? তেরোশ পঞ্চাশে আমাদের অন্য প্রজন্মের মানুষ কি এভাবেই ক্ষুধার শিকার হন নি ?"(বেলাল চৌধুরী: তদেব)। আমরা অপেক্ষা করে আছি কখন সম্পদের, বিশেষ করে মৌলিক অধিকারের সুষম বন্টন ব্যবস্থা হবে ? কখন মানুষ বিশ্বের সমস্ত মানুষের ক্ষুধা, অপুষ্টির সংকটকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য তার মেধা, প্রযুক্তি, অর্থ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করবে। মার্কিন গবেষক পল-আর-গ্রীণো. পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় মানব সভ্যতার যে রূপ দেখে ভারতকে 'অন্নদাতা কর্তৃক পোষ্যদের ত্যাগ' তত্ত্বে বন্দি করলেন কখন আমরা তার বিপরীত অবস্থা দেখব। আজকের যুগেও আমাদের দেখতে হচ্ছে, "উত্তর কোরিয়ার-ক্ষুধার্ত মানুষ মানুষের গোশত খাচ্ছে"।(সূত্র-প্রবাহ, দৈনিক যুগ-কণ্ঠ'র ম্যাগাজিন, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৮, ঢাকা)। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে এসেও দুর্ভিক্ষ ইচ্ছামত দাপট দেখিয়ে যায় ১৯৬০এ কঙ্গোতে, ১৯৬৮, ৭৩ এবং ১৯৮৩ তে দা সাহেল এবং পূর্ব দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৯৭২-৭৩এ ইথিওপিয়ায়, ১৯৭৪এ বাংলাদেশে, ১৯৭৫এ কাম্পুচিয়ায়। এ সব দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর পরিমাণও ভয়াবহ।

মন্বন্তর সমাজের স্পর্শকাতর বিষয়। যেখানে দুর্ঘটনায় সামান্য কিছু প্রাণ হত হলে আমরা ভাবি, দুঃখ প্রকাশ করি, সেখানে সামান্য কিছু মানুষের লোভে এখনো দুর্ভিক্ষ হয়। এখনো মানুষ অনাহারে মরে, আমরা সভ্য মানুষরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। এ গবেষণা পত্রে বিশ্লেষণের পরিশেষে দেখা গেছে, শিল্পীরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য মানুষকে চিহ্নিত করেছেন, আমরা জানলাম মানুষই মানুষের হত্যাকারী। শিল্পীরা শিল্পের মধ্য দিয়ে ধরে রেখেছেন সে কলংকময় ঘটনা। জানিয়ে রেখেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য। হয়তো আগামী দিনে সতর্কতার জন্য। তাঁদের সহানুভূতিশীল হৃদয় প্রভাবিত করে আমাদেরও। এ গবেষণা পত্রের ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ এই 'মানুষ হত্যাকারী' থেকে আজকের এবং আগামী দিনের মানুষকে বাঁচানোর জন্য দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণে পূর্ব সতর্কতা কামনা করি।

শ্রদ্ধাসহ -

বিনীত

(মো. শফিউল আযম)

প্রথম অধ্যায় ঃ

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে বুঝানো হত সর্বদা বিদেশী শাসকদের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র।" [১]

বস্তুত ভারতবর্ষের বিদেশী শাসন, ভারতবর্ষকে ঘোর অন্ধকার এবং আতঙ্কের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যেখানে দেশের মানুষের সুখ দুঃখ চাপা পড়ে আছে। হুসেন শাহী যুগ থেকে বাংলায় পর্তুগীজরা বাণিজ্য করতে আসে। ক্রমে পর্তুগীজ বণিকদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর কাসিম খান জুয়িনকে বাংলার সুবেদার করেন। কাসিম খান শক্ত হাতে পর্তুগীজদের দমন করেন। এরপর কাসিম খানের মৃত্যু হলে শাহজাহান তার দ্বিতীয় পুত্র সুজাকে বাংলার সুবেদার করে পাঠায়। তখন ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী শাহ সুজার কাছ থেকে বাড়তি সুযোগ লাভ করেছিল, এবং বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ঔরঙ্গজেব সুজাকে আক্রমণ করে পরাজিত করে মীর জুমলাকে বাংলার সুবেদারের দায়িত্ব দেন। যে পর্তুগীজদের পথ ধরে ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল সে পর্তুগীজ জলদস্যুদের ঠেকাবার জন্য ইংরেজদেরকে হাতে রাখতে চাইলেন ঔরঙ্গজেব। উদ্দেশ্য ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কিন্তু জলদস্যুদের ঠেকাবার জন্য যে জলদস্যুদের ব্যবহার করার চিন্তা ঔরঙ্গজেব করলেন, পরবর্তীকালে সে জলদস্যুরা যে সুযোগ পেলে লুটতরাজ করবে তাতে সন্দেহ কি ? এ বিষয়টা ভাবেন নি ঔরঙ্গজেব। তা ছাড়া পর্তুগীজদের দমানো একক ভাবে মোগলদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। মোগলরা ছিল স্থল যোদ্ধা। যে সময় ইব্রাহীম খাঁ চার্নককে মাদ্রাজ থেকে বাংলায় পুনরায় ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন আগের মত সুযোগ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তখন ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে ইব্রাহীম খাঁ যে একেবারে অজ্ঞ তা নন। কারণ এর পূর্বে শায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরেজরা লুট করেছে হুগলী। দখল করেছে বালেশ্বর। শায়েস্তা খাঁ কাশেম খাঁকে দিয়ে চার্নকের হিজলীর ডেরাকে আক্রমণ করিয়ে ছিলেন। সুচতুর শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৮ পর্যন্ত বাংলার সুবেদার হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় শায়েস্তা খান বাংলা থেকে জলদস্যুদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করেন, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাত থেকে বাংলা মুক্ত করেন এবং ইংরেজদেরকে বাংলা সুবা থেকে বিতাড়িত করেন।

ইংরেজদের সম্পর্কে বাদশা ঔরঙ্গজেবের মনোভাবটা নরম টের পেয়ে ইব্রাহীম খাঁ মাদ্রাজ থেকে পুনরায় ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন চানর্ককে। আগের মতোই সুযোগ সুবিধে দেবেন ব্যবসার। আগের মতই বছরে তিন হাজার টাকার খাজনা। চানর্ক ফিরে এলেন।

১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। ১৭১০ সালে বাংলার দেওয়ান হয়ে ফিরে আসেন মুর্শিদকুলি খাঁ। ১৭১২ সালে মৃত্যু হয় সম্রাট বাহাদুর শাহ'র। ১৭১৩তে ফারুক শিয়রের ছেলে আজিমুস্সান বসল দিল্লীর সিংহাসনে অনেক রক্তারক্তি করে। কলকাতায় ইংরেজরা ততদিনে বেশ জেঁকে বসেছে। মুর্শিদকুলি খাঁ সিদ্ধান্ত নিলেন ইংরেজদের দাপট তুলে দেবেন। কিন্তু সে সুযোগ মুর্শিদকুলি খাঁ পেলেন না। ইংরেজরা ফারুক সিয়রকে ষোল হাজার টাকা ঘুষ জুগিয়ে মাত্র ষোলশ টাকা দিয়ে কিনে নেয় সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা এ তিনটি গ্রাম। সওদাগর ইংরেজরা এবার হয়ে গেল জমিদার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা কিন্তু জমিদারী চায়নি, তারা চেয়েছে ব্যবসা। জমিদারি কেনার খবরটা যখন লণ্ডনে গিয়ে পৌছল কোম্পানীর কর্তারা তুষ্ট হয়নি, জানালেন, জমিদারিটারি বাদ দিয়ে ব্যবসায় মন দাও। কলকাতার ইংরেজরা সে কথায় কান দিলেন না। কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টসের কাছে লক্ষ্য ছিল সব সময় ব্যবসা। কিন্তু তাদের পাঠানো লর্ড – গভর্ণররা চেয়েছে সব সময় ক্ষমতা। কোম্পানীর লক্ষ্য ব্যবসা, কর্মচারীদের লক্ষ্য ক্ষমতা, দুই লক্ষ্যের শিকার হয়ে ভারতবর্ষ হয়েছে একদিকে পরাধীন, অন্যদিকে নিঃস্ব। ইংরেজদের দুর্গ, কামান, কুঠি, অর্থ ভাবিয়ে তুললো নবাব আলিবর্দী খাঁকে। সচেতন আলিবর্দী খাঁ সতর্ক করে দিলেন দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকেও। সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের দৌরাত্মকে শায়েস্তা করতে আক্রমণ করলেন ফোর্ট উইলিয়ামকে। কলকাতা থেকে উৎখাত করলেন ইংরেজ দাপট। এর কিছু দিন পর মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলেন কর্ণেল ক্লাইভ। সিরাজের সাথে টেক্কা দিতে। সিরাজের তখন ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু, ষড়যন্ত্রী ক্লাইভ পদে পদে উৎকোচ এবং প্রলোভন যুগিয়ে ইংরেজদের ভিত্তি শক্ত করলেন বাংলার বুকে। তরুণ সিরাজ পরাজিত হয় পলাশীর মাঠে ক্লাইভ এবং মীরজাফরের মিলিত চক্রান্তে। পলাশীর প্রান্তরে একটা যুদ্ধের নাটক করে ইংরেজ শাসনের বীজটি প্রথম বপন করে দেয় ক্লাইভ। বাংলার ক্ষমতায় আসে মীর জাফর। নামে মাত্র। ক্ষমতার মূল চাবি কাঠি ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের আগমণ মুনাফা লাভের অভিপ্রায়ে। কিন্তু তারা এদেশে এসে লক্ষ করে এদেশে শাসক এবং শাসন দুয়েরই ব্যাপক ভাঙন চলছে। সুযোগ দেখে জেগে উঠে তাদের সাম্রাজ্যবাদী মন। প্রথম দিকে ইংরেজরা সাহস করেনি ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করতে। ভারতবর্ষের তখন তহবিল প্রায় শূন্য। দীর্ঘকাল হতে মোগলের সৈন্যরা বেতন ভাতা না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপর দিকে এ সুযোগে সাম্রাজ্যের সুবেদার, জায়গীরদার, কর আদায়কারী জমিদার, গোমস্তার দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের আশায় মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। এসময় খাজনা এবং করের অংশ রাজকোষে না পৌঁছলেও সাধারণ জনগণ এবং কৃষকের উপর করের পেষণ ঠিকই ছিল। এবং বর্ধিত হচ্ছিল ক্রমান্বয়ে। এমনকি এর সাথে যুক্ত হয় - সুবেদার, জায়গীরদার, জমিদার এবং আমলা কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন। ফলে মোগল শাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের শেষ আস্থাটুকুও বিলুপ্ত হয়। এসময় ইংরেজ শক্তির জয়লাভ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এ দেশের বৃহৎ গোষ্ঠী সাধারণ জনগণ পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ নবাবের যুদ্ধের সাথে যে পরাধীনতা এবং তাদের ভাগ্য বিপর্যয় জড়িত তা তাদের চেতনায় আসে নি। তাই পলাশীর মাঠে একটা যুদ্ধের অভিনয় করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অতি সহজে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও বিহারের ক্ষমতা দখল করে বসে।

সিরাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

> "রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্বে বণিক পক্ষের গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নত চরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার প্রতারণার উপরে তাহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা, রাজোচিত মহত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। তাই ম্যালিসন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'সেই পরিণাম দারুণ মহা নাটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাই এক মাত্র লোক, যিনি প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই"।[২]

সিরাজদ্দৌলা ছিলেন বাংলার মূলত শেষ নবাব। কারণ সিরাজুদ্দৌলার পরে মীরজাফর থেকে ওয়ারেশ আলী পর্যন্ত যারা নবাব ও নাজিম ছিলেন, তারা ছিলেন নামের নবাব। মীর-কাসেম অবশ্য স্বাধীনতাপ্রিয় এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন।

ভারতীয় সাম্রাজ্যে ইংরেজ শক্তির আবির্ভাবের মূলে পলাশীর যুদ্ধ বড়ো নয়। এর মূলে ছিল এদেশের শাসকদের এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পরস্পরের সাথে হানাহানি। যার ফলে বিদেশী ইংরেজের উন্নত শক্তির আক্রমণের প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো ছিল না। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্স বলেছেন -

"মোগল সম্রাটের সামন্ত প্রতিনিধিরাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতা চূর্ণ হয় মারাঠাদের হাতে, আর মারাঠা শক্তি চূর্ণ হয় আফগানদের দ্বারা। এই ভাবে যখন সকলেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন বৃটিশ শক্তি দ্রুত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া সকলকেই পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যাহা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিভক্ত নয়, এদেশটা বিভক্ত গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জাতিতে। ইহা এমন একটা সমাজ, যাহার কাঠামোটা যে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ভারসাম্যের সৃষ্টি ঐ সমাজের সকল সত্যের একটা অবসাদগ্রস্ত বৈরাগ্য ও চরিত্রগত সুতন্ত্রতা হইতে। কোন বৈদেশিক শক্তির পর - রাজ্য-লোলুপতার শিকারে পরিণত হওয়া সেই দেশ ও সেই সমাজের বিধিলিপি না হইয়া কি পারে ?" [৩]

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ইংরেজদের আগমনটা আকস্মিক। পলাশীর যুদ্ধের আগে ইংরেজদের সাথে মীরজাফরের গোপন চুক্তি হয়। সে চুক্তি অনুযায়ী মীরজাফর চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যান। ইংরেজদের চাহিদা মত অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে নতুন গভর্নর ভেন্সিটার্ট মীর জাফরকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসায় মীরকাসেমকে। মীর কাসেম গোপন চুক্তি অনুযায়ী পূর্বের শর্তমত অর্থ কোম্পানীকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার জমিদারীও ইংরেজদের দিয়ে দেয়। ইংরেজরা মীরজাফরের মত মীরকাসেমকেও পুতুল নবাব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মীরকাসেম ছিলেন কিছুটা স্বাধীনচেতা, ফলে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বাধে, মীরকাসিমের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজরা অনেক সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে দ্বিতীয় বারের মত মীরজাফরকে সিংহাসনে বসায়। এর পর ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফরের পুত্র নজমুদ্দৌলাকে ইংরেজরা বাংলার মসনদে বসাবার সময় চুক্তি করে - বাংলার সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা থাকবে 'নায়েব-ই-নাজিম'

উপাধিধারী একজন মন্ত্রির হাতে আর তার নিয়োগ এবং অপসারণ করার পুরো ক্ষমতা থাকবে ইংরেজদের হাতে। এভাবে বাংলার প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে।

রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয় বারের মত বাংলার গভর্ণর হয়ে আসার পর সরাসরি বাংলার ক্ষমতায় বসার ব্যবস্থা করেন। বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে এবং বাংলার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য নবাবকে তিপ্পান্ন লাখ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইংরেজরা সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা খান নামে এক রাজস্ব বিশারদকে নায়েব-ই-দেওয়ান হিসাবে নিয়োগ করে। রাজস্ব আদায়ের দায় দায়িত্ব তার, কিন্তু রাজস্বের হার বাড়ানো কমানোর অধিকার বা দায়িত্ব কোম্পানীর। অধিক অর্থ আদায়ের জন্য বাংলার সাধারণ কৃষকের উপর নেমে এল অত্যাচার। ক্লাইভ এদেশের প্রথম শ্বেত নবাব। ক্লাইভকে শাসক বলা যায় না। কারণ শাসক কর নিতে পারে, উৎকোচ নয়। কিন্তু ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধে বেশ কিছু সৈন্য এবং অস্ত্র ভাড়া দিয়েছে মীরজাফরকে এবং নিজেও ভাড়াটে সেনা নায়ক সেজেছে। তার ভাড়া প্রদানে নবাবের রাজকোষের অবস্থা হয় কাহিল। ক্লাইভ এদেশের শাসন মঞ্চে অবতীর্ণ হয় দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক হিসেবে।

"পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ মীরজাফরের নিকট হইতে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করিয়া ক্লাইভ রাতারাতি ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন বলিয়া গণ্য হইল। মীরজাফরের নবাবী লাভের 'ইনাম' স্বরূপ ইংরেজ কর্মচারীরা লাভ করিল চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী ও নগদ ৩০ লক্ষ পাউন্ড। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অবাধে চলিল কোম্পানীর শ্বেত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসায়ের নামে কোম্পানীর অবাধ লুণ্ঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজ পার্লামেন্ট দ্বারা নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতেই দেখা যায় যে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার হইতে মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল।" [৪]

শুধু ক্লাইভ নয়, যে যেদিকে সুযোগ পেয়েছে মুনাফা অর্জনের কিংবা উৎকোচ গ্রহণের সামান্যতম ও বিবেকের দ্বারস্থ না হয়ে তা কাজে লাগিয়েছে। তৎকালীন শাসক গোষ্ঠির এমন অমানবিক মানসিকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভারতবর্ষের দুর্নীতির প্রচলন এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগ। এর সুদূরপ্রসারী ফল একটার পর একটা মন্বন্তর ডেকে এনেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শোষণ অর্থনীতি, বিভিন্ন মন্বন্তরের একটা পরোক্ষ কারণ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন এবং মুসলমান শাসনের মাঝে একটি পার্থক্য বিদ্যমান। মুসলমান শাসকরা এদেশকে যে শুধু শাসন করেছে তা নয়, তারা এখানে বসতি স্থাপন করেছে। এখানকার সংস্কৃতি হয় গ্রহণ করেছে, নয় তাদের সংস্কৃতি এখানে চালু করেছে। তাদের দ্বিতীয় কোন দেশ ছিল না, যেখানে তারা সম্পদ পাচার করতো, এদেশকে ধ্বংস করে সে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করতো। ফলে এমনকি মোগল যুগেও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতা নেওয়ার পরে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ধ্বস নামে। কারণ তাদের ছিল এটা উপনিবেশ। তাদের প্রথম দিকের শাসনকালকে শাসন না বলে শোষণ কালই বলা যায়। তারা এ সময়ে দু হাতে লুঠ করেছে এদেশের কাঁচামাল। ধ্বংস করেছে এদেশের অনেক দিনের পুরনো কুটির শিল্প। যার পরিণাম ইংরেজ শাসনের মাত্র দশ বছরেই দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যার নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬)। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নিয়ে খুব বেশী বই নেই। সাহিত্যে মাত্র একটি উপন্যাস তার পটভূমিকায় রচিত। এটি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'। কিন্তু এটা অনেক পরে রচিত, কারণ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখা জন্ম লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৩৮ সালের ২৬শে জুন বাংলা ১২৪৫, ১৩ই আষাঢ়। বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। দীর্ঘ দিন পরে ১৮৮২ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' আমাদেরকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং বাংলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মর্মান্তিক ঘটনা পটভূমিতে রেখে 'আনন্দমঠ' রচিত হয়েছিল।

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহতার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা উপন্যাসটিকে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদায় রূপায়িত করেছে। দুর্ভিক্ষের

এবং মৃত্যুর যে চিত্র আনন্দমঠের ক্যানভাসে চিত্রিত তা পাঠককে দীর্ঘদিন পরে মন্বন্তরের বেদনা সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্কিমের বর্ণনাটা এরকম —

"গ্রাম খানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখিনা। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লিতে পল্লিতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচু অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখিনা, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখিনা, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা — তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায় — সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ু প্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্ল-কুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল। যে কিছু চৈত্রফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ

রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, নাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিত। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে ? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায় খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইঁদুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পালাইল, যাহারা পালাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।" [৫]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে বঙ্কিমের আনন্দমঠ একটা ঐতিহাসিক দলিলের ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ শাসনে বসে ইংরেজের রাজ কর্মচারী হয়ে বঙ্কিম দুর্ভিক্ষের কারণটার উপর ইংরেজ শাসকের দায় তথাগতভাবে কোন রূপ রেখাপাত না করালেও তার ভয়াবহতাটা জীবন্ত ভাবে চিত্রিত করেছেন। বঙ্কিম Hunter এর Annals of Rural Bengal গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। Hunter ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল ঐতিহাসিক সত্য এবং সন্দেহাতীত। হান্টার-এর দুর্ভিক্ষের বিবরণ ছিল লোমহর্ষক, কিন্তু অতিরঞ্জিত নয়। Hunter মন্তব্য করেছেন -

"All through the stifling summer of 1770 the people went on dying ... they devoured their seed grain, they sold their sons and daughters, till at length no longer than any children could be found, they ate the leaves of trees and the grass of fields!" [৬]

আনন্দমঠ বঙ্কিমের একমাত্র উপন্যাস যেখানে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শোষণের - একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের মত আনন্দমঠও একটি উদ্দেশ্যমূখী রচনা, যদিও শোষকদের প্রতি আক্রমণটা নীল দর্পনের মতো অতোটা সরাসরি নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে প্রথম সফল ঔপন্যাসিক, যিনি উপন্যাসের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়েছেন। উপন্যাসের প্রকৃত বাস্তববাদিতার লক্ষণ আনন্দমঠ-এ পরিলক্ষিত।

"আনন্দমঠ বঙ্গদর্শন পত্রিকার চৈত্র ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং সে বৎসরই অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৮২ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম তখন ১৮৮০ ইংরেজী ৬ই নভেম্বর থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের - পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট - ১৮৮১ ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর ১৮৮১ ইংরেজী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ত্রিশ বছর এক মাস বঙ্কিম সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন, লক্ষ করলে দেখা যাবে, বঙ্কিম আজীবন প্রায় একই পদে কাজ করে গেছেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মাত্র ভারতীয় হবার জন্য কর্মক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ পদোন্নতি ঘটেনি, তাঁর অকাল অবসরের একটি কারণ সম্ভবত কর্তৃপক্ষের এই অবিচার, তাছাড়া তার স্বাধীনতা প্রিয়তা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ইংরেজ সরকারকে খুশী করে নি, তাই তিনি স্বেচ্ছায় কর্ম থেকে অবসর নিয়েছিলেন।" [৭]

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের একটা ভূমিকা রয়েছে। আঠারো শতকের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' এবং 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'এ উপন্যাসের পটভূমি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যারা দেখেনি এবং যারা ইতিহাস এবং রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু সাহিত্য পিপাসু, তাঁরা 'আনন্দমঠ' পাঠে ব্রিটিশের স্বরূপ উপলব্ধি

করে। এ ছাড়া 'আনন্দমঠ' লেখার প্রায় ছয় বছর আগে রচিত জাতীয় চেতনার বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম' গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এ গানটি পরবর্তী কালে নানা বিতর্ক তুলেছিল, গানটি প্রসঙ্গে ড.বিষ্ণু বসু বলেছেন -

"একটি মাত্র গানকে কেন্দ্র করে একটি জাতির জীবনে এমন বিচিত্র তরঙ্গ সম্ভবত আর কোন দেশে দেখা যায়নি। গানটি বঙ্কিমের খুব প্রিয় ছিল। তিনি মনে করতেন গানটির গুরুত্ব সমকালের মানুষ ঠিক মতো না বুঝলেও ভবিষ্যতের বাঙালী উপলব্ধি করবে, অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে - 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপযুক্ত পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়ে গানটি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, এ উপন্যাসের জনপ্রিয়তার মূলে এ গানটির অবদান খুব কম নয় — কেউ কেউ বললেন, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রটি নাকি 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' নায়করা উদ্ভাবন করেছিলেন, এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র এ মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেই তার দেশ মাতৃকার বন্দনা করেছিলেন।" [৮]

মূলত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'আনন্দমঠ' ভারতীয়দের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বঙ্কিম উপন্যাসটি দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ করেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর নীলকর সাহেবদের, এবং তাদের স্বজাতিদের অত্যাচারের চিত্রেরই আরেকটা পিঠ 'আনন্দমঠ'। চাষীদের নীল সাহেবরা যখন জোর করে ধানের এবং ফসলের পরিবর্তে নীল চাষে বাধ্য করে নামমাত্র মূল্যে নীল খরিদ করতো তখন - সে কৃষকের অর্থনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি খাদ্যের উৎপাদন কমে এলাকায় স্থায়ী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়, যার ফলে আমরা দেখি ছিয়াত্তরের মনন্তরের পরেও একটার পর একটা মনন্তর এ উপমহাদেশে লেগেই ছিল। 'আনন্দমঠ'এ ঐতিহাসিক অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন -

"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই, তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্য কুল কলঙ্ক মীর জাফরের উপর, মীর জাফর আত্মরক্ষায়

126673 10 AUG 1999
Bengal Library Raja Rammohunpur

অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ? মীর জাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে, বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য, কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাহারা এক এক কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" ৯

তবে এখানে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। কারণ ১৭৬৫ সালে মীর জাফর মারা যায়। অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মীর জাফর ছিল না। কিন্তু বঙ্কিম বলেছেন, মীর জাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। এ কথা বঙ্কিমের ভুলবশত হতে পারে আবার ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। কারণ মীর জাফরের উপর বাঙ্গালীর ক্রোধ প্রকাশ করতে বঙ্কিম মীর জাফরের দায়িত্বহীনতা উপস্থাপন করেছেন হতে পারে। তবু চাকরি সূত্রে বঙ্কিম ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভয় করবার সঙ্গত কারণও ছিল। 'আনন্দমঠ'এ বঙ্কিম ইংরেজদেরকে শত্রু না বলে মিত্রই বলেছেন তাই।

"এ ছাড়া বঙ্কিম জানতেন যে, অস্ত্র সুসজ্জিত রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন। এ বাহিনী যে সমাজের অভ্যন্তরে থাকবে তা সম্ভব নয়, শাসকরা তাকে কখনো টিকতে দেবে না, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের তাই অরণ্যেই থাকতে হবে। অসাধারণ সাহিত্যিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আরণ্যক অবস্থানকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ভক্তি করতে হলে ভক্তির যোগ্য বীরও আবশ্যক। সেই বীরও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সেই বীরে অলৌকিক মহিমা ও আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে কোন চূড়ান্ত বিজয়ে উত্তীর্ণ হতে তিনি দেখালেন না।" ১০

হান্টার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে লিখেছেন -

"The Famine ..., the mortality the beggary, exceed all description. Above one-third of the inhabitants have perished in the once plentiful province of Purneah, and in other parts the misery is equal." ১১

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দশ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয়েছিল বলে হান্টার 'Annals of Rural Bengal(p.35)' বইতে উল্লেখ করেছেন। মূলত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মৃত্যুর সংখ্যাটা অজ্ঞাত। ঐতিহাসিকের মন্তব্য -

"মন্বন্তরে বাংলা বিহারের এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ১৭৭০ সনে বাংলা বিহারের মোট জনসংখ্যার হিসাব দুষ্প্রাপ্য বলে এই এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ সঠিক ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।" [১২]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলা বিহারের অর্থনৈতিক ক্ষতিটা হল সুদূর প্রসারী। এর ফলে বাংলা বিহার দীর্ঘ দিনের জন্য চির দরিদ্র এবং চির দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হয়। অর্থনীতিবিদরা লক্ষ্য করেছেন এ মন্বন্তর সব চেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছে শিল্প এবং ফসলের উৎপাদনের উপর।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ধ্বংস করেছিল বাংলা বিহারের অর্থনীতি। তাঁতি ও তুলো উৎপাদকের মৃত্যুতে বস্ত্র শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্পের শিল্পী ও গুটি সংগ্রাহকদের মৃত্যুতে রেশমের উৎপাদন কমে যায়। ঐতিহাসিকরা দীর্ঘদিন পরে এবং নতুন গবেষণা করে সে একই কথা বলছেন -

"প্রকৃতির অভিশাপের কথা বাদ দিলেও একথা বলা যায় যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশি বিদেশি উভয়মুখি শোষণের প্রবল চাপের একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ, যে বিস্ফোরণে বিনষ্ট হয়েছিল হাজার হাজার গ্রাম। ভেঙে পড়েছিল অর্থনৈতিক কাঠামো, পরিবর্তন এসেছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিয়তিতে, এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষনের ফাঁস সাধারণ মানুষের গলায় কিভাবে চেপে বসতে পারে তার প্রকৃষ্ট নজির ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছেতো বহুবার কিন্তু সাধারণ মানুষকে এমন সর্বনাশা মাশুল হয়তো আর কখনো গুণতে হয় নি।" [১৩]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রধান কারণটি দেখিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ইয়ংহাস্‌ব্যান্ড লিখেছেন -

"তাহাদের (ইংরেজ বণিকগণের — সুপ্রকাশ রায়) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিল যে,

জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে। ... চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুত হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা ইংরেজ বণিকগণের এক চেটিয়া দখলে চলিয়া গেল। ... খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।"
... এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তাহা এমন কি ভারতবাসীরাও আর কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই।"

"চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাহাদের সকল আমলা -গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেই খানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ হাজার পাউন্ড। (দেড় লক্ষাধিক টাকা)য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলেন।" [১৪]

"... বঙ্গদেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এরূপ একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে, তাহা মানব সমাজের সমস্ত অতিতকাল ব্যাপিয়া ব্যবসা-নীতির এই ক্রূর উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর পবিত্রতম ও অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকার সমূহের উপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ - লালসার উৎকট অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই নতুন অধ্যায়টি তাহারও একটি কালজয়ী নিদর্শন হইয়া থাকিবে।" [১৫]

বলা যায় এদেশে ইংরেজ শাসনের ফলে যে জিনিষটি অক্টোপাসের মতো লেগে ছিল, তা হচ্ছে মন্বন্তর। ইংরেজ শাসনের বা শোষণের শুরু এদেশে ছিয়াত্তরে মন্বন্তর দিয়ে আর শোষণের শেষ পঞ্চাশের মন্বন্তর দিয়ে। মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো মন্বন্তর ঘটেছে বিশ বার। আর আকাল বলতে যা বুঝায় তা একশ্রেণীর সুবিধাবাদী চাটুকার ছাড়া প্রায় সবার নিকট চিরকালই লেগে ছিল।

ইংরেজ শাসনের প্রায় দুইশত বৎসরের পুরো সময়টাতে বাংলাদেশে মন্বন্তরটা সিন্দাবাদের ঘাড়ে চেপে বসা বুড়ো দৈত্যের মতো সর্বদা চেপে ছিল। এই একশত নব্বই বৎসর সময়কালকে ভারতীয় ইতিহাসে 'মন্বন্তরের কাল' বলে অভিহিত করা যায়। ভারত বর্ষ মুসলমানদের আক্রমণের ফলে পরাধীন হয়েছিল মুসলিম শাসকদের, কিন্তু পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে এদেশ পরাধীন হলো দুর্ভিক্ষের, ভাগ্যের এবং শোষণ সমাজ ব্যবস্থার। ইংরেজ শাসন এদেশে আধুনিক সভ্যতার আলো দিয়েছে বটে তবে তা ছিল পরাধীনের জন্য বন্টিত আলো। অপরদিকে শোষণের যে তীব্রতা ইংরেজরা দেখিয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা যেন কসাইয়ের ডিগ্রিকে স্পর্শ করে। মুনাফার জন্য এমন কোন অপকর্ম নেই, যা এই বেনিয়া শ্রেণী করেনি। প্রতারণা, হঠকারিতা, উৎকোচ গ্রহণ, শোষণ ইত্যাদির যে বৈশিষ্ট্য এদেশে ইংরেজ শাসনকে কালিমাময় করেছে, তা এমন কিছু নয় মুনাফার জন্য মন্বন্তর সৃষ্ট কোটি কোটি মানুষ ধুনের কাছে।

এদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্র ধরে সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই বেশী ভোগ করেছিল বাঙালীরা। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠলে, বাঙালীরা একদিকে ইংরেজ জীবন যাত্রার সাথে পরিচিত হয়। অন্যদিকে ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দারিদ্র্য এবং বার বার দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। ইংরেজদের প্রভাবে উনবিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় জন্ম নেয় যে উদার চিন্তা ভাবনা, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের বিকাশ হয় এসব চিন্তাধারা বাংলায়ও প্রবেশ করে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেক বাঙালী সরকারী চাকুরী লাভ করে। উইলিয়াম বেন্টিক (১৮২৮-৩৫) গভর্ণর হয়ে এলে বাঙালীর জন্য ইংরেজী শিক্ষার দিগন্ত খুলে যায়। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে লর্ড মেকলে একটি শিক্ষানীতির

প্রস্তাব করেন। বেন্টিংক ১৮৩৫ সালে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর থেকে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজী বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় এবং আইন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার বাইরে সমগ্র বাংলায় ও আধুনিক শিক্ষানীতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি কলেজ, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ, ১৮ ৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উডের শিক্ষানীতির ফসল হিসাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত বিষয় বিচার করলে দেখা যায় বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দায়ী এবং দাবিদার। কোম্পানীর শাসনের শুরুতেই নেমে এসেছিল ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নামের ঐতিহাসিক দুর্যোগ। যার সত্রিয় হোতা - প্রকৃতি নয়, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হর্তাকর্তারা। অপর দিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের শেষ দিক, বাংলা এবং ভারতের ইতিহাসে 'উন্নয়নের যুগ' হিসাবে পরিচিত। এসময় রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ইংরেজদের কুশাসনে বাংলার সাধারণ বনিকদের বাণিজ্য দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র শিল্প ও কলকারখানা এবং হস্ত ও কুটির শিল্প ক্রমে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। হস্ত উৎপাদিত পণ্য বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বরপুষ্ট বৃটিশ পণ্যের হাতে মার খায়, ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ পণ্য। ফলে এদেশের উৎপাদিত পণ্য বাজার ছাড়া হয়ে মিল কারখানা বন্ধ হওয়া শুরু হলে কৃষকের মত এ দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও কারিগররা কর্মচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। বাংলার মসলিন, সুতী বস্ত্র, রেশমি বস্ত্র এবং কৃষিজাত দ্রব্য মুঘল, পাঠান, আরমানী এবং ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বে যে রপ্তানী হত কোম্পানীর যুগে এসে অন্যান্য বণিক শ্রেণীর পরিবর্তে ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রয়োগ হলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এসব দ্রব্যের উৎপাদকরা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিযোগিতামূলক চেতনা না থাকায় ইংরেজরা নামমাত্র মূল্যে, কখনো জোর পূর্বক এবং কৌশল পূর্বক বাংলার কৃষি পণ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল বিনেতে পাচার করতে থাকলে উৎপাদকরা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান না হবার ফলে উৎপাদনে ধ্বস নেমে আসে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে উৎপাদন যখন ক্রমানুয়ে বৃদ্ধি পায়, তখন বাংলার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানীতে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ইউরোপের তৈরী জিনিস পত্র

কম শুল্কে এদেশে আমদানী করা হয়, এসব দ্রব্য সস্তা ছিল বলে সাধারণ ক্রেতারা দেশীয় পণ্যের বদলে এগুলো কেনার দিকে ঝুঁকতে থাকলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বাংলার উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানির উপর অধিক শুল্ক ধার্য করা হলে আন্তর্জাতিক বাজারে এসব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে ক্রমানুয়ে চাহিদা কমতে থাকে। অর্থনৈতিক শোষণের উপর আলোকপাত করে ঐতিহাসিক বলেছেন -

"প্রকৃতপক্ষে বাংলার আর্থিক এবং সেই সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়েছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, এ ধারা পরিণতি লাভ করেছে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এ যুগে (১৭৫৭-১৭৭২) বাংলা থেকে ব্যাপক ভাবে আর্থিক নিষ্কাশনের (Economic drain) শুরু। ১৭৫৭ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্কাশনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮, ৪০০, ০০০ পাউন্ড। বাংলার আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের কুক্ষিগত।"[১৬]

কোম্পানীর শোষণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হলে বাংলার কৃষি জমির এক তৃতীয়াংশ জমি যেমন জঙ্গলে পরিণত হয়, তেমনি ইংরেজদের অর্থনৈতিক কুব্যবস্থায়, এদেশের এতদিনের অনেক লাভবান শিল্প ও স্তব্ধপে পরিণত হয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরটি অবশ্যম্ভাবি ছিল। কারণ এদেশের পণ্য ইংরেজরা কোম্পানীর লগ্নি নামে কৃষকদের থেকে জোরপূর্বক নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে তা ইংল্যান্ডের বাজারে রপ্তানী করে। এ ছাড়া এতদিন কৃষকগণ সমবেতভাবে খাজনা দিত। কিন্তু এবার তাদের খাজনা দিতে হয় ব্যক্তিগত ভাবে এবং মুদ্রার আকারে। কৃষকরা খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য বৎসরের খাদ্য ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাউলের একচেটিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অসংখ্য ব্যবসাকেন্দ্র খুলে বসে। এই ভয়ঙ্কর ব্যবসা ছিল এই দুইটি প্রদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা। বিপুল মুনাফার লোভে ইংরেজরা এই নিষ্ঠুর খেলা আরম্ভ করে। ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে ফসল ক্রয় করে মজুত করে রাখে এবং পরে সময় বুঝে অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি পেলে তা ঐ চাষীদের নিকটই বিক্রয় করে। এই ব্যবসার ফলে ইংরেজ বণিকগণ শাসনের প্রথম হতে ভারতের শস্য-ভান্ডার কথিত বাংলা ও বিহারকে এক স্থায়ী দুর্ভিক্ষের

দেশে পরিণত করে। পরবর্তীকালে এ ব্যবসা স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং এটাই সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠে।

এ সময় দুর্ভিক্ষ সাধারণ ঘটনা হওয়ার কথা, কারণ তখন শাসন ব্যবস্থার নীতি ছিল প্রজারা শাসকদের হালের গরু, যারা রাতদিন খাটবে- শাসকদের খোরাকী তৈরীর জন্য।

ছিয়াত্তরের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতাকে শাসক মজুতদাররা একটা কলঙ্ক হিসাবে না নিয়ে মুনাফা লাভের একটা অভিজ্ঞতা হিসাবে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তারা এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে এবং মুনাফার চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে।

B.M.Bhatia লিখেছেন -

"The Bengal famine was a tragedy in unpreparedness,
The food situation in India had been allowed,
due to neglect, to grow from bad to worse." ১৭

ভাটিয়ার মতে বাংলার মন্বন্তর ছিলো প্রস্তুতিহীনতার মধ্যে একটি বিয়োগান্তক ঘটনা। শুধুমাত্র অবহেলার কারণেই ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর অবস্থায় পৌঁছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গে দেখি পঞ্চাশের মন্বন্তর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করে দিল ভারতের ইতিহাসে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জন অসন্তোষ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, বৃহৎ জনগোষ্ঠি ইংরেজ শাসনকে উৎখাত করার জন্য জোর তৎপরতা চালায়। কারণ তাদের উপলব্ধি হল, ইংরেজ এবং তাদের বরপুষ্ট জমিদার থেকে মুক্তি লাভের জন্য স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জাপানের সঙ্গে হাত মেলাবার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন, যদিও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জাপানের প্রবেশ মানে আর একটা শত্রু ডেকে আনা। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পুরোটা কেটেছে দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে। বস্তুত স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ লাভ করল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং দুর্ভিক্ষ (যখন দুর্ভিক্ষ ছিল না - তখন ছিল দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতির সময়) থেকে মুক্তি, কারণ স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথেই ভারতবর্ষ আর বড় ধরণের কোন দুর্ভিক্ষের স্বীকার হয়নি। নিম্নে আমরা দেখতে পাই তার চিত্র।

যেমন -

"বৃটিশ শাসনের পূর্বের দুর্ভিক্ষ সমূহ -

কাল	স্থান ও বর্ণনা	কারণ ও মৃত্যুসংখ্যা
একাদশ শতাব্দী (দুইটি)	স্থানীয়	অনাবৃষ্টি
ত্রয়োদশ শতাব্দী (একটি)	দিল্লীর নিকট	অজ্ঞাত
চতুর্দশ শতাব্দী (তিনটি)	স্থানীয়	যুদ্ধের জন্য শস্যহানি
পঞ্চদশ শতাব্দী (দুইটি)	ঐ	ঐ
ষোড়ষ শতাব্দী (তিনটি)	স্থানীয়	অনাবৃষ্টি
সপ্তদশ শতাব্দী (তিনটি)	প্রায় সর্বত্র	অরাজকতা, সেচের অভাব ও অনাবৃষ্টি
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ(চারটি)	স্থানীয়	ঐ

বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগ (১৭৫৭-১৮০০)

১৭৬৯-৭০	'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' — বিহার ও বঙ্গদেশ	ইংরেজ বণিকদের খাদ্য শস্যের ব্যবসা, অনাবৃষ্টি বঙ্গদেশে এক কোটি ও বিহারে ত্রিশ লক্ষাধিক নরনারীর মৃত্যু
১৭৮৩	মাদ্রাজ ও বোম্বাই	মৃত্যু সংখ্যা অজ্ঞাত
১৭৮৪	উত্তর ভারত	ঐ
১৭৯২	মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও মারবাড়	ঐ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

১৮০২	বোম্বাই	মৃত্যুসংখ্যা অগণিত
১৮০৩-৪	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানা	অজ্ঞাত

১৮০৫-৭	মাদ্রাজ	মৃত্যুসংখ্যা বিপুল
১৮১১-১৪	ঐ	সামান্য
১৮১২-১৩	রাজপুতানা ও পাঞ্জাব	বিশ লক্ষাধিক
১৮২৩	মাদ্রাজ	বিপুল সংখ্যা
১৮২৪-২৫	বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	অজ্ঞাত
১৮৩৩-৩৫	মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই	অগণিত
১৮৩৭-৩৮	উত্তর-ভারত	দশ লক্ষাধিক

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ

১৮৫৪	মাদ্রাজ	অজ্ঞাত
১৮৬০-৬১	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব	পাঁচ লক্ষ
১৮৬৫-৬৬	উড়িষ্যার ছয়টি জেলা, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও মাদ্রাজ	যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার, ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার
১৮৬৮-৬৯	রাজপুতানা,	১২ লক্ষ ৫০ হাজার
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৬ লক্ষাধিক
	পাঞ্জাব	৬ লক্ষ
	মধ্য-ভারত	২ লক্ষ ৫০ হাজার
	বোম্বাই	অজ্ঞাত
১৮৭৩-৭৪	বঙ্গদেশ, বিহার, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	ঐ
১৮৭৬-৭৭	বোম্বাই	৯ লক্ষ
	হায়দরাবাদ	৭০ হাজার
	মাদ্রাজ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অযোধ্যা	মোট ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার
	মহীশূর	১১ লক্ষ

১৮৬৩	দাক্ষিণাত্য, বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল	
	মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, উত্তর-পশ্চিম	
	সীমান্ত অঞ্চল	X
১৮৬৪	বঙ্গদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর ও	
	মাদ্রাজের কতিপয় জেলা	X
১৮৬৬-৬৭	মধ্য-ভারত	X
১৮৬৮-৭০	বিহার, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, মাদ্রাজ,	
	কুমাউন ও গাড়োয়াল	১৫ লক্ষ
১৮৯১-৯২	মাদ্রাজ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও	
	বঙ্গদেশ	১৬ লক্ষ ২০ হাজার
১৮৯৫-৯৭	বুন্দেলখণ্ড, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	
	প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ ও	
	মধ্য-ভারত	৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার
১৮৯৯-১৯০০	ভারতের প্রায় সর্বত্র	২৫ লক্ষ
১৯০১	গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই,	
	কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের	
	দক্ষিণাঞ্চল	৭ লক্ষ ৫ হাজার

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৪-১৯০১ – এই সাতচল্লিশ বৎসরে) বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।" [১৮]

১৯৪৭ পরবর্তী দুর্ভিক্ষের হিসাব দেয়া হল -

"খ্রীস্টাব্দ	মন্বন্তর-পীড়িত স্থান	মন্বন্তরের কারণ	মন্বন্তরের পরিণতি
১৯৬৫	বিহার	খরা	ত্রাণকার্যে আশাতীত সাফল্য সত্ত্বেও সহস্রাধিক মৃত্যু
* ১৯৭৪	বাংলাদেশ	বন্যা ও খাদ্য রপ্তানি	ব্যাপক অসন্তোষ ও বহু লোকক্ষয়" [১৯]

এ থেকে স্পষ্ট হল ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ কি ? কারণ দেশ স্বাধীন হওয়াতে আর উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ নেই। তবে কখনো যদি আবার শোষণ ব্যবস্থা সেই আগের পর্যায়ে পৌঁছে, তবে আবার আগের দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি শুরু হবে।

এছাড়া আমরা দেখি পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে। প্রথমেই বলে রাখা যায় মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তার ফলে বাজারে প্রায় জিনিসের যে দাম বাড়ে তা আর পূর্বের স্থানে ফিরে আসে না। এক শ্রেণীর লোকের হাতে হঠাৎ এতো কাঁচা টাকা এসে যায়, যা বাজারের ভারসাম্য ভেঙে দেয়। মন্বন্তরের ফলে কিছু মানুষের বড় ধরণের অর্থনৈতিক উত্থান ঘটলেও বৃহৎ জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক পতন ঘটে। যুদ্ধের ফলে বিশেষত খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুতদারী করে কিছু নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্তের সারিতে গেলেও মন্বন্তরের ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বেশীর ভাগ মানুষের শোচনীয় পতন ঘটে। তাদের যে সচ্ছলতা ছিল, তার স্থানে তাদেরকে এসে নির্ভর করতে হয় শ্রমনির্ভর মজুরী এবং চাকুরীর উপর। যে সামান্য জমি, বসত বাড়ী তাদের ছিল, যা তাদের বিক্রি করতে হল কমমূল্যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সে সর্বহারারা তাদের অর্থনৈতিক পতনের ফলে সে সম্পদ আর ক্রয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের বেশীর ভাগই হয়ে যায় বস্তিবাসী বা ভাড়াটে। তবে স্বাধীনতার ফলে এবং বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্ব-ব্যাপী যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির ফলে নিম্নবিত্তরা কারখানায় শ্রমবিক্রি করে বাঁচার একটা অবলম্বন পায়। ভারতবর্ষের পঙ্গু অর্থনীতিতে স্বাধীনতা একটা আশার সঞ্চার করে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

----- 0 -----

উল্লেখপঞ্জী :-

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ইতিহাস', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫) পুনর্মুদ্রণ ১৩৬১, পৃ.১-২।

২। তদেব, পৃ.১২৪।

৩। Karl Marx : 'Future Result of British Rule in India' (উদ্ধৃত এবং অনুবাদ - সুপ্রকাশ রায় : 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-তান্ত্রিক সংগ্রাম', বুক ওয়ার্ল্ড, তৃতীয় সংস্করণ, (পুনর্মুদ্রণ)নভেম্বর ১৯৯৬, পৃ.৮)।

৪। Fourth Parliamentary Report 1773, page-535.
(উদ্ধৃত সুপ্রকাশ রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.২ থেকে।)

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বঙ্কিম রচনাবলী', (উপন্যাস সমগ্র, প্রথম খণ্ড, তুলি কলম, কলকাতা ১৯৮৬, পৃ.৬৭০।

৬। W.W.Hunter : 'The Annals of Rural Bengal', Vol.I, Smith Elder, London, 1872, p.26-27.

৭। ড. বিষ্ণু বসু : 'ভূমিকা', বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত সংস্করণ।

৮। তদেব।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'আনন্দমঠ', বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ.৬৭৬।

১০। নাজমা জেসমিন চৌধুরী : 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮০, পৃ.৩০৬।

১১। W.W.Hunter :- Ibid, p.20-21.

১২। নিখিল সুর : 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ.১২।

১৩। তদেব, পৃ.৩১।

১৪। Young Husband : 'Transation in India (1768)pp.123-124,131
(উদ্ধৃত ও অনুবাদ সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৩-১৪।

১৫। Young Husband : Ibid,p.131, উদ্ধৃত তদেব।

১৬। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় : 'প্রাক পলাশী বাংলা' (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭) কে·পি·বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ·৮।

১৭। B.M.Bhatia : 'Famine in India' - 1860-1965',Bombay, 2nd Edition, 1967, p.309-310.

১৮। S.K. Chatterjee : 'The Starving Millions' p.7-11 এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'দেশের কথা'নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই দুর্ভিক্ষের বিবরণগুলি রয়েছে। (উদ্ধৃত - সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·১৭৬-১৭১)।

১৯। ড· বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ·৪-৫।

১৯*। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে বিনতা রায়চৌধুরী কারণ দেখিয়েছেন— বন্যা এবং খাদ্য রপ্তানী। বন্যা অবশ্য একটা কারণ ছিল।

এর সাথে অমর্ত্য সেন মূল কারণ দেখিয়েছেন -
...."Bangladesh was already chronically dependent on import of food abroad and despite the famine conditions the government succeeded in importing less food grains in 1974 than in 1973.(poverty and famine, Oxford, 1981 P-134 - 35). কিন্তু দৈনিক ইত্তেফাক থেকে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নির্ভীক স্বীকারোক্তি বাংলাদেশ অবজারভার থেকে উদ্ধৃত করে Martin Ravallion তাঁর Markets and Famines (Oxford-1987) গ্রন্থের 'Rice Markets in Bangladesh during the 1974 Famine' প্রবন্ধে বলেন - "At the time, many paople blamed 'hoarders'. For example, the influential Bangladeshi news paper, Daily Ittefaq' Claimed on 12 May 1974, that ' .... hoarders, profiters and black-Marketeers were creating the crisis condition's. When the Prime Minister of Bangladesh, Mujibur Rahman, officially declared famine he was quoted as saying

that " ... a group of sharks, hoarders, smugglers profiteers and black Marketers were trading on human miseries (The Bangladesh Observer, 23 Sept. 1974) বঙ্গবন্ধুর এই স্বীকারোক্তি মহত্তার পরিচয় - যা প্রশংসনীয়। এই দুর্ভিক্ষে সরকারী হিশাবে ২৬,০০০ মানুষ মারা যায়।

*** বি.দ্র. — এ গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঐতিহাসিক তথ্য গুলি নেয়া হয়েছে, শ্রী প্রভাতাংশু মাইতির 'ইউরোপের ইতিহাসের রূপরেখা', বাংলাদেশের নূরুন নাহার বেগমের 'মানুষের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ), সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পূর্ণেন্দু পত্রীর 'কলকাতা সংক্রান্ত'(প্রবন্ধের বই) নিশীথ, আর. রায়ের 'এ সর্ট হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া',3 বিভিন্ন গবেষকের লিখিত 'ইংরেজ আমলের ইতিহাস' এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক' কিছু টেক্সট বুক (পাঠ্য বই). থেকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ কারণ ও পরিণাম- একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় অধ্যায়

পঞ্চাশের মন্বন্তর : কারণ ও পরিণাম একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

'মন্বন্তর' এবং 'দুর্ভিক্ষ' দুটি শব্দই সমার্থক। ড· বিনতা রায়চৌধুরী বলেছেন -

> "'মন্বন্তর' শব্দটি কয়েকটি অর্থ বহন করে। যেমন মনুর শাসন কাল, বন্যা, বিপ্লব, প্রলয়, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত অর্থে 'মন্বন্তর' বলতে দুর্ভিক্ষকে বোঝায়।" [১]

অভিধানে দুর্ভিক্ষ শব্দের উৎপত্তি দেখানো হয়েছে এভাবে -

> "১। দুর্ভিক্ষ - দুর্ভিক্ষ্য দুর (অভাব) + ভয়, ভক্ষ্য (ভক্ষ-ভোজন করা। + অ, ষ = ভক্ষ্য দ্রব্য, অব্যয়ী- বি, খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ।
> ২। দুর(দুঃখে)ভক্ষ = ভক্ষ্য (ভক্ষণীয়) বিণ, কষ্টে ভক্ষ্যণীয়" [২]

এছাড়া বাংলা ব্যাকরণে দেখা যায় বৈয়াকরণিকরা সমাসে দুর্ভিক্ষ শব্দের ব্যাস বাক্য করেন ভিক্ষার অভাব (অব্যয়ীভাব সমাস)। বাংলা 'মন্বন্তর' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ ব্যবহার হয় Famine শব্দটি। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় Famine শব্দের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় -

> "An extreme and protracted shortage of food usually resulting in higher than normal death rates." [৩]

'ভারতকোষ'এ দুর্ভিক্ষ শব্দের বিস্তারিত পরিচিতি রয়েছে এভাবে -

> সাধারণতঃ বহুস্থানে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিলে তবেই অবস্থাটিকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়। ... ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থা অনেকটা মৌসুমী বায়ুর মর্জির উপরে নির্ভরশীল বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রবণতা চলিয়া আসিতেছে। বেদ, ব্রাহ্মণ ও পুরাণে যজ্ঞের সাহায্যে সুবৃষ্টি ঘটাইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগে দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও আর্তত্রাণ রাজধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐতিহাসিক

> কালে মৌর্যসাম্রাজ্যের সময় হইতেই উত্তম বৎসরে শস্য সংকয় করিয়া দুর্বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইবার প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ে এবং মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে অনুরূপ ব্যবস্থার কথা শুনা যায়। ... মুসলমান যুগে যুদ্ধ বিগ্রহের বাহুল্যের ফলে এই জাতীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়, যদিও মহম্মদ বিন তোগলক, শেরশাহ এবং আকবর এই ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তনের বহুবিধ চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রসারের সময়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী নৈরাজ্যের যুগে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চরম হইয়া উঠে।" [৪]

ভারতবর্ষের কিছু কিছু মন্বন্তর প্রকৃতির সৃষ্টি হলেও বেশীর ভাগ মন্বন্তর মানুষের সৃষ্টি ছিল। পৃথিবীর যাবতীয় মন্বন্তরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রকৃতির সৃষ্টি (২) মানুষের সৃষ্টি (৩) প্রকৃতি-মানুষের মিলিত সৃষ্টি (প্রকৃতির দুর্বলতার মানুষ সুযোগ গ্রহণ করে যে 'মন্বন্তর সৃষ্টি' করে তা)বেশীর ভাগ প্রকৃতির সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, পোকার আক্রমণ এবং মহামারী। আর মনুষ্য সৃষ্ট হচ্ছে যুদ্ধ, মজুতদারী, খাদ্যের আমদানী-রপ্তানির ভারসাম্য হীনতা, অর্থনৈতিক অসম বণ্টন ব্যবস্থা, সামাজিক শোষণ, রাজনৈতিক কোন্দল ইত্যাদি।

প্রকৃতি সৃষ্ট খরা, বন্যা, মহামারী থাকবে, আমাদের উৎপাদন যদি চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত করা যায়, তবে কিছু খাদ্য আমরা মজুত রাখতে সক্ষম হব আকাল, বা প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। আর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দরকার, শস্যকে তথা কৃষি ব্যবস্থাকে লাভজনক বিনোয়োগে পরিণত করা। অনেক সময় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, উৎপাদন কম হওয়ার পিছনে খরার চেয়ে বড় হতে পারে অর্থনৈতিক কারণ, যেমন যদি কৃষির উৎপাদন খরচের (সার, বীজ, সেচ, বিনোয়োগের সুদ, খাজনা, শ্রম সব মিলিয়েই উৎপাদন খরচ) চেয়ে ফসলের বিক্রয় মূল্য বেশী না থাকে তবে উৎপাদক

নিরুৎসাহিত হবে এবং পেশা থেকে সরে যাবে কিংবা দায়সারা উৎপাদন করবে। বিক্রয় মূল্যের পাশাপাশি দরকার সহজ বিপনন ব্যবস্থা। কৃষির মূল উৎপাদক এ উপমহাদেশে বেশীর ভাগই ছোট বা কম পুঁজির কৃষক, (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান কিংবা অষ্ট্রেলিয়ার খামার বাড়ির মালিকের মতো বড় বিনিয়োগকারী কম) এ কৃষক বিপনন সম্পর্কে সুকৌশলী নন, ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের লাভের অংশ তারা যত না পায়, তার চেয়ে বেশী যায় দালাল, আড়তদার, পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ীর হাতে। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন সময় দেখা যায়, কৃষক তার উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে উৎপাদন মূল্য কিংবা নামমাত্র মূল্যও না পেয়ে বাজারে বা নদীতে ফেলে দিতে। এই ফেলে দেয়ার পিছনে হয়তো একটা ক্ষোভ আছে, কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না এ কৃষক পরবর্তী সালে ঐ ফসল কোন যুক্তিতে উৎপাদন করবে। বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের মূল কারণগুলিকে বাদ দিয়ে বাংলার অসামরিক সরবরাহ সচিব এ মন্বন্তরের বারটি কারণ দেখিয়েছেন। কারণগুলি হচ্ছে -

" ১। ১৯৪২ অব্দে আউস ফসল ভাল হয় নাই।

২। ১৯৪২-৪৩ অব্দে আমন ধানও কম ফলিয়াছে।

৩। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলা বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় উৎপাদন কম হইয়াছে।

৪। কীটের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হইয়াছে।

৫। সরকারের নৌকা নিয়ন্ত্রণের নীতি চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

৬। সমুদ্রকূল হইতে লোক অপসারণের ফলে উৎপাদনের ক্ষতি হইয়াছে।

৭। ব্রহ্ম ও আরকান হইতে আগত আশ্রয়াথীরা ভিড় জমাইয়াছে।

৮। শিল্প কেন্দ্রগুলিতে ভিন্ন প্রদেশের মজুর অনেক বাড়িয়াছে।

৯। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হওয়ার ঘাটতি পূরণের উপায় হয় নাই।

১০। অনেক বিমান ঘাটি তৈয়ারী হওয়ায় সেই জায়গায় চাষ হইতে পারে নাই।

১১। সামরিক লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় খাবার বেশী খরচ হইয়াছে।

১২। অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি কম হইয়াছে।" [৫]

এই বারটি কারণের মধ্যে প্রথম চারটি কারণ এ দুর্ভিক্ষের জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করে। মূলত এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য প্রকৃতি সৃষ্ট এই চারটি কারণের উপস্থিতি বা ভূমিকা ছিল নগণ্য। অথচ এ স্থলে আমার দরকার ছিল - সে চারটি কারণ যে কারণগুলি ছিল মানুষের সৃষ্টি। এ কারণগুলি হচ্ছে - (১) মজুতদারী (২) ঘাটতি অঞ্চল থেকে খাদ্য রপ্তানী বা উঠিয়ে নেয়া (৩) মুদ্রাস্ফীতি (৪) ঔপনিবেশিক শাসকের দিনের পর দিন অর্থনৈতিক শোষণ। এই কারণগুলি মানুষের দিকে তথা নিজেদের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেই সরবরাহ সচিব প্রকৃতি সৃষ্ট কিছু গৌণ কারণকে মুখ্য কারণ দেখিয়ে 'বোবা' প্রকৃতির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইলেন, নিজেদের দোষ হাল্কা করার অভিপ্রায়ে। সব চেয়ে আশ্চর্য মজুতদারী এবং খাদ্য রপ্তানী নামক প্রধান দুটি কারণের উল্লেখ নেই এই বারটি কারণে। কিন্তু ইতিহাস চিরকালের জন্য সরবরাহ সচিব বা শাসকদের ক্রয় করা বস্তু নয়, এটা সাময়িক কারো আয়ত্বাধীন থাকতে পারে। সময়ে এটার মুক্তিলাভ ঘটে। ফলে আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্য কারণ পাই। নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হল।

কোন একটি নির্দিষ্ট কারণের পরিনাম যদিও পঞ্চাশের মন্বন্তর নয় তবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, মজুতদারি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ব্যবসা, খাদ্য রপ্তানী, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক নেতাদের অমানবিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন অপকান্ডের ফলে একটি ভূখন্ড ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হলেও মূল কারণ ছিল যুদ্ধ। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ সব গুলি উপরোক্ত কারণই মানুষের সৃষ্টি। কোন একদিনে ভূমিকম্পের মতো দুর্ভিক্ষ বাংলার বুকে নেমে আসেনি। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য মানুষ সময় হাতে পেয়েছে, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে কেউ কিছু করেনি একথা বললেও ভুল হবে। তবু সংগঠিত হয়েছে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষের ট্রাজেডি এখানে, মানুষের প্রতিপক্ষে ছিল মানুষ। প্রায় গবেষক স্বীকার করেছে, প্রকৃতি যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী মানুষ।

এই দুর্ভিক্ষের পক্ষে বিপক্ষে দুটি গোষ্ঠির মধ্যে দুর্ভিক্ষের পক্ষের গোষ্ঠীটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসক এবং তাদের বরপুষ্ট দালাল, জমিদার এবং মজুতদাররা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মূলে ছোট বড় অনেক গুলি কারণ। তার মধ্যে প্রধান কারণ সমূহ হচ্ছে (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (৩) রেলপথ নির্মাণ (৪) সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস (৫) রাজনৈতিক নেতাদের কোন্দল (৬) সরকারী শোষণ ব্যবস্থা (৭) সরকার এবং ব্যবসায়ীদের মিলিত মজুতদারী ব্যবসা (৮) মেদিনীপুরের বন্যাজনিত ক্ষতি (৯) পোড়ামাটি নীতি (১০) মুদ্রাস্ফীতি (১১) বিশেষ অঞ্চল বা মানুষের প্রতি সরকারের তোষণ নীতি (১২) 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য স্থায়ী উৎপাদন ঘাটতি অপেক্ষা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এ উপমহাদেশে তাদের শোষণ ব্যবস্থা এবং ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও অব্যাহত শস্য রপ্তানীই দায়ী। অনুরাধা রায় লিখেছেন -

> "১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় চালের উৎপাদন কম হয়েছিল বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হবার মতো কম নয়। বৃহৎ বঙ্গে (বাংলা বিহার উড়িষ্যা) চালের উৎপাদন এবং পাঞ্জাবে গমের উৎপাদন আগের বছরগুলির তুলনায় বেশিই হয়েছিল। তবু বাঙালীর খাদ্যে ঘাটতি পড়ল। কারণ বহু বছর ধরেই বাংলার নিজস্ব চালে তা কুলাতো না, বাইরে থেকে আমদানী করা চালের ওপর নির্ভর করতে হত, বিশেষ করে বর্মার চাল। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জাপানীদের হাতে বর্মার পতন ঘটলে সেখান থেকে চাল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। আমদানী বন্ধ হল বটে, কিন্তু রপ্তানী করতে হল প্রচুর চাল।" [৬]

তসলিমা নাসরিন দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষের মৌলিক কারণগুলি, একদিকে যেখানে খাদ্যে আমদানী করা দরকার সেখানে রপ্তানী হচ্ছে। অন্যদিকে যুদ্ধের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, মানুষের জীবন নিয়ে প্রহসন, সামগ্রিক মিলিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তর -

> "তবে আকালের পেছনে অন্য কারণও ছিল।... পশ্চিম রণাঙ্গণে জার্মানি নাৎসি বাহিনী যেমন বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল এক একটি দেশের উপর দিয়ে, পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানি ফৌজও তেমনি এগিয়ে আসছিল

ঝড়ের বেগে। রেঙ্গুনের পতন ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ। সুতরাং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ। ঘাটতি আরও সে কারণেই। ... তাছাড়া গম আমদানী করা হয়েছে বছরের দ্বিতীয় ভাগে, গোড়া থেকে নয়। বিয়াল্লিশ সালে যা আমদানি করা হয়েছিল, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। সৈন্যদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল মজুত ভাণ্ডার। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে মানুষের ক্ষমতা ছিল না কিনে খাবার। কারণ খাদ্যশস্যের বিশেষ করে চালের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে চালের পাইকারি দর ছিল মণ প্রতি ১৩ টাকা ১৪ টাকা। ১৯৪৩ এর মার্চে তা দাঁড়ায় ২১ টাকা, মে মাসে ৩০ টাকা আগস্ট মাসে ৩৭ টাকা এবং বেসরকারি মতে আরও বেশি। চট্টগ্রামে অক্টোবরে চালের দাম পৌঁছায় ৮০ টাকা মণ। ঢাকায় ১০৫ টাকায়। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বরে বাংলায় চালের মণ প্রতি দর ছিল ৭ টাকা থেকে ৭ টাকা চার আনা। বিয়াল্লিশের জুলাইয়ে ৭ টাকা বারো আনা থেকে ৮ টাকা। ডিসেম্বরে ১৩ টাকা থেকে ১৪ টাকা। অথচ পরের বছর অক্টোবরেই কিনা ১০৫ টাকা।... ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ধানের মড়কের ফলে অনেক ভূমিহীন শ্রমিক বেকার। দুর্ভিক্ষে না খেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ দিয়েছিল এই ভূমিহীন শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, জেলেরা এবং যারা ধান ভেঙে পেট চালাতেন তারা। কলকাতার পথে প্রধানত তাঁরাই কঙ্কালে লিখে রেখে গিয়েছিলেন সেদিন মানুষের উদাসীনতা আর হৃদয়হীনতার এক কলঙ্ক কাহিনী। সব যানবাহন তখন যুদ্ধ কবলিত। জাপানিরা পূর্ব বঙ্গে হামলা দিচ্ছে শোনা মাত্র সেখানকার চারটি জেলা থেকে ধান চাল সরিয়ে নেওয়া হয়। নৌকা দখল করা হয়। কয়েক হাজার নৌকা ভেঙে ফেলা হয়। সৈন্যদের জন্য কিছু রেখে ডুবিয়ে দেয়া হয় বেশ কিছু। একদিকে এসব বিভ্রাট, অন্যদিকে মজুত উদ্ধার এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ে প্রহসন।" [৭]

বাংলায় চালের আমদানী রপ্তানীর একটি চিত্র থেকে সরকারের প্রহসনের চিত্রটি স্পষ্ট হবে -

"১৯৪১ সালে আমদানী হয়েছিল ৪, ৩২, ০০০ টন, রপ্তানি হয়েছিল ১, ৩৬, ০০০ টন। ১৯৪২ সালে আমদানি হয় মাত্র' ১, ৩৫, ০০০ টন, কিন্তু সিংহল প্রভৃতি কয়েকটি দেশে ৩, ২০, ০০০ টন চাল রপ্তানি করা হয়, কারণ ব্রহ্মদেশে জাপানের আক্রমণের ফলে ... ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।" [৮]

তবুও বলা যায় খাদ্য ঘাটতি পঞ্চাশের মন্বন্তরের একমাত্র কারণ নয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন -

"সরবরাহের দিক থেকে কোন মারাত্মক ঘাটতির ফলে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়নি।" [৯]

তাহলে কারণটি কি ? অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন একটি কারণ হচ্ছে Exchange Entitlement (একজন মানুষ সমাজকে সেবা বা শ্রম দিয়ে তার বিনিময়ে যে পরিমান সেবা বা দ্রব্য পাওয়ার অধিকার রাখে, সেটা হল তার Exchange Entitlement)। যুদ্ধের কারণে কিছু লোকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায়, আর কিছু লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি মানে বাকিদের কমে যাওয়া। কিন্তু অনেকে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের এ তত্ত্বটি (Exchange Entitlement) নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। অনুরাধা রায় মন্তব্য করেছেন -

"অমর্ত্য সেনের যুক্তিবিন্যাসে ফাঁক কম। কিন্তু যে দুর্ভিক্ষকে আমরা বরাবর মনুষ্য সৃষ্ট বলে জানতাম, অর্থনীতির তত্ত্বের মারপ্যাঁচে সেই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী মানুষগুলির দায়িত্ব তিনি অনেক লঘু করে দিয়েছেন। সরকারকে অনেকই রেহাই দিয়েছেন। কালোবাজারী মজুতদারদের কথাও বেশী বলেননি। অংকভিত্তিক অর্থনীতির তত্ত্ব আর যাই প্রমাণ করুক, অমানবিক বঞ্চনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে ধরতে পারে না। Exchange entitlement এ যে বিপর্যয়ের কথা সেন বলেছেন, তার মূল কারণ তো শাসক ও শোষকের অমানবিকতা। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসক আরো বেশি অসংবেদী হয়। এটা ধরা পড়েনি সেনের লেখায়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও কি তাঁর তত্ত্ব দুর্ভিক্ষকে পুরোপুরি ধরতে পারে ? যাদের Exchange entitlement বাড়ল তারা কি এতটা বেশি পরিমাণেই চাল কিনে ফেল যে অন্যদের জন্য কিছু রইল না ? যে Supply ও demand-এর কথা সেন বলেছেন, কোন্ বাজার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে সে কথা ? সেটি কি একটা মুক্ত বাজার ? সেখানে কি র‍্যাশন ব্যবস্থা কোথাও চালু ছিল না ? তা তো নয়। র‍্যাশন চালু ছিল শুধু কলকাতায়, অন্যত্র নয়। আর ১৯৪৩-এর একটা সময় জুড়ে চালের বাজার বলে কিছু ছিলই না বাংলাদেশে। যেটা ছিল সেটা কোনো বাজার নয়, একটা racketeering-এর প্রক্রিয়া। সরকার ও কালোবাজারী মজুতদাররা মিলে বাজার ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশেষ করে বাংলার লাট হার্বার্ট যখন কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হককে সরিয়ে মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দীনকে দিয়ে সরকার গঠন করালেন, তারপর থেকে সরকারের চাল সংগ্রহের এজেন্ট ইস্পাহানীর যথেচ্ছাচারিতার সীমা পরিসীমা রইল না এবং প্রক্রিয়াটির তলার দিকে ছিল আরো অসংখ্য কালোবাজারী শস্য ব্যবসায়ী।" [১০]

মূলতঃ পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য দায়ী করা যায় মজুতদারী, যুদ্ধে হুঁস হারা সরকারের দুর্বল কন্টন ব্যবস্থা এবং দরিদ্র মানুষের প্রতি আন্তরিকহীনতাকে। বস্তুতঃ বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ঔপনিবেশ গড়ে তুলতো সম্পদ আহরণের অভিপ্রায়ে। ঔপনিবেশিক আমলে তাদের সৎ শাসন অপেক্ষা অসৎ শোষণ হতো অনেক বেশী। পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেখা যায় চালের দর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, হঠাৎ যুদ্ধপূর্ব স্তরের দশ গুণের উপরে পৌঁছায়। চালের মূল্য বৃদ্ধি হয় লাফিয়ে লাফিয়ে।

"১৯৪৩ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে চালের দাম দ্রুত বাড়তে লাগলো। কংগ্রেস সদস্য নলিনাক্ষ সান্যাল বিধান সভায় চব্বিশ পরগণা জেলার বসির হাটের চালের দামের এই রকম হিসাব দিয়েছিলেন : ২ জানুয়ারী ৮ টাকা ১২ আনা, ২০ ফেব্রুয়ারী ৮ টাকা ১২ আনা, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৩ টাকা, ১০ মার্চ ২১ টাকা।" [১১]

আর দর বৃদ্ধির প্রথম বলি গ্রামের কৃষকসহ সমাজের দরিদ্র মানুষ। কৃষকের ব্যাপক দারিদ্র ছিল মহাজনদের নিকট থেকে ঋণগ্রহণ এবং একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমি-জমা মহাজন এবং জমিদারদের হাতে যাওয়ার পথটি। সম্বল কৃষক এতোদিন যে জমি আঁকড়ে ছিল, আজ তা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। অনেক গবেষকের দৃষ্টি সেখানে নয়। তার বদলে কখনো কখনো অন্য রকম, যা দুর্ভিক্ষের দায়-দায়িত্ব এলোমেলো করে দেয় কিংবা সে অসহায় মানুষগুলির পাল্টা দোষ খোঁজা। কারো ব্যাখ্যায় বাস্তব অনেক বিষয় আবার এলোমেলো হয়ে পড়ে। যেমন মার্কিন গবেষক পল গ্রীনো। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে গ্রীনো একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। কাজটি প্রশংসনীয় কিন্তু -

"গ্রীনো স্পষ্টত দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। স্বদেশের স্বার্থরক্ষার্থে উপনিবেশের উপর প্রচন্ড অন্যায় করেছে যে ব্রিটিশ সরকার, বিকৃত লোভের বশে গুদামে অকল্পনীয় পরিমানে চাল বোঝাই করেছে যে শহুরে মজুতদার, গোলা থেকে বস্তা বস্তা চাল সরিয়ে বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে যে খরী কৃষক এবং রাত্রির অন্ধকারে সেই চাল অন্যত্র পাচার করছে অধিকতর মুনাফার লোভে: এদের কোনো তুলনা হয় সেই অল্প সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষকের যে তার শেষ সম্বল ২-৩ মণ ধান প্রতিবেশীকে না দিয়ে নিজেই পরিবারের জন্য রাখতে চেয়েছে, যা সেই পুরুষের যে পরিবারের খাদ্য সংস্থান করতে না পেরে তার স্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে চলে গেছে, বা সেই পিতার যে চরম অবস্থায় তার কন্যাকে বিক্রয় করেছে? অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক - কোনো তুলনাই বোধ হয় খাটে না এখানে। এ বড়ো আশ্চর্য যে গ্রীনো এই দুর্ভিক্ষের প্রধান ভূমিকায় রেখেছেন বাঙালির মূল্যবোধকে। আর তাঁর কাছে মজুতদার কালোবাজারী বাঙালি এবং নিম্ন কৃষি শ্রমিক বাঙালি এক। এবং নেপথ্য অভিনেতা ব্রিটিশ সরকারও বাংলায় থেকে থেকে বাঙালি হয়ে গেছে, এটাই বোধ হয় বলতে চেয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, বিপদের সময় স্বার্থ রক্ষার্থে 'অন্নদাতা' কর্তৃক 'পোষ্য'দের পরিত্যাগই হল বাঙালির নীতিশাস্ত্র ও সাংস্কৃতিক নিয়ম। এটাই হল

তার ধর্ম, যাকে বলে আপদ্‌ধর্ম। আলোচ্য সময়টাতে সরকারও এই আপদ্‌ ধর্মই পালন করেছে, গ্রামের ধনী কৃষকও তাই করেছে, গৃহে পিতাও অই করেছে। এই ভাবে দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণ এক করে দিয়ে গ্রীনো জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন।" [১২]

তাই অনুরাধা রায় অনুযোগ করে বলেন -

> "একজন আধুনিক গবেষক, তিনি যদি পরিশ্রম লব্ধ তথ্য দিয়ে বই লেখেন এবং বিশেষত তিনি যদি হন সাহেব, তবে তাঁর এসব কথা আমাদের শুনতেই হয়। তবে অন্তত বাঙালি সংস্কৃতি বোঝার ব্যাপারে স্বদেশের শিল্প সাহিত্যিকদের ওপর নির্ভর করা-টাই বোধ হয় শ্রেয়। এরা কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণের মধ্যে তফাতটা ভালো করেই বুঝেছিলেন।" [১৩]

গ্রীনো সকল বাঙালীকে এক করে দেখেছেন, কিন্তু এখানে দুটো শ্রেণী ছিল, একটা সাধারণ জনগণ, অন্যটা মহাজন-জমিদার, মজুতদার শ্রেণী। এই মহাজন, জমিদার এবং বুর্জোয়া ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের অনেকেই ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের হর্তাকর্তাদের মদদপুষ্ট, মন্বন্তরের যারা ছিল সক্রিয় সহযোগী। বাজার থেকে শস্য আহরণ, সৈনিকের জন্য খাদ্য মজুত, শস্য রপ্তানী, ইত্যাদিতে অর্থলোভে সহযোগিতা করেছে এরা। মজুতদার চক্র গোষ্ঠির কল্যাণে শস্যের দর বৃদ্ধির ইঙ্গিতও আগাম পেয়ে যাচ্ছে আর মজুতদাররা চক্রবদ্ধ বলে, শস্যের দর বৃদ্ধির খবর তাদের মাঝে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণে যারা প্রাণ হারায়, তারা ছাড়া যারা বেঁচে-ছিল খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দর বৃদ্ধির ফলে তাদের অনেকে পরে ক্রমানুয়ে নিঃস্ব হতে থাকে। আবু ইসহাক 'সূর্য দীঘলবাড়ী' উপন্যাসে বলেছেন তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ভূত সিন্দাবাদের ঘাড়ে চেপে বসা ভূতের মতো বাঙালীর ঘাড়ে চেপে বসল। পরবর্তীকালে দেখা যায় নিম্নবিত্তের সিংহভাগ অংশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শ্রেণী সংঘাত বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক শাসন উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের সকল স্তরের সমর্থন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বৃটিশ শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরে সামন্ত ভূস্বামী, রাজনীতিবর্গ, মুৎসুদ্দী, বুর্জোয়া, অর্থলোভী, সুবিধাবাদী ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ ঔপ-নিবেশিক সরকারের কোন সমর্থক ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পঞ্চাশের একটা কারণ। B.M.Bhatia লিখেছেন -

> "From 1910 to 1940 there were 18 scarcities, but there was no loss of life due to starvation over the entire period." [১৪]

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলেই ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। এর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং ১৮৯৫-৯৭এর মন্বন্তর ছাড়া অন্য মন্বন্তরগুলি এতোটা প্রকোপ বিস্তার করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির মধ্যে ব্রিটিশরা হিমসিম খেয়েছে বেশি। এ হিমসিম একদিকে ইউরোপে ব্রিটিশের খোদ রাষ্ট্র ইংল্যান্ড। অপর দিকে বিশ্বে তাদের ছড়ানো-ছিটানো উপনিবেশ গুলোকে নিয়ে। কারণ উপনিবেশগুলো এর আগেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ শুরু করেছে। কেউ কেউ মন্বন্তরের জন্য খাদ্য পরিবহন সমস্যাকে এ মন্বন্তরের কারণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বযুদ্ধের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা অবশ্যই একটা সংকটে পড়েছে। কিন্তু সে সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার বাহাদুরও উদাসীন ছিল। যদি ব্রিটিশের সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের জন্য ভারতবর্ষ থেকে খাদ্য রফতানি বা মজুত না হতো, তবে বাজারে এতো তাড়াতাড়ি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হতো না। মুনাফার জন্য বিশ্বের পরাশক্তিরা যেমন যুদ্ধ বাধিয়েছে, তেমনি মুনাফার জন্য ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যবাদীরা খাদ্যকে মজুত করে কৃত্রিম সংকটকে প্রকট করে তুলেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় খাদ্য মিলেছে তবে তা ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তাই মন্বন্তরের বলি হয়েছে দরিদ্র জ গোষ্ঠিরা, নিম্নবিত্ত ও মধ্য বিত্তরা। উচ্চবিত্তরা এর বলি হতে হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করলে ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতবর্ষে চাল আসা বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মদেশের চাল দিয়ে যেখানে বাংলায় খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা হতো সেখানে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করলে বাংলার খাদ্য সংকট নিয়ে ব্রিটিশের ভাবার কথা ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি। পরিস্থিতি ভয়াবহ হলে অন্যান্য প্রদেশকে বাংলায় খাদ্য সরবরাহের যে অনুরোধ তারা করেছিল মুনাফার লোভে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীরা তার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। এক দিকে খাদ্যের জোগান কম, অপর দিকে মজুতদারি - এর সাথে যুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের আয়ে বাধা। যুদ্ধের ফলে কৃষি, শিল্প, সব বৃহৎ মজুরির চাহিদার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়ে সাধারণ মানুষের আয়ের পথ সংকুচিত হয়ে আসে। ব্যবসায়ীরা সৃষ্ট

সংকটকে মজুতদারীর মাধ্যমে আরো তুঙ্গে তুলে দেয়। সঞ্চয় ফুরিয়ে আসে সাধারণ মানুষের। উপার্জন হয় বন্ধ। দেশব্যাপী যুদ্ধ। চাকরি বন্ধ, ভিক্ষার অভাব, ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া মানুষের আর কোন পথই খোলা থাকে না। মানুষের সর্বশেষ সম্পদ আপন জন কিংবা দেহ বিক্রি করেও পরাজিত হয় মানুষ বেঁচে থাকার যুদ্ধে। আভিজাত্য, বর্ণবাদ, সতীত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, আত্মদান, দয়া, সব কর্পূরের মতো উবে যায়। সব মূল্যবোধ ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। বেঁচে থাকে শুধু উগ্র স্বার্থবোধ। দশকোটি মানুষের এলাকায় দুর্ভিক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের পরীক্ষণ (Expriment) যেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ দিয়ে প্রকৃতি জনসংখ্যা কমিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চাইছে। ম্যালথাস বলেন, জনসংখ্যা যখন খাদ্য উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায় তখন দেখা দেয় নানাবিধ প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ (মানুষের সৃষ্টি ?)। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে ভারসাম্য ভেঙ্গে দিয়েছে মানবতার - বাবা মেয়েকে বিক্রি করে কয়েক বেলার আহার জুগিয়েছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের আর একটি কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রবার্ট ক্লাইভের প্রবর্তন করা বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যর্থ হয়ে গেলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি নিজ হাতে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা নিয়ে নেয়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। এ সময় রাজস্ব দপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের এক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেখানে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা হবে। হেস্টিংস সেই নতুন নীতি গ্রহণ করেন কোম্পানী ও জমিদারদের স্বার্থের কথা ভেবে ফলে জমিদারদের নিকট পাঁচ বছরের জন্য জমি ইজারা দেন। কিন্তু এতে সুফল না পাওয়ায় পাঁচ বছরের পরিবর্তে এক বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা নেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নতুন গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তিনি হেস্টিংসের পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে জমিদারদের জমি ইজারা দেন। তিনি ১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত (১০ বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেয়া) চালু করেন। পরে ১৭৯৩ সালে তিনি দশ সালা বন্দোবস্তের পরিবর্তে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। বৃটিশের এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কয়জন গভর্ণর বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল এঁটেছেন কর্ণওয়ালিস তাদের অন্যতম। কর্ণ ওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের কৃষক শ্রেণী দৈনন্দিন পঙ্গু হয়ে পড়ে। অপর দিকে লাভবান হয় জমিদার এবং ইংরেজ তোষামদকারী শ্রেণী। জমিদাররা এতে শোষণের সুযোগ পায়। তৎকালীন জমিদারের চরিত্র দেখাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন -

"জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ... জমিদার নায়ক বড় মানুষ, কৃষক নায়ক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমিদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে। কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়-শোণিত পান করা দয়ার কাজ"। [১৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যযুগে বাংলার যে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তাও ভেঙ্গে পড়ে, অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করার পর জমির উপর প্রজার কোন অধিকার রইল না। জমিদার এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা অধিক মুনাফা লাভের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব বা খাজনা আদায় করে কৃষকদেরকে সর্বস্বান্ত করে তোলে।

"এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে, শাসকদের নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা আদায় ও জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ করিবার অবাধ অধিকার লাভ করে। ইহাতে জমির উপর কৃষকদের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া কৃষকদিগকে চিরদিনের জন্য জমিদারদের শোষণের শিকারে পরিণত করা হয়। বাংলাদেশে জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমান স্থির হইল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বন্দোবস্তের প্রথম বৎসরেই জমিদারগোষ্ঠি কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করে।" [১৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলায় দুর্ভিক্ষের কয়েকটি কারণের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি বিশেষ কারণ। অর্থনীতিবিদরা দেখেছেন, দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের যোগান কম ছিল, তবে তার তুলনায় কম ছিল মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। দিন দিন করে এই

ক্ষমতা কমেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মুদ্রা অর্থনীতি চালু করার ফলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক একটি শোষণ ব্যবস্থা চালু করে শাসকরা কৃষকদের ঐতিহ্যাগত ভূমি-হীন করে দেয়। আগে ছিল লাঙ্গল যার জমি তার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হলো জমির মালিক জমিদার। আর -

"জমিদারেরা তাঁদের জমিদারীর নিরাপত্তা চাইবেন, আর চাইবেন তাদের সেই অধিকারের সংরক্ষণ যার দ্বারা তারা অত্যাধিক করের ও আরো বহু রকম আব ওয়াবের চাপে কৃষককুলের রক্ত শোষণ করতে পারবেন। যে গবর্ণমেণ্ট তাঁদের এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন তারই বিশ্বস্ত সমর্থক হবেন তাঁরা। শাসকদের জাতীয়ত্ব কি তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না।" [১৭]

লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে -

"আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই(এদেশের) ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে শান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোন রূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।" [১৮]

ফলে বঙ্গীয় জমিদাররাও তাদের প্রভুদের দুর্দিনে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করেছে -

"১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় সংগ্রামের আঘাতে যখন ইংরেজ শাসন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, তখন বঙ্গীয় জমিদার সঙ্ঘের (Bengal Landholder Association) সভাপতি বড়লাটকে এই আশ্বাস দিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন : 'মহামান্য বড়লাট বাহাদুর' আপনি জমিদারগণের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন।" [১৯]

ফলে এদেশে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বরপ্রাপ্ত জমিদারেরা ছিল বড় বাধা। ইংরেজ এবং জমিদারের অবস্থান ছিল একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

"কোম্পানি উহার শাসনের সংকটকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা একটি নিশ্চিত আয়ের বন্দোবস্ত করিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জনসাধারণের নগণ্য অংশ (ভূস্বামী ও তালুকদারগণ) কৃষক লুণ্ঠনের যে ভাগ পাইল তাহার পরিবর্তে প্রভু ইংরেজ শাসকগণকে কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল।" [২০]

মূলত খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল কৃষকদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক মারণকল যার প্রতিক্রিয়া সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না, পড়লেও ততটুকু পড়ে না যত তার পরিনাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরের আর একটি কারণ ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপন। কারণ রেলপথ স্থাপনের পরে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। রেলপথ স্থাপনের পূর্বের এবং পরের দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ও প্রাণহানির তুলনা করলে দেখা যায় -

"১৮০২ থেকে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫৩ বৎসরে মোট দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ১৩ এবং সেই সব দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ। কিন্তু রেল-পথ স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৬০ থেকে ১৯৭৯ এই ২০ বৎসরে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা হলো ১৬ এবং মৃত্যু সংখ্যা হলো ১ কোটি ২০ লক্ষ।" [২১]

সুপ্রকাশ রায় এর কারণটি ব্যাখ্যা করেছেন -

"ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের ফলে শাসকগণ বৃটেনের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর প্রায় ছয় মাসের খাদ্য এবং সকল বৃটিশ শিল্পের কাঁচা-মালের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতের শস্য বৃটেনে প্রেরণ করিবার বিশেষ সুবিধা লাভ করে। রেলপথের দ্বারা ভারতের বন্দরগুলির সহিত গ্রাম ও শহরের কেন্দ্রসমূহ সংযুক্ত হওয়ায় ভারতের শস্য ক্রমশ অধিক পরিমাণে জাহাজযোগে ইংলন্ডের বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হইতে থাকে।" [২২]

এ ছাড়া উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রেলপথ বসাবার সময় পুরনো সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এসময় রেলপথ বসাবার জন্য বিভিন্ন খাল, জলাশয় এবং নদীর উপর

বাঁধ বসিয়ে রাস্তা করা হয়। শাসক গোষ্ঠির নিকট রেলপথ বসানো তখন গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল, সেচ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। কারণ বণিক শাসকের কাছে খাদ্যশষ্য গ্রাম থেকে শহরে-বন্দরে, তারপর সেখান থেকে সুয়েজ খাল দিয়ে ইংল্যান্ডে পাচার করার জন্য রেলপথ নির্মাণ অতীব জরুরী হয়ে পড়ে।

এ দুর্ভিক্ষের প্রধান একটি কারণ সেচ ব্যবস্থার ধ্বংস -

"ইংরেজেরা এ দেশে আসার পূর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সেচ-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের অনুরূপ ব্যবস্থার থেকে ছিলো অনেকাংশে উন্নত, সুপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত। সেজন্যে ঐ সময়ে ভারতীয় কৃষিও ছিলো পরবর্তী যুগের থেকে অনেক বেশী উন্নত। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী সেচ-ব্যবস্থার ব্যাপক অরাজকতার ফলে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইংরেজদের শাসনামলে জমিদাররা ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার পর থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সেচ-ব্যবস্থা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে চলে।জমিদাররা নিজের জমি ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দিয়ে কেবল মাত্র কৃষক শোষণের দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করার চেষ্টায় সমস্ত চিন্তা এবং শক্তিকে নিয়োগ করার ফলে সেচ-ব্যবস্থার মস্ত অবনতি ঘটে। কৃষকদের নিজেদের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর ভেঙ্গে পড়ার ফলে তাদের পক্ষেও সেচ-ব্যবস্থার কোনো উন্নতি সাধন একক ভাবে সম্ভব হয় না। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে একর প্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসে। এর পরিণামে খাদ্যসঙ্কট এবং দুর্ভিক্ষ ভারতীয় কৃষক জীবনে একটা চিরস্থায়ী স্থান দখল করে এ দেশকে পরিণত করে চির দুর্ভিক্ষের দেশে।" [২৩]

অর্থনীতিবিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিও ছিল এ দুর্ভিক্ষের উল্লেখযোগ্য কারণ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন -

"সরকার পক্ষ যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁহাদের কেনা জিনিসের দাম দিতে গিয়া প্রচুর কাগজি নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন। যাহারা কাজ করে, যুদ্ধের মালপত্র জোগান দেয়, কলকারখানা নানাবিধ যুদ্ধ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহারা সেই কাগজি নোট অজস্র পরিমানে পাইল, তাহা দিয়া মহাস্ফূর্তিতে জিনিষ পত্র কিনিতে লাগিল। দেশের অধিকাংশ লোকেই ইহার অনেক পূর্বে অপেক্ষাকৃত ভাল দাম পাইয়া মাল বেচিয়া দিয়াছে। ফাঁপানো মুদ্রার অংশ তাহাদের হাতে পড়িল না। জিনিষপত্র তাহাদের ক্রয় ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। ... ফাঁপানো মুদ্রানীতির জন্য ভারত সরকার তথা ব্রিটিশ শাসন যন্ত্র দায়ী।" [২৪]

এ ছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল সরকারের বিশেষ অঞ্চলের প্রতি তোষণ নীতি এবং বিশেষ ভাবে দায়ী ছিল বিশেষ শ্রেণীর প্রতি তোষণ নীতি। তোষণ নীতির কৃপা লাভ করেছে কলকাতা শহর আর উপেক্ষা লাভ করে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বর্ধমান সহ সমগ্র বাংলার অনুন্নত অঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল। কলকাতায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে তাদের প্রায় গ্রাম থেকে আসা। সরকার সামরিক সরঞ্জাম এবং যুদ্ধকে সচল রাখার জন্য কলকাতায় এবং সামরিক বিভাগের লোকদের জন্য গ্রাম থেকে সমস্ত খাদ্য এনে কলকাতায় গুদামজাত করে। ফলে গ্রাম হয়ে যায় খাদ্যের বিরল অঞ্চল।

এর পর আসে রাজনৈতিক নেতাদের কোন্দলের কথা। তাদের কোন্দল পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রকটতার জন্য অনেক দায়ী ছিল। এ সময় বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিল ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ফজলুল হক এ মন্ত্রি সভা গঠন করেন। ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক প্রজা পার্টি, হিন্দু মহাসভা, তফসিলী হিন্দু ইত্যাদিকে নিয়ে গঠিত এ মন্ত্রিসভা ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল। আইন সভার বাইরে এ কোয়ালিশনের তেমন কোন প্রস্তাব ছিল না, মূলত এ হক মন্ত্রিসভা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কোন সমর্থন পায়নি,

বরং সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ফজলুল হকের দুর্ভিক্ষকালীন বড় ট্র্যাজেডি -এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভে ফজলুল হক ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে, হক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যায়। এর পর নাজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট এ মন্ত্রিসভায় ৭ জন মুসলমান ও ৬ জন হিন্দু সদস্য ছিলেন, হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ মন্ত্রি-সভায় বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রি নিযুক্ত হন, ফজলুল হকের বহু সংখ্যক সদস্য দ্রুত দলত্যাগ করে এ সময় মুসলিম লীগে যোগদান করে। নাজিমউদ্দিনের মন্ত্রিসভা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তৎপর হয়ে উঠে। সোহরাওয়ার্দী খাদ্য সরবরাহ বিভাগকে জরুরী বিভাগ ঘোষণা করেন। এবং দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক লঙ্গর খানা খোলা হয়। তবে কিছু লঙ্গরখানা ছিল মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। কলকাতা এবং কয়েকটি স্থানে রেশন প্রথা চালু করা হয়। তবু এ অভিযোগ সত্য -

"No steps were taken in India at the beginning of the war to meet any dislocation in production, supply and distribution of food that war might cause so that when imports of rice from Burma stopped due to its occupation by the Japanese and the system of distribution of the domestic suppliers broke down on account of the Denial policy and activities of traders, a tragedy of great magnitude overtook Bengal. In the hour of trial, the country, the people and the administration, both at the Centre and in the Province, were found unprepared to meet the challenge. The result was bewwilderment and chaos which gave

antisocial elements their opportunity to make individual fortunes from human blood and hold their countryman to ransom while a milion and a half poor, helpless and innocent people died a lingering and painful death due to sheer hunger." ২৫

রাজনৈতিক নেতাদের উচিত ছিল এসব সামনে রেখে সমাধানের জন্য তৎপর হওয়া। কিন্তু তা হয়নি। এ ছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সরকারী শোষণ ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে ছিল তা জানার জন্য নিম্নের তথ্যটিই যথেষ্ট -

"... The central Govermnent had made a profit of R.S. 1 crore on wheat brought from the punjab and sold to Bengal". ২৬

প্রবল দুর্ভিক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এ আচরণ আমাদের স্মরণ করায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে পূর্ণিয়ায় এক সনদ তৈরী হয়, সেখানে দুর্ভিক্ষের বৎসরে রাজস্ব শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রায় উপন্যাসে যে কারণটি এসেছে তা হচ্ছে মজুতদারী। এ মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই জানেন, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, সরকার যে যেখানে পেরেছে শস্য আটকে রেখেছে। কারো মনে ভয়, কারো অতিরিক্ত মুনাফার লোভ, কারো সৈন্যদের জন্য রসদ জমা করা। গৃহস্থ কৃষককে দোষ দেয়া যায় না, কারণ যুদ্ধের ফলে অবস্থা তখন এমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যে ঘরে খাদ্য জমা রাখাটা তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবু কৃষকের ঘরে যে খুব বেশী খাদ্য জমা ছিল তা নয়। কারণ সরকারের লোক এসে তখন মজুতদারীর অভিযোগে অতিরিক্ত খাদ্য নিয়ে নিতো। তাছাড়া অনেক সহজ সরল কৃষক প্রথম দিকে বুঝতে না পেরে দাম একটু বেশী পেয়ে ফসল বিক্রি করে ফেলে। সে দাম যে আরো অনেক বাড়বে সে ইঙ্গিত তাদের কাছে ছিল না। কারণ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারীদের তালিকায় তারা ছিল না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

"কৃষক, মধ্যবিত্ত-ক্রেতা দোকানদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত খুব আন্দোলন চলিয়াছে - মিঃ আমেরির দল বলিয়াছেন, মাল মজুত করিয়া রাখিয়া ইহারাই দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছে। আসল গলদ যেখানে, সেদিক হইতে এই প্রকারে সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাজারের সব চেয়ে বড় ক্রেতা সরকার, সব চেয়ে বড় মজুতদারও সরকার এবং সরকারের সাহায্যকারী কলকারখানার মালিক ধনিক সম্প্রদায়।"[২৭]

একটি কথা বলা প্রয়োজন দুর্ভিক্ষ প্রথম শুরু হয় মেদিনীপুর জেলায়। তার প্রথম কারণ ছিল প্রাকৃতিক আঘাত। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর রাত্রিবেলা প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় বিধ্বস্ত হয় মেদিনীপুর জেলা। শস্য, বৃক্ষ, কুঁড়ে ঘর সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ১৯৪৩ সালের জুলাই এবং আগস্টে বর্ধমান জেলার দামোদর নদীতে বন্যা হয়। এই অঞ্চলগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রকটতায় প্রকৃতির ভূমিকা ছিল। এছাড়া 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনও এ মন্বন্তরের একটি অন্য ধরণের কারণ। ১৭৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে বাদ দিলে, ১৯৪২ এর আগস্টের এই বিদ্রোহ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় বিদ্রোহ, অন্য দিকে ব্রিটিশ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সামলাতে হিমসীম খাচ্ছে। বৃটিশের জন্য এই বিদ্রোহ অনেকটা বিপদের উপর বিপদ। এর প্রতিশোধ নেয় শাসকরা একদিকে নব্বই হাজারেরও অধিক বিদ্রোহী গ্রেফতার করে, দশ হাজারের অধিক বিদ্রোহীকে গুলি করে মারে, অন্যদিকে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটিয়ে পরোক্ষভাবে তার বৃহৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এর পর সরকারের আর একটি নীতি দুর্ভিক্ষের জন্য বিরাট সহযোগী হয়েছে। 'ডিনায়েল পলিসি' নামক এ নীতি গ্রহণ করে ব্রিটিশ তার শত্রু জাপানী সৈন্যদের খাদ্য এবং পরিবহন সংকটে ফেলার জন্য। ১৯৪২ সালের মে মাসে জাপানী সৈন্যদের আক্রমনের সম্ভাবনার কথা ভেবে ব্রিটিশ সরকার সমুদ্রতীরবর্তী জেলাগুলি থেকে দশ জনের অধিক বহনযোগ্য সকল নৌকা কেড়ে নেয়। সে সাথে শুরু হয় খাদ্যের 'ডিনায়েল পলিসি', বিভিন্ন এলাকা থেকে চাল সরিয়ে ফেলা। এ প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য -

"শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় কয়েকটি জেলা হইতে ধান সরানো হইল। ধান সরাইলেইতো স্থানীয় লোকের পেটের ক্ষুধা ঐ সঙ্গে লোপ পায় না। খাদ্যবস্তুর সন্ধানে তাহারা ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল, চাউলের দর হঠাৎ খুব বাড়িয়া গেল।"[২৮]

বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বলেন যে, বাংলার গভর্ণর স্যার জন

হাবার্ট মন্ত্রী সভার পরামর্শ না নিয়ে, এমন কি মন্ত্রিসভার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে এক জনসভায় ফজলুল হক বলেন,

> "বর্তমান খাদ্য সংকট পরিস্থিতি আমাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি।' ফজলুল হক আগের সরকার এবং বর্তমান গর্ভণরকে দায়ী করে বলেন, গর্ভণর মন্ত্রি পরিষদের সাথে কোন রকম পরামর্শ না করে অপরিকল্পিত ভাবে জঘন্য 'ডানিয়েল পলিসি' গ্রহণ করে।" [২৯]

সাংবাদিক, গবেষক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী এ কারণগুলি আমরা জানলাম পঞ্চাশের মন্বন্তরের পিছে। এবার শাসকদের একজন প্রতিনিধির একটা বক্তব্য শোনা দরকার। যেখানে তাদের চরিত্র প্রকাশ হয়। ভারত সচিব মি. আমেরি পার্লামেন্টের জনৈক সদস্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে মন্বন্তরের কারণ বলেন -

> "কৃষকেরা বাজারে খাদ্য শষ্য ছাড়িতে চাহিতেছে না। আর পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে লোকে বেশী করিয়া খাইতেছে।" [৩০]

বেশী খাইতেছে কথাটাই আপত্তিকর কারণ ভারতের কৃষকদের অবস্থা আমেরিরা আসার পরে অবনতির দিকেই নামিতেছিল। তৎকালীন মানুষদের(ভারতীয়দের) দৈহিক পরিশ্রম বেশী করতে হত বলে একটু বেশী খেতে হত। কিন্তু তা কী তাঁদের প্রতিনিয়ত জোটত ?

> " ১৯৩৬ সালের তদন্তের ফলে ফ্লাউড কমিশন স্বীকার করেন যে, বাঙলায় কৃষকের গড়পড়তায় পরিবার পিছু মাত্র ৪.৮ বিঘা জমি আছে।" [৩১]

লক্ষণীয় ৪.৮ বিঘা হচ্ছে গড়। পরিবার পিছু এই গড় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। খাজনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উৎপাদন খরচ মেটাবার পর এই কৃষকদের অবস্থা বেশী খাওয়া তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় খাবারটাও পাবার কথা নয়। আমেরির এই বক্তব্যকে প্রশ্ন করা যায়, অতি ভোজন কি তারা করেছে, যারা পঞ্চাশের মন্বন্তরে খেতে না পেয়ে মারা গেল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে অনাহারে যারা মারা গেলেন, তাদের মধ্যে আমেরির এই বাণী যারা শুনেনি তারা ভাগ্যবান। এই আমেরি প্রশ্নোত্তর কালে আবার বলেছেন -

"He had not heard on any death of European British subject among the victims of the present famine in India".[৩২]

আমেরিকে প্রশ্ন করা যেত, ভারতে কি কোন ইউরোপীয়ান ছিল না যার বেশী খাবার অভ্যাস ছিল। যদি থাকে, তবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে সে,অতিভোজীদের পরিণতিতে অর্ন্তভূক্ত হল না কেন? শুধু তাই নয় সম্ভবত অতি ভোজনে অভ্যস্ত উচ্চবিত্ত, মজুতদার, কিংবা কোন ব্রিটিশ সরকারের আমলা অতি ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করে অনাহারে মরেনি। শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন -.

> "মি. আমেরিকে বাংলা গভর্ণমেন্টের সমস্ত ত্রুটির উৎস বলিয়া দায়ী করা চলে, যতদিন সম্ভব, তিনি পার্লামেন্টকে বুঝাইয়াছেন, বাংলার অনাভাব নাই, ... তিনি বাংলার মৃত্যু সংখ্যাও যথা-সম্ভব হ্রাস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" [৩৩]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সমস্ত পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, একটা প্রকট মন্বন্তর না হবার মত কোন কারণই হয়তো আর বাকি ছিল না। সমস্ত আয়োজন দেখে ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট হচ্ছিল যে, শিল্পীরা আগেই তার অশনি সংকেতটা দিয়ে দিলেন।

এবার আসা যাক এ মন্বন্তরের পরিণাম নিয়ে! সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো এ মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলো। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য এ মন্বন্তরে মৃত্যুর পরিমানটা এখনো বিতর্কিত। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

> "সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়া কমিশন স্থির করিয়াছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলাদেশে ১৫ হইতে ২০ লক্ষ নর-নারী অনাহার জনিত ক্ষয় এবং দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত ব্যাপক রোগে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। মৃত্যু সংখ্যা ইহার অপেক্ষা যে অনেক বেশী ইহার আমার বিশ্বাস। যাহাই হউক ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক গত ছয় বৎসরে পৃথিবী ব্যাপী যহা সমরে নিহত হয় নাই। সুতরাং ইহা যে কত বড় গুরুতর দুর্ঘটনা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।" [৩৪]

কমিশন সদস্য ডব্লু.আর.অ্যাকরয়েডের মতে - "মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ"।[৩৫]

কালীচরণ ঘোষের মতে "৩৫ থেকে ৪৫ লক্ষ"।[৩৬]

যা হোক মৃত্যুর সংখ্যা যে পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক, ইহা অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। সব মৃত্যু যে অনাহারে হয়েছে এমন নয়। বাসস্থান ছেড়ে আসা মানুষের ফুটপাথে, পথেঘাটে আশ্রয় নিলে মশার কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হওয়া , এতোদিন খেতে অভ্যস্থ ছিল না এমন আজে-বাজে অখাদ্য খেয়ে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হয়ে যারা যাওয়া এই সব মৃত্যুরও পরোক্ষ কারণ দুর্ভিক্ষ, তাই শুধু অনাহারে মৃত্যু দিয়েই কেবল দুর্ভিক্ষে মৃত্যু সংখ্যা গ্রহণ যোগ্য নয়। এ অসহায় মানুষগুলির মৃত্যু ছাড়াও মন্বন্তরের পরিনাম স্বরূপ আরো বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি হয়, এ গবেষণা পত্রের অন্য অধ্যায়গুলিতে তার বর্ণনা রয়েছে।"[৩৭]

প্রতি বছর বিশ্বের মানুষ ৬ই আগষ্ট তারিখ 'হিরোশিমা দিবস' পালন করেন। বিশ্বব্যাপী 'যুদ্ধ নয় - শান্তি চাই'এর প্রতীক হিরোশিমা দিবস। মানব ধ্বংসী যুদ্ধ নামক মারণ যজ্ঞের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে মানুষ হিরোশিমা দিবসটি পালন করে স্মরণ করিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আনবিক বোমার আঘাতে নিহত "রাষ্ট্র-পুঞ্জের হিসাবে আটাত্তর হাজার"[৩৮] মানুষের উপর মনুষ্য সৃষ্ট আঘাত। "বিস্ফোরণ এবং পরবর্তীতে তেজস্ক্রীয়তার বিষে জর্জরিত হয়ে যারা প্রাণ দিলেন 'জাপান সরকারের পরিসংখ্যানে তার পরিমান দুই লক্ষ ষাট হাজার।"[৩৯] ফ্যাসিবাদের সপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত দেশ জাপানে আনবিক বোমায় নিহত সর্বমোট 'দুই লক্ষ ষাট হাজার' মানুষ। এদের মৃত্যু মানবতার ইতিহাসে একটা বিরাট ক্ষত হয়ে আছে। একই যুদ্ধের পট-ভূমিতে মনুষ্য সৃষ্ট মহামন্বন্তরে একটা পরাধীন দেশের অসহায় দারিদ্রপীড়িত প্রায় পঁয়-ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষ মানুষের তৈরী দীর্ঘ মেয়াদী মারণ কলে ধুঁকে ধুঁকে মরল, তা দিয়ে তৈরী হল না মানবতার সপক্ষে কোন প্রতীক। "পঞ্চাশের মন্বন্তর যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বিস্তৃত কল্পকাহিনী মাত্র।"[৪০] পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্তৃত কল্পকাহিনীর বাইরে কিছু নয়। ফ্যাসিবাদের বিচার হচ্ছে, জেল ও ফাঁসি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা উঠছে। তেমন বিচার হয় ও চাওয়া যেত তেরশ পঞ্চাশের মহামন্বন্তর সৃষ্টিকারী ঠান্ডা মাথার খুনীদের।

এ উপমহাদেশের সে অসহায় মানুষ - যাদের বেশীর ভাগই ছিল অসহায়, অশিক্ষিত, সরল, গরীব চাষী, গরীব গৃহস্থ, স্বল্প বেতনের কারিগর, কম পুঁজির দোকানী, মাঝি-মাল্লা, যারা বুঝে না যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, জিঘাংসা ; তারা জানল না কোন অপরাধে বলি হল তারা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ খুঁজতে গিয়ে যত প্রকার কারণই বেরিয়ে এসেছে তার মূলে আছে যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদ, আর এরও মূলে আছে মুনাফাবাদ। পঞ্চাশের মন্বন্তর যে কোন দিক থেকেই তাকানো হোক না কেন, দেখা যায় এ মহামন্বন্তর ছিল মানুষের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তরে পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর মানুষের কাছে তা কল্পকাহিনী হয়ে রইল। মন্বন্তর যুগে যুগে কল্পকাহিনী হয় বলেই দুর্ভিক্ষ আজো পৃথিবীর বুকে তার ভয়াবহ চেহারা নিয়ে জায়গায় জায়গায় হানা দেয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে বারটি কারণ আমরা দেখেছি, সে বারটি কারণের কয়েকটি এখনও বিরাজমান আছে। বারটি না থাকার মূলে আর কিছু নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও মঞ্চে নেই আপাতত, ঔপনিবেশিক শাসকও নেই। কিন্তু মঞ্চে না হলেও এক ধরনের নীরব যুদ্ধ এখনো চলছে। আজকের যুগেও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের (নিম্ন আয়ের) আয়ের সমপরিমান অর্থ ব্যয় হয় সামরিক এবং সমরাস্ত্র খাতে। তার এক শতাংশ পরিমাণ অর্থ পশু থেকে কিংবা প্রকৃতি থেকে বাঁচার জন্য ব্যয় করে না পৃথিবীর মানুষ। এ ফলাফল প্রমাণ করে মানুষের সব চেয়ে বড় ভয় মানুষকে। অর্ধেক মানুষের আয় যুদ্ধ এবং যুদ্ধবাজ থেকে বাঁচার জন্য ব্যয় করে পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু মুনাফা বাজদের থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবীর মানুষ কোন পদক্ষেপ নেয় না। এখনও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী মানুষের হত্যা হয় মানুষের দ্বারা। কখন পৃথিবীতে মানুষের শত্রু মানুষই হবে না, মানুষের হত্যাকারী মানুষই হবে না - আমরা তার জন্য দায়ী হচ্ছি শিল্পীদের, সমাজবিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রনায়কদের, অর্থনীতিবিদদের - বিজ্ঞানীদের। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণগুলি যেন আমাদের কাছে ইতিহাস না হয়ে ইতিহাস থেকে একটা শিক্ষা হয়, এমনকি বিশ্বের বর্তমান ঘটমান এবং আগমনেচ্ছু দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় এ শিক্ষা।

----- 0 -----

উল্লেখপঞ্জী :

১। ড· বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য,' সাহিত্যলোক কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ·২।

২। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', প্রথম ভাগ। সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ,(চতুর্থ মুদ্রণ,) কলকাতা, ১৯৯৪।

৩। Encyclopedia Britannica, Vol.4. William Benton Publisher, Chicago, 1974, p.46.

৪। অমৃতানন্দ দাস : 'ভারতকোষ'(চতুর্থ খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ·৭৫।

৫। 'এই কারণগুলি উৎকলন করা হল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ সংকলন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৪৪, পৃ·৪-৫ থেকে।

৬। অনুরাধা রায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্প সাহিত্য', অনুষ্টুপ, বর্ষা ১৩৯৬, কলকাতা, পৃ·১।

৭। তসলিমা নাসরিন : ভূমিকা, 'ফ্যান দাও' (সম্পাদিত - কবিতা সংকলন), পুনশ্চ,কলকাতা, ১৯৯৪।

৮। শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলায় মন্বন্তর', এ·মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ·৮১।

৯। Amartya Sen;- 'Poverty and Famine' : An Essay on Entitlement and deprivation, Oxford University Press, Delhi, 1982, Page - 63.

১০। অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ·৩।

১১। শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·১১১।

১২। অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ·৪৫-৪৬।

১৩। তদেব।

১৪। B.M.Bhatia:Famines in India :1860-1965, 2nd Ed.1967' Bombay, p.309-310.

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'বঙ্গদেশের কৃষক', বিবিধ প্রসঙ্গ', বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ.২৯১-২৯২।

১৬। সুপ্রকাশ রায় :'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম; বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা ১৯৯৩ পৃ.১৬।

১৭। মুজফফর আহমদ :'আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি'(প্রথম খন্ড, ১৯২০-১৯২৯), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৬, পৃ.১২২-২৩।

১৮। Radha Kamal Mukherjee: 'Land Problems in India,p.35. উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৩৪।

১৯। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৩৫।

২০। তদেব, পৃ.১৩৬।

২১। তদেব, পৃ.১৭৯।

২২। তদেব, পৃ.২।

২৩। বদরুদ্দীন উমর : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭২, পৃ.৫১।

২৪। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ.৪-৫।

২৫। B.M.Bhatia, ibid, p.309-310.

২৬। Hindustan Standard, New Delhi. Nov.17, 1943.

২৭। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৬।

২৮। তদেব, পৃ.৭।

২৯। দেশপ্রিয় পার্কে মজলুল হকের জনসভার ভাষণ, উৎকলিত অমৃতবাজার পত্রিকা, ৬ই মে ১৯৪৩।

৩০। 'সাময়িক প্রসঙ্গ', 'দেশ,'কলকাতা, ৭ শ্রাবণ, ১৩৫০।

৩১। ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙালী কোথায় চলেছে' সংস্কৃতি ও সমাজ' -১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩৯০, পৃ.৩৩।

৩২।Mr. Amery as answered a number of questions about India at question time in commons; (Quated from : Amrita Bazar Patrika, Nov.12, 1943.)

৩৩। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১১৪।

৩৪। তদেব, পৃ.১২।

৩৫। Ayakroyad. W.R. - 'The Conquest of Famine', London, 1974, p.77.

৩৬। Ghosh, Kalicharan', 'Famine in Bengal' 1770-1943, Calcutta, Indian Associated Publishing Co.Ltd. Calcutta 1944, Page - 137.

৩৭। এ গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায় এবং উপসংহার দ্রষ্টব্য।

৩৮। শ্রীপান্থ: ভূমিকা, 'দায়', (মন্বন্তরের চিত্র সংকলন), পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.১৩।

৩৯। তদেব।

৪০। তদেব।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

মন্বন্তরের উপন্যাস ঃ নান্দনিক সার্থকতা বিচার

'মন্বন্তর'

তারাশঙ্করের(১৮৯৯-১৯৭১) 'মন্বন্তর'(১৯৪৪)[১]সরাসরিভাবে মন্বন্তরের উপন্যাস নয়। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে মন্বন্তরের যে অশনি সংকেতটা এসেছে তারাশঙ্করের মন্বন্তরের ধারা বিবরণী ততটুকুও গড়ায়নি। উপন্যাস প্রায় শেষ হতে চলেছে তখনো মন্বন্তরের প্রকটতা স্পষ্ট হচ্ছে না। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই এ উপন্যাসের উপাদ্য। তারাশঙ্কর যুদ্ধটাকেই মন্বন্তর ধরে উপন্যাসের নামকরণ করেছেন 'মন্বন্তর'। উপন্যাসের বক্তব্যে সরাসরি উপস্থাপিত নগর কলকাতার চারটি পরিবার। পরিবার গুলির জীবনগতি যতটুকু প্রাধান্য পেয়েছে, মন্বন্তর ততটুকু নয়। নায়ক কানাইয়ের পূর্বপুরুষ তথাকথিত বিলাসী অভিজাত বংশ অশুভ পায়তারায় যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে নিয়তির অমোঘ বিধানে তার পচনশীল ক্ষয়, এবং তার থেকে কানাইয়ের নিষ্কৃতি প্রাপ্তি উপন্যাসের প্রধান কাহিনী। নায়িকা নীলা এবং গীতার সূত্র ধরে এবং কানাইয়ের চাকরি সূত্রে উপন্যাসে আগমন ঘটেছে অন্য তিনটি পরিবারের কাহিনী। উপন্যাসের কাল সীমা মাত্র চার মাস। ১৯৪২ এর ডিসেম্বরে 'মন্বন্তর'এর কাহিনী শুরু এবং ১৯৪৩এর মার্চ-এ শেষ। লক্ষণীয় সত্যিকার মন্বন্তর তখন শিশু। প্রতিটি দিনপঞ্জি বাস্তব সময় থেকে 'কপি' করা। এমন কি ডায়রি আকারে শুরু হচ্ছে ঘটনাবলী। রায় বাহাদুর বি মুখার্জীর কাহিনী বাদ দিলে মন্বন্তরের হোতাদের পুরো উপস্থিতিই উপন্যাসের নেপথ্যে রয়ে যায়। গুণ'দা এবং তার স্ত্রী'র দুর্যোগ পরিস্থিতি এবং রক্ষণশীল শাসনের শিকার। গীতার সর্বনাশ এবং পরিণতিই মন্বন্তরের একমাত্র এপিসোড। তারাশংকর উপন্যাসে যে প্রধান দুর্যোগকে চিহ্নিত করেছেন এবং তা পেরুবার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা একক যুদ্ধ কিংবা একক মন্বন্তর নয়। সামগ্রিক যিলিয়ে আতংকময় একটি পরিবেশের দুর্যোগ। তা থেকে নিস্তার লাভে মানুষ দিক-বিদিক। জাপানী বোমা কিংবা জাপানী মেয়ে বৈমানিক যত মুখরোচক কাহিনী হচ্ছে, খাদ্য জোগাড়ে মানুষের ভয়াবহ পরাজয় সেভাবে চিত্রিত নয়। এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ 'অশনি সংকেত'এ অনেকটা সফল। মন্বন্তর-এর কাহিনী বিশ্লেষণে তারাশঙ্কর বিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ভারতের প্রচলিত সনাতন চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কানাইয়ের রক্তের বিশুদ্ধতার যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা খুব প্রকট নয়। কানাইয়ের পরিবারের দুরারোগ্য ব্যাধি অনেকটা কল্পনাপ্রসূত হয়ে উঠেছে। হয়তো

বিংযুধাত্রীর পরিবারের পরবর্তী বংশধরদেরও এ পরিণতি ঘটবে, এক্ষেত্রে কৃতকর্মের শাস্তির ভার দেয়ার জন্য তারাশংকর দ্বারস্থ হচ্ছেন ঈশ্বরের বা নিয়তির অমোঘ বিধানের, কিন্তু বঞ্চিত-শোষিত শ্রেণী কোন শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিপ্লবী হয়ে এগিয়ে আসছে না। শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের কোন ভাষা তারাশঙ্কর উপন্যাসে সৃষ্টি করেননি। যা বৈজ্ঞানিক এ সমাজে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগকে চ্যালেঞ্জের জন্য প্রয়োজন ছিল। এমন কি নায়ক কানাইকে দেখি, মানুষকে কঙ্কনা করে সম্পদ সৃষ্টিকারী-গীতার সর্বনাশকারী হিসাবে অমল বাবুর পরিচয় পাবার পর কেবল তার সংশ্রব এবং ব্যবসায়ী হবার সাধ ত্যাগ করতে। যা নায়কোচিত গুণে মোটেই সমৃদ্ধ নয়। মূলত মন্বন্তরের যে বিস্তৃত পটের আয়োজন উপন্যাসের প্রথমে সম্ভাব্য ছিল, তা হয়নি। পরবর্তীকালে কাহিনী এগিয়েছে মন্বন্তরের বদলে বিভিন্ন দৈনন্দিন বিষয়কে নিয়ে। যার মধ্যে যুদ্ধ, কয়েকটা পরিবারের সমস্যা, কানাইয়ের ত্রিভুজ প্রেম এবং অভিশাপ মুক্তি গুরুত্ব পেয়েছে।

'মন্বন্তর'এর কাহিনী আবদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা খন্ড সময়ে, তার পটভূমি শুধু নগর কলকাতা। তার মুষ্টিমেয় যে ক'টি চরিত্র তারা শহুরে। প্রধান চরিত্র কানাই স্নাতকোত্তর বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানে গবেষণা করে একটা কিছু আবিষ্কার করবে এই ছিল তার স্বপ্ন। ছাত্রাবস্থায় সুবক্তা বলে তার পরিচিতি ছিল। কলেজে অন্যান্য তরুণীর মতো কানাই-এর অনুরক্তা ছিল নীলা সেন, ছাত্র সংসদের উৎসাহী সদস্যা। পাঠ শেষে চাকরির পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির সহকর্মিনী। কানাই ও একই পার্টির কর্মী। পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রথম থেকেই। কিন্তু নিজ বংশের কলুষিত রক্ত নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত কানাই পিছপা হয় নীলাকে জীবনের সাথে বাধতে। নির্ধারিত সাক্ষাৎ বাতিল করলে অভিমানী নীলা ভুল বুঝে কানাইকে। ধরে নেয়, কানাইয়ের সাথে তার অনেক তফাৎ। এর সাথে পরে যোগ হয় নতুন ঈর্ষা যখন নীলা কানাইকে এবং গীতাকে এক সাথে দেখে বিজয়দার আস্তানায়। ঈর্ষান্বিত নীলা এর মধ্যে অলীক স্বপ্ন দেখে সদ্য ঘটনাক্রমে পরিচিত বিদেশী সৈনিক স্টুয়ার্ট আর ম্যাকেঞ্জিকে কেন্দ্র করে। এর আগে স্টুয়ার্ট আর ম্যাকেঞ্জিকে নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল বাবার সাথে নীলার। পরে বিজয়দার গৃহে সমস্ত ঘটনার জট খোলে। নীলা বুঝতে পারে সন্তান সম্ভাব্য গীতার সাথে কানাইয়ের স্নেহময় পবিত্র

সম্পর্কের কথা। এবং কানাই কেন নীলাকে এড়িয়ে চলেছে এতদিন। তবুও ধর্ষিতা গীতাকে সর্বশেষ উদ্ধারের জন্য তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় কানাই। কিন্তু এতটা করুণা নিতে আগ্রহী নয় গীতা। বিশেষতঃ সে যখন নীলার প্রতি কানাইয়ের অনুরাগের কথা জানে। এর পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষায় কানাইয়ের রক্ত নিষ্কলুষ প্রমাণিত হয়। স্টুয়ার্ড ম্যাকেঞ্জিকে নিয়ে নীলাকে এবং গীতাকে কেন্দ্র করে কানাইকে পরস্পরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়। অতএব তাদের মিলনের মাঝে কোন বাধা থাকে না। মূলতঃ এক চতুর্ভুজ প্রেমের মিলনাত্মক পরিণতি দিয়ে শেষ হয় 'মন্বন্তর' উপন্যাস। যে দুর্যোগ সময় ক্ষতবিক্ষত করেছে মানব সভ্যতার ইতিহাস, সেখানে একটা সিনেমাটিক মিলনাত্মক উপন্যাস ম্লান করে 'মন্বন্তর' অধ্যায়কে। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের দুর্বলতার এটা একটা বড় দিক, কানাই নীলার এ পরিণতি পূর্ব পরিকল্পিত মনে হয়। এক অসাধারণ উপন্যাসের প্রস্তুতি নিয়ে মন্বন্তর উপন্যাস শুরু হয়েছিল। যাকে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন –

> "মনে হয়েছিল মহৎ শিল্পী অর্কেস্ট্রায় জীবনের এক বিরাট সিম্ফনি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আশা হয়েছিল তিনি যেমন চণ্ডীমণ্ডপ-পঙ্কগ্রামে পল্লীজীবনের মহাকাব্য রচনা করেছেন, তেমনি মন্বন্তরে বিরচিত হবে নাগরিক জীবনের মহাকাব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, উপন্যাসখানি উপসংহৃত হয়েছে একটি অনুজ্জ্বল চতুর্ভুজ প্রেমের কাহিনীতে। ... তা ছাড়া তারাশঙ্করের দৃষ্টি সেদিন একটি বিশেষ মতবাদের দ্বারা অনেকটা আচ্ছন্ন ছিল বলেই তিনি মহৎ ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক সম্যক দৃষ্টি হারিয়েছিলেন।" [২]

তবু পারিবারিক সমস্যার পথ ধরে উপন্যাসে বার বার অবতীর্ণ হয়েছে মন্বন্তর নামক মানব সভ্যতার একটি সমস্যা। এ সমস্যা উপন্যাসে জোরালো হতে গিয়ে বার বার ম্লান হয়ে পড়েছে। মন্বন্তরের শুরুতেই নায়ক কানাইয়ের উপলব্ধি - "বিশ বছরে ধনী যে ধন উপার্জন করত - এক বৎসরে সেই ধন সে সঞ্চয় করছে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরে বিশ বৎসরে বঞ্চনায় বঞ্চিত হচ্ছে দরিদ্রের দল। বিশ বৎসরের অভাব - অন্নের বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ুরও অকস্মাৎ নিষ্ঠুরতম হিংস্র মূর্তিতে এসে আক্রমণ করেছে পৃথিবীর মানুষকে। বিশেষ করে এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য মানুষগুলিকে।" (মন্বন্তর, পৃ•১৩৯)।

কানাইয়ের আদর্শবাদ এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয়। দুর্যোগের অনেক দৃশ্যাবলী তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তার বংশের লালসা বিলাসের এবং সম্পদ অর্জনের অতীত ইতিহাস তার চেতনাকে সর্বদা কষাঘাত করেছে। পাপের বিষে তার রক্ত কলুষিত এ মানসিক যন্ত্রণায় সে সদা ম্রিয়মাণ। এমনকি নীলাকে জীবনের প্রতিপক্ষে দাঁড় করাতে সে সাহস পাচ্ছেনা, কিন্তু সে আদর্শবাদী কানাইকেও দেখি এক সময় দারিদ্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এবং মুনাফা বাজারের পাগলা ঘোড়াকে ধরার জন্য রায় বাহাদুরের ব্যবসায় সহযোগী হতে। দৈবক্রমে অমল বাবুই গীতার সর্বনাশকারী হওয়াতে কানাই অমল বাবুর প্রতি ঘৃণাবশত তার সংশ্রব ত্যাগ করে এবং ব্যবসার ইতি টানে সেখানেই। যুদ্ধের মুনাফা বাজার এমনি বাজার যার লোভ অনেক আদর্শবাদীকে আদর্শচ্যুত করেছে। মানুষের মাঝে যে সুন্দর মানবিক মন থাকে বিলুপ্ত ঘটে তার। স্বার্থ এবং লোভে মানুষ অন্ধ হয়ে ওঠে। অপরের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির অপরিমেয় চাহিদা তাকে পাশবিক প্রেরণা যোগায়। রায় বাহাদুর বি. মুখার্জীর ব্যবসার লেখক পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে - "কাঠের ব্যবসা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে তেঁতুল, তুলো, অভ্র, লোহা প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুর কেনা-বেচা ব্যবসায়ের রস সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছেন ইট, কাঠ, লোহা ও সম্পদের এই ত্রিলোত্তমা।"(মন্বন্তর, পৃ.১৪৭)।

বি.মুখার্জীর ব্যবসার তালিকায় এতোদিন আহার্য খাদ্যদ্রব্য নেই, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে তিনি এবার মানুষের আহার খাদ্য তথা চালের মজুতদারীতে নেমে পড়েন। বি. মুখার্জীর নতুন ব্যবসার বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক "তিনি এই যুদ্ধের বাজারে নতুন নতুন ব্যবসা খুলে চলেছেন, সম্প্রতি ফেঁদেছেন ধান চালের ব্যবসা। প্রকাণ্ড কয়েকটি গুদামে রাশি রাশি চাল মজুত করেছেন। শুধু চাল নয় আটা চিনিও আছে।" (মন্বন্তর, পৃ.১৪১)। যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের সময় এমন ধুর্ত কয় ব্যবসায়ী ছিলেন যারা তাদের পুঁজি অতি লোভে মজুতদারীতে খাটায়নি। বি.মুখার্জীর ছোট ছেলে অশোক গর্ব করে বলেছে "বাবা বলেছিলেন কি জানেন ? ওয়ার মার্কেটে সব চেয়ে লাভের সময় এইবার আসছে। এতোদিন তো শুধু তোড়জোড় করতে গেল। বিশেষ করে চাল, আটা, চিনি এই সবের ব্যবসাতে, বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন আমাদের গুদামের চাবি

যদি এক সপ্তাহ খুঁজে পাওয়া না যায় তবে আট দিনের দিন বাংলাদেশের উনোন জ্বলবে না।

বল কি ?

উঃ বাবা যা স্টক করেছেন চাল।" (মন্বন্তর, পৃ·১৬৯-৭০)।

তবু কর্তা বি·মুখার্জীর ক্ষোভ সত্যিকার লাভটা করে যাচ্ছে ইউরোপীয়ান কোম্পানী। তিনি কানাইকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন "জানেন মাষ্টার মশাই, আজ যদি আমরা স্বাধীন থাকতাম, তবে এই যুদ্ধের বাজারে কি লাভ যে হত, সে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। লাভ করছে ইউরোপীয়ান কোম্পানী। চাবি কাঠি সব তাদের হাতে অথচ যোগ্যতায় আমরা তাদের চেয়ে খাটো নই।"(মন্বন্তর, পৃ·১৫১)।

তারাশংকর এখানে শৈল্পিক ভাবে চিত্রিত করেছে বি·মুখার্জির স্বাধীনতার স্পৃহা এবং উদ্দেশ্য। এই ইংরেজ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মিলিত চক্রান্তে বাংলাদেশে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। তারাশংকরের 'মন্বন্তর' যখন প্রকাশ হচ্ছিল তখনো যুদ্ধ বাজারের উপর কোন গবেষণা অনুসন্ধান জোরালো ভাবে হয়নি। সত্যিকার মন্বন্তরের কারণ, ইতিহাস ও ভয়াবহতা তখন প্রকাশিত হয়নি। শাসকরা দায়ী করছে একে অন্যকে, কিন্তু তারাশংকর যে ইঙ্গিত মজুতদারী ব্যবসার দিয়েছেন পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। বি· মুখার্জির চাবি হারাতে হয়নি, চাবি হাতের মুঠোতে ধরে রেখে দেখেছিল আট দিনের দিন বাংলাদেশের উনোনে আগুন না জ্বলার দৃশ্য। উৎকৃষ্ট উপন্যাস মাত্রই একটা সময়ের প্রতিচ্ছবি। সমাজের শোষিত শ্রেণীর আর্ত চিৎকারের প্রতিধ্বনি।

> "তারাশঙ্করের মন্বন্তর এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নগর কলকাতার সভ্য মানুষের কলংকময় সমাজ ব্যবস্থার যে নিপুণ চিত্র পাওয়া যায় তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক অবক্ষয়ের দলিল হিসাবে টিকে থাকবে। প্রাত্যহিক এবং সমসাময়িক জীবনের ঘটনা নিয়ে মন্বন্তর উপন্যাস রচিত। 'মন্বন্তর' লেখার আগেই সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে মানুষের জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে ধরা তারাশংকরের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।" ৩

মন্বন্তর যে বড় মাপের উপন্যাস হিসাবে আলোড়ন তুলেছে তা নয়, তারাশংকরের 'কবি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'গণদেবতা', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাসের পাশে 'মন্বন্তর' কখনো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে আবেদন রয়েছে অন্যখানে। তারাশংকর লেখনীর চেতনায় তার এতোদিনের রাজনৈতিক দর্শনকে এখানে এনে উপস্থাপন করেছেন বিতর্কিত বিশ্বাসে। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ এ উপন্যাসের সাদামাঠা, কিন্তু মানুষের জীবনের সুবর্ণ বৈজয়ন্তী আশাবাদ এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী তারাশংকর এ উপন্যাসে সাম্যবাদীদের নায়ক নায়িকা করে দুর্যোগ কালের প্রেক্ষাপটে ত্রাণকর্তা হিসাবে অবতীর্ণ করায়।

> "আনন্দ বাজারের পূজো সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায়। এই উপন্যাসের নায়ক কম্যুনিজম বা সাম্যবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু পরবর্তীকালে লেখক বলেছেন এই উপন্যাসের নায়ক বিজয়ের সঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির যে কোন সভ্য বা সক্রিয় কর্মীর আদর্শগত মিল নেই।" [৪]

কিন্তু ইতিহাসের ভয়াবহ এ দুর্যোগ যে তারাশংকরের সমস্ত কিছু ওলট পালট করে দিয়েছিল সে তো সত্য। তারাশংকর এতোদিনের সাধুভাষা রীতি ত্যাগ করে চলিত ভাষায় লেখা শুরু করেন। সমাজের বৈষম্য পীড়িত মানুষের আর্তচিৎকারে দিক-বিদিক হয়ে জাতীয়তাবাদী তারাশংকর সাম্যবাদের প্রতি হৃদ্যতা জানিয়েছেন সে কী অস্বীকার করা যায় ? প্রচন্ড ধাক্কা মাত্রই মানুষকে স্থানচ্যুত করে। চলতি ভাষা প্রয়োগ, সাংবাদিকতা রীতি, সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষকারী হয়ে বিশ্লেষণ, সাম্যবাদীদের মহত্ব প্রকাশ, সামগ্রিক মিলিয়ে 'মন্বন্তর' তারাশংকর সৃষ্ট সাহিত্যে অভিনব প্রয়োগ। মন্বন্তর উপন্যাসের বৈশিষ্টের উজ্জ্বলতা এখানেই। রবীন্দ্রনাথের মত বিচিত্র বিষয়ের প্রয়োগ পরীক্ষণ নয়, নেহায়েত বাস্তব পৃথিবীর প্রত্যক্ষ আঘাত তারাশংকরকে মন্বন্তরের মত ভিন্ন ধর্মী উপন্যাস সৃষ্টিতে প্রভাবিত করে। সমালোচকের ভাষায় -

> "সে যুগের তুলনায় উপন্যাসটি বেশ নতুন ধরণের ছিল।" [৫]

শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন –

"সংবাদ পত্রের স্তম্ভ ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ক্ষেত্র, তাহাদের উপন্যাসের পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত করায় উপন্যাসের পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।"[৬]

অনুরাধা রায় মন্তব্য করেন -

"লেখকের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যক্ষণ তাঁকে এমনই আলোড়িত করে যে তিনি সাধারণ উপন্যাস লিখনের নিয়ম কানুন না মেনে নিজেই স্থানে স্থানে মন্তব্য করতে শুরু করেন। তা ছাড়া এতদিন সাধু ভাষা রীতিতে অভ্যস্ত তারাশঙ্কর বিষয়বস্তুর তাগিদে এই প্রথম গ্রহণ করলেন চলতি ভাষা।"[৭]

মন্বন্তর উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে নিপুণতা লক্ষণীয়। কানাই, নীলা সেন, বিজয়দা, গীতা, অমলবাবু, রায়বাহাদুর বি.মুখার্জি, সরোজিনী, হিরেন, নেপী, দেবপ্রসাদ, ঘটকী বামুনদি, স্টুয়ার্ড, ম্যাকেঞ্জি প্রভৃতি চরিত্র বেশ স্পষ্ট, এমনকি শিশু চরিত্র অশোক সামান্য উপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেছে বেশ জোরালো ভাবে। আধুনিকতার দ্বন্দ্বে হতাশায় বিক্ষত নীলার বাবা দেবপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াইয়ের মতো ঘটকী বামুনদি, দেশপ্রেমিক তরুণ নেপী, চিরকুমার বিজয়দা, গীতার বাবা প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, দারিদ্রের বলি গীতা, বস্তুবাদী চরিত্র সরোজিনী, বিদেশী সৈনিক স্টুয়ার্ড, ম্যাকেঞ্জিপ্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রও উপন্যাসে বেশ উজ্জ্বল। তবে রায় বাহাদুর বি.মুখার্জি কিংবা ছেলে অমলবাবু বলিষ্ঠ খলচরিত্র হয়ে ফুটে ওঠেনি। ফলে উপন্যাসে শক্তিশালী কোন খল চরিত্র নেই। অমলবাবু লম্পট, দুর্দান্ত ব্যবসায়ী, পিতার যথার্থ উত্তরসূরী, তবে তার একটি গুণ আছে, সামান্য সময়ের মধ্যে সে কানাইকে আপন করে নেয়। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। অর্থের বিনিময়ে সে কেবল যে গীতার সর্বনাশ করেছিল তা নয়, রূপসী রমণী মাত্রই তার কাছে কামনার বস্তু। তাদের দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণে সে সচেষ্ট। যেমন, গ্রামে পল্টনের ছাউনি পড়েছে, কিছু লোক বাস্তু থেকে উৎখাত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। কানাই ও অমলবাবু গাড়ী নিয়ে যাচ্ছে, পথে তাদের সাথে দেখা। অমলবাবু সহানুভূতি মিশিয়ে বলেন -

''তোমরা যদি থাকবার জায়গা চাওতো আমি জায়গা দিতে পারি। 'পুর জান ?
— পুর - ? জানি।
— ওখানে রায় বাহাদুর বিভূতিবাবুর বাগানে যেয়ো। আমি যাচ্ছি সেখানে। সেখানে থাকবার জায়গা পাবে। এখন আমাদের টিনের ছাউনির তলায় থাকবে। তারপর ঘর করে নেবে। ••• গাড়ীতে উঠে অমলবাবু বললে ওই সুশ্রী মেয়েটিকে কিন্তু ওদের মধ্যে মানাচ্ছিল না।''(মন্বন্তর, পৃ•১৭৩)।

মন্বন্তরের শিকার চরিত্রগুলির মধ্যে গীতা সবচেয়ে ট্র্যাজিক চরিত্র। গীতা চরিত্রের কথা বলতে গেলে আর একটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা'র জহু। এই দুইটি কিশোরী দুর্ভিক্ষের নির্মম শিকার। দুজনেরই বাবা কিংবা মা মেয়ের সম্ভ্রমকে বিসর্জন দিতে রাজী হয়, বাঁচার সর্বশেষ উপায় হিসাবে। জহু কামনার শিকার হয় অপরিণত অবস্থায়। যদিও তার মা তাকে লোকটার কাছে পাঠায়নি, সে মায়ের ওপর রাগ করে গিয়েছিল। কিন্তু গীতাকে তার মা সরোজিনীই দেহ বিকোতে পাঠিয়েছিল।

''বহু কষ্টে গীতা যা বললে তা শুনে কানাই পাথর হয়ে গেল। ওই ঘটকী তাকে ••• মা জানে কানুদা, মা জানে। ••• সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।(মন্বন্তর, পৃ•১৬১)।

ঠিক যেন একই''এপিসোডে'র পুনরাবৃত্তি 'ক্ষুধা ও আশা'য় —

''গলাখাকারি দেয় হানিফ, বলল, রাইতে একজন দালাল আইয়ে।

— মেয়েলোক কিনার দালাল। কিছু যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে আগের কথার জের টেনে বলতে থাকে হানিফ, জিনিশ বুইঝা দাম। দশ পনের বিশ তিরিশ দুইশ তিনশ পাঁচশ পর্যন্ত। জহুরে বেচবা ?
— ফাতেমা চুপ মেরে থাকে। এর পর, সত্যিকার নিরীহের মতোই জিগগেস করল, যাইয়া নিয়া কি করে ?
— কি করে বুঝতা পার না ? হানিফ তিতা গলায় বলল, নডি বানায় নডি। বহুৎ পয়সার কারবার।'' (ক্ষুধা ও আশা, পৃ•২৮-২৯)।

গীতা ক্লাশ সেভেন মাত্র পড়েছে। সে কানাইয়ের বোন উমার সহপাঠী। গীতাদের মতো মেয়েদের যুগে যুগে সহজলভ্য করার এক চক্রান্তকারী খেলা যেন দুর্ভিক্ষ নামক

দুর্যোগ সৃষ্টি। কানাইয়ের কথায় বিজদা বলছেন -

"তবে তুই ওকে এমন ভাবে নিয়ে এলি কেন ?

নিয়ে এলাম কেন ? এই কথা—

... কিন্তু দশ দিন পরে ওটা সয়ে যেত।" (মন্বন্তর, পৃ.১৬৫)।

কি সাবলীল বক্তব্য । অথচ আকাল না হলে এ ছিল অভাবনীয়। গীতা কানাইয়ের অকৃত্রিম সাহায্যে জীবনটাকে টেনে চলে। কিন্তু সুখ, সুখের নীড়, আপনজন কিছুই আর তার আপন নয়। সব অলীক হয়ে যায়। গীতার পরিণাম ভাবায় কানাইকে, বিজয়দাকে। কিন্তু এ সমাজে তারা সাধারণ কর্মী, কর্তা নয়। যারা কর্তা গীতারা তাদের কাছে ভোগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। অমল বাবুরা, যারা একদিকে মানুষের মুখের আহারকে শোষণ করে উপার্জন করছে অর্থ, অন্যদিকে সে অর্থ দিয়ে শোষণ করছে মানবতাকে। সে শোষণের উপার্জিত অর্থ, ব্যয় হচ্ছে মানুষের সুপ্ত শোষণের পথে।

এ পৃথিবীর পথে পথে ছড়িয়ে আছে অমলবাবুরা। তারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন তারা শংকর —

"হঠাৎ তার মনে পড়ল টলস্টয়ের Resurrection এর নায়ক প্রিন্স দ্য মিট্রির কথা। ধনী সমাজের এক ব্যাধি পৃথিবীর সর্বত্র। — "now the purpose of women, all women except - those of his own family and the wives of his friend, was definitely one ; women were the best means toward an already ... Experienced enjoyment." (মন্বন্তর, পৃ.২৩৬)।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তারাশংকর সপরিবারে কলকাতায় থাকতেন। তারাশংকরের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন মুটামুটি সচ্ছল, উন্নতির দিকে। কারণ তারাশংকরের ছেলের কথা -

"প্রথম যখন আমরা কলকাতার বাসাতে এলাম সে সময় (১৯৪০ - গবেষক) মাসিক খরচ প্রয়োজন হতো দেড়শো পৌনে দুশো টাকার মত। ঐ টাকাটাও সেদিন বাবার পক্ষে উপার্জন করা খুব সহজ সাধ্য ছিল না।

... অবশেষে একদা বরাণগরে কাশীনাথ দত্ত রোডে একটি ছোট দোতলা বাড়ীর মালিক হয়ে গেলেন (তারাশংকর) ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে।

... এরপর ১৯৪৫-৪৬ সাল। তখন লেখক হিসাবে তারাশংকরের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে 'দুই পুরুষ' নাটকের সার্থক অভিনয় এই ধনী সমাজের মধ্যে বাবার অন্য এক বিশেষ ধরণের মর্যাদা এনে দিয়েছে। তখন গাড়ীও হয়েছে তার।" [৮]

দেখা যাচ্ছে উনিশশ চল্লিশের পর থেকেই তারাশংকর কলকাতায় স্থায়ী উপার্জন এবং সচ্ছলতা লাভ করে চলেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের খুব বিস্বাদ পরিণতি 'মন্বন্তরে' সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নি। তারাশংকর যে পরিবেশে বড় হয়েছেন, সেখানে অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে জীবনের কিছু সময় কেটেছে, কিন্তু প্রকট আর্থিক কষ্ট কখনো ছিল না। লাভপুরের ছোট খাট একটা জমিদার বংশে তারাশংকরের জন্ম। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন তারাশংকর। নির্মমতার চেয়ে মানুষের প্রতি তার ছিল আন্তরিকতা, মানবিক আচরণ। অহিংসাবাদী মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশত তিনি মন্বন্তর উপন্যাসের শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধীকে এমন ভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে তিনি সমালোচকদের কাছে বিশেষ আদর্শবাদী বা প্রচারবাদী হয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর অনশন এবং গুণদার স্ত্রীর গান্ধী ভক্তি উপন্যাসের কাহিনীর সাথে আরোপিত সংযোজিত বলে প্রতীয়মান হয়। তারাশংকর লেখকদের দায়িত্ব সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন না তা নয়। -

"১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তারাশংকরকে সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়। প্রথমটি হয় দিল্লীতে এবং দ্বিতীয় সম্মেলন হয় কলকাতায়।

... মাদ্রাজে তারাশংকর তাঁর ভাষণে বলেন - I said, the sprit of the writer is the song of freedom, we have fought against Imperialism and Colonialism and will con—

tinue to fight against all injustice and wrongs to humanity social and political, against all aggression on life in any form". [৭]

'মন্বন্তর' এ সবচেয়ে ট্র্যাজিক চরিত্র গীতা। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সের গীতাকে লেখক পরিচিতি করাচ্ছেন পাঠকের সাথে কানাইয়ের বোন উমার বন্ধু হিসাবে। গীতা যে সময়টাতে যৌবনে পদার্পণ করে, সেটা দুর্ভিক্ষের সময়। তার জীবনের সকল ট্র্যাজেডির মূলে এটা বড়ো কারণ। গীতার পূর্বপুরুষরা সবাই ছিল ক্রমানুয়ে স্বচ্ছল ও সম্মানীয়। তার প্রপিতামহ ছিলেন নিষ্ঠাবান খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তাকে ডেকেছিল অধ্যাপনা করবার জন্য। ম্লেচ্ছের চাকরী তিনি গ্রহণ করেননি। গীতার পিতামহ করতেন গুরু-গিরি, এই পূর্বপুরুষগুলির ব্রহ্মত্র ছিল, পাকা একতলা বাড়ী ছিল, নামডাকও ছিল। গীতার বাবা প্রদ্যোত ভট্টাচার্য প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে প্রথমে সওদাগরি অফিসে চাকরি ধরলেন। পরে চাকরী ছেড়ে নামলেন স্বাধীন ব্যবসা দালালীতে। দালালী থেকে ধরলে 'সেল পারচেজ বিজনেস'। তারপর মাথায় কুবুদ্ধি এল। বাজারের দেনা ফাঁকি দিয়ে পাওনাটা সমস্ত গ্রাসের প্রত্যাশায় ইনসলভেন্সি ফাইল তৈরী করে। তারপর পৈত্রিক বাড়ী বিক্রি করে স্ত্রীর নামে কলকাতায় সৌখিন বাড়ী তোলে এবং বাড়ীতে বসে কেবল ইলিশ, ভেটকীর ফ্রাই, মটন-মাংশের কালিয়া কোর্মা, রামপক্ষীর কাটলেট খেয়ে কর্মহীন দিন যাপন শুরু করে। কিন্তু আরম্ভ হয় মামলা। মামলায় ফাঁকি দেবার ব্যবস্থার মধ্যে গলদে ফাঁক বেরিয়ে পড়ল। বাজারের পাওনা, মামলার খরচ সুদ সমেত মিটাতে গিয়ে ব্যাংক শূন্য হয়ে স্ত্রীর নামে বেনামী বাড়িখানা পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। তারপর একটা চাকরি নেয়। নিজের বাড়ী ছেড়ে ভদ্রপল্লীতে একটা বাসা নিয়ে হাঁপ কাশি নিয়ে অফিস করে। সস্তার বাজারে পঁচার ইলিশও আনত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তেলে ভাজাও খেত। হয়ত ওভাবে জীবনটা কেটে যেত, কিনতু ইউরোপে এসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্যবসার বাজারে বিপর্যয় ঘটল। রিট্রেঞ্চমেন্ট আরম্ভ হল। রিট্রেঞ্চমেন্টের প্রথমেই প্রদ্যোতের

চাকরি যায়। বাসা নিয়ে হয় বস্তিতে। বস্তিটা হচ্ছে লেখকের ভাষায় - "নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যারা বিত্তহীন হয়ে এখন আসলে দরিদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অথচ তাদের জীবনের রীতি-নীতি গ্রহণ করতে লজ্জা অনুভব করে এবং দেহ মনে পীড়িত হয় তাদেরই বস্তি।" (মন্বন্তর, পৃ.১০৫)। গীতার বয়স যখন আট-দশ তখনো প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের অবস্থা ভাল ছিল। কারণ তখনো প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের চাকরি ছিল। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪২ সালে গীতার বয়স যখন চৌদ্দ পনর, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য পয়সার অভাবে তখন আর তেলে ভাজা খায় না। অন্ন দুবেলা সব দিন আর পেটে পড়ে না। এ দুর্যোগে পরিবারে সর্বনাশের শেষ আয়োজন আগমন ঘটে ঘটকী বামুনীর, গীতাকে দেহ ব্যবসায় নামাবার ইচ্ছা নিয়ে সে এসেছে। লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন এ ভাবে -

"প্রৌঢ়া ঘটকী বসে আছে। সে সহানুভূতির অনেক কথা বলে যাচ্ছে। আশ্বাস দিচ্ছে। ... প্রদ্যোত হাঁপাতে হাঁপাতেই বললে - বামুনদি, তুমি যাও, তুমি এখন যাও। প্রৌঢ়া বললে - আচ্ছা, আবার আসব, হীরেন, তুই আয়। সের খানেক চাল আছে নিয়ে আসবি।" (মন্বন্তর, পৃ.১১৭)।

ইতিহাসের দুর্যোগ সময়, ভাগ্য এবং বাবার আদর্শহীনতা গীতাকে ভাগ্যহারা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তর না হলে গীতাও হতে পারতো নীলার মত মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন চাকরিজীবী। নেপীর মতো তার ভাই হিরেনও হতে পারত একজন দেশকর্মী। কিন্তু বস্তির পরিবেশ তাদেরকে করেছে ভাগ্যের শিকার। মা সরোজিনী, ভাই হীরেন, বাবা প্রদ্যোত তিনজনের কেউই সুস্থ মনমানসিকতা নিয়ে হাসি-খুশীর সুখ-দুখের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় না। ভাই হীরেন সে কানাইকে ছুরিকাহত করে যে কানাই তার একমাত্র দেবতাতুল্য আশ্রয়দাতা। মা সরোজিনী এবং বাবা প্রদ্যোত ভট্টাচার্য তাকে পাঠায় দেহ ব্যবসায়ী বামুনদির কাছে। গীতা পরিবারের কোন সদস্যের কাছ থেকে সত্যিকার স্নেহ, ভালোবাসা, আন্তরিকতা লাভে ব্যর্থ হয়। এ সবের অভাব তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। মন্বন্তর এবং বিশ্বযুদ্ধ যে হাজার হাজার মেয়েকে সম্ভ্রম হারা করেছে, গীতা তাদেরই প্রতিনিধি। এ চরিত্রটি সৃষ্টি না হলে সমস্ত

উপন্যাসটা ইতিহাসহীন হয়ে যেত। মনন্তর চিহ্নিত করার জন্য 'মনন্তর' উপন্যাসে এ জন্য গীতাই প্রধান গ্রুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

বলা যায় নীলা চরিত্র নিয়ে. নীলা এ উপন্যাসের নায়িকা। গীতা-কানাই-নীলা-ষ্টুয়ার্ড-ম্যাকেঞ্জি এ চরিত্রগুলিকে ঘিরে প্রেমের এবং দ্বন্দ্বের যে আবহ সৃষ্টি হয় নীলা তার কেন্দ্র। মধ্যবিত্ত পরিবারে নীলার জন্ম। পরিবারকে সাহায্যের জন্য শিক্ষিতা নীলা স্কটিশ থেকে বি.এ. পাশ করে সাপ্লাই অফিসে চাকুরী নেয়। তার উপার্জিত অর্থ গ্রহণে তার বাবা দেবপ্রসাদ কুন্ঠিত। কারণ শিক্ষিত মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে সুখী দম্পতি হয়ে চাকরি করলে তিনি মনে সুখ পেতেন, কিন্তু এখন বিবাহ-যোগ্য মেয়ে চাকরি করে সাহায্য করছে তাকে। তবু আদর্শবাদী দেবপ্রসাদ মেয়েকে নিয়ে অনেক গর্বিত, আশাবাদী। মেয়ের প্রতি তার ভালোবাসা অপরিসীম ছিল। হঠাৎ দেবপ্রসাদ ভুল বুঝলেন মেয়েকে, থিয়েটার হলে বিদেশী সৈনিক ষ্টুয়ার্ড আর ম্যাকেঞ্জির সাথে নীলাকে দেখে। দেবপ্রসাদ চরম আঘাত পেলেন। সে আঘাত তিনি মনে মনে সহ্য করলেন না, নীলাকে ভর্ৎসনা করলেন। অভিমানী নীলা নিজের কোন দোষ খুঁজে পেল না। ভাবলেন, বাবাই তার চরম অপমান করলেন। বাবার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে গেল চিরতরে। গিয়ে আশ্রয় নেয় বিজয়দার আস্তানায়। সেখানে গিয়ে পেল আর এক আঘাত, যখন কানাই আর গীতাকে দেখল একত্রে বিজয়দার ওখানে স্থান নিতে। অবশ্য পরে এ ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়। তার প্রিয় কমরেড, কানাইয়ের সাথে তার মিলন ঘটে। নীলার জীবনের উজ্জ্বল দিক কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসাবে তার তৎপরতা। এই তৎপরতা গোপাল হালদারের মনন্তর ত্রয়ী'র নায়িকা বলিষ্ট চরিত্র সুধা গুপ্তার সাথে তুলনীয় হবার কাছাকাছি। ছোট ভাই নেপীকেও নীলা পার্টিতে নিয়ে যায়। আবেগ পরায়ণ নেপী দিনরাত রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নেপীর উপর বাবা অসন্তুষ্ট হলেও নীলা নেপীকে স্নেহ এবং উৎসাহ দিয়ে যায়। মনন্তরের প্রেক্ষাপটে নীলা ভীরু মানুষদের প্রতি তীক্ষ্ণ ক্ষোভ অনুভব করে, "এক এক সময় নীলার মনে হয় ওদের (ভিক্ষুকদের) ডেকে রূঢ়তম তিরস্কার

করে বলে - ওরে হতভাগ্যের দল - মৃত্যু তো তোদের অনিবার্য। একবার ক্ষেপে ওঠ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে। তা না পারিস - তোরা লক্ষ লক্ষ মানুষ একবার চিৎকার করে বল্ - নর খাতক - তোমরা নরখাতক - তোমরা নরখাতক।" (মনুন্তর, পৃ-৩২৬)।

শাসক, মজুতদার, কালোবাজারীদের প্রতি প্রতিবাদের ভাষা উপন্যাসে আর কোথাও জোরালো হয়নি। যদি নীলা মনের এ ক্ষোভ তাদের জানিয়ে দিত, তবে হয়ত একদিন তারা প্রতিবাদী হওয়ার প্রেরণা পেত, তাদের পিছনে কোন শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করত। তাদের মেরুদণ্ডে শক্তি সংস্কারিত হত। কিন্তু তারাশঙ্কর নীলার এ ক্ষোভকে নীলার মনের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখলেন। তবে হেরল্ড অর্থাৎ একজন ইংরেজের মুখ দিয়ে প্রকাশ করলেন আসল সত্যটা। এ জাতীর দুর্বলতাটা ইংরেজরা যে জানতেন তাই প্রকাশ করলেন তারাশঙ্কর। যেন এ প্রসঙ্গে হেরল্ডের ধারণাই ধ্রুব সত্য - "শত শত বর্ষ ধরে যে পরাধীনতা এ জাতিকে পঙ্গু করে তুলেছে, তারা জাগার জন্য যে শিক্ষা শক্তি তাদের প্রয়োজন তা তারা লাভ করতে পারেনি। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণী থেকে যে শক্তির অনুপ্রেরণা নেতৃত্ব তাদের পাওয়া দরকার ছিল, তাও তারা পাচ্ছে না। উপরন্তু ধনীদের চাপে তারা চিরদিনই ভয়ে বোবা হয়ে থাকে। নীলাকে হেরল্ড বলছে - " আপনাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা বড় গরীব, এবং গরীব বলে তাদের আপনারা অস্পৃশ্য করে রেখেছেন যার ফলে তারা অত্যন্ত ভীরু। এমন কি তারা নিজেরা নিজেদের মানুষ বলে ধারণা করতে পারে না।

লাজুক নেপী এবার মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল, বললে - কিন্তু আমাদের দেশ একদিনে, এই ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। জেম্‌স এবার বললে এই বিতর্কের ভয়েই বোধ হয় হেরল্ড কথাটা বলছিলেন না।" (মনুন্তর, পৃ-২০৪)।

নেপীর এ বয়সে এ উপলব্ধি, নতুন প্রজন্মের সচেতনতার ইঙ্গিত। এই সচেতনা তার সব চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা, ফলে সে দিনরাত রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে

নামে মাত্র বি·এস·সি ক্লাসের ছাত্র। মানুষকে যুক্তিদানের নেশায় সে পরিবারের মায়া ত্যাগ করেছে। ঘরে কখন আসে কখন যায় তার কোন ঠিক নেই। বাবার ভয়ে গভীর রাত্রে আসে। মৃদু সুরে নীলাকে ডাকে। একদিন গভীর রাত্রে এমনি ভাবে নেপী নীলাকে ডাকে, ডাকে দেবপ্রসাদের ঘুম ভেঙে যায়। ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি পারেননি। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন - বেরিয়ে যা বলছি - বেরিয়ে যা। খবরদার নীলা বারণ করছি আমি, দরজা খুলে দিবি নে।
দরজা খুলতে গিয়ে নীলা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মা নেমে এসেছিলেন, তিনি ও দরজা খুলতে সাহস করেন নি। পিছন পিছন দেবপ্রসাদও নেমে এসেছিলেন। নেপী অদ্ভুত, নেপী তখন মৃদু সুরে নীলাকে ডেকে বলেছিল, দরজা খুলতে হবে না, জানলার ফাঁক দিয়ে চারটি ভাত দাও, বারান্দায় বসে খেয়ে নিই, বড়ো খিদে পেয়েছে।"(মনুন্তর, পৃ·১৪৫)।

ব্যস্ত রাজনৈতিক কর্মীর মতো নেপীর দৈনন্দিন কর্ম। তার ব্যক্তি· স্বার্থ, ক্ষমতার মোহ বা রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই। মানব সেবা এবং মানুষের মুক্তির জন্য সে দিক-বিদিক ছুটছে। কখনো রাজনৈতিক সভায়, কখনো রিলিফ কাজে, কখনো আর্তের পাশে। অসহায় মানুষের প্রতি তার মমতা অপরিসীম। যেমন -
"নেপী বললে - ব্লাড ব্যাঙ্কে যেতে হবে। আমি রক্ত· দেব কানুদা, আপনাকে কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে। সে বোকার মত একটু হাসল, নীলার মুখও দীপ্ত হয়ে উঠল, সে বললে - আমিও যাব নেপী, আমিও দেব রক্ত·। নেপী ম্লান মুখে এবার বলল - ব্লাড সিরাম পেলে - এই জোয়ান লোকটি হয়তো বাঁচত। উঃ তার স্ত্রীর দুঃখ দেখে আমার যে কি কষ্ট হল কি বলব।"(মনুন্তর, পৃ·২৫৬)।

এ উপন্যাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিজয়দা। লেখক তার অনেক আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন বিজয়দার মুখ দিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাণখোলা, চিরকুমার বিজয়দা কম্যুনিজমের একনিষ্ঠ কর্মী। বিজয়দা একটি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক মণ্ডলীর একজন সম্পাদক। একমাত্র কাজের লোক ষষ্টিকে নিয়ে তার সংসার। বিজয়দার মধ্যে একটি সরল ছোঁয়াচ শক্তি· আছে। অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে আপন করে নিতে পারেন। দার্শনিকের মতো পুরুষোত্তমের সময় তত্ত্ব কথাটি বলে দেন। 'মনুন্তর'এর এক উজ্জ্বল চরিত্র- বিজয়দা। মজুতদারী প্রসঙ্গে বিজয়দা যখন বলেন, 'মুখতো সে দেশেও (ইংল্যান্ডে) চলছে।

... সেখানে খোরাকির খরচ টাকার চারগুণও বাড়েনি ভাই। কিন্তু হতভাগ্য বাংলাদেশে ধান চালের দাম বেড়েছে আট দশ গুণ। দুই দেশেই তো একই সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ভাই : মজুতদার সে দেশেও থাকতে আপত্তি নেই : থাকতও। কিনতু থাকল না কেন ? তবু কেন এমন হল বলতে পার ? - তারপর হেসে তিনি বলেছিলেন - মনে মনে খোঁজ, হিসেব করে দেখ, কেন এমন হল। ভেবে দেখো ও দেশের ব্যবস্থার সঙ্গে এদেশের ব্যবস্থার তফাৎ কোথায়। তারা স্বাধীন আমরা ধ পরাধীন। জানো নীলা, আজ যদি আমরা স্বাধীন হতাম তবে আজ Impeachment of Hastings এর মতো নতুন Impeachment হত। Burk এর অভাব হত না। বিজয়দার চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠেছিল তখন। মজুতদার - মজুতদার তৈরী করলে কে ? তৈরী হয় কেন ? (মনুন্তর, পৃ.৩১৮)।

তখন মনে হয় বিজয়দার মুখ দিয়ে 'ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র সম্পর্কে সব চেয়ে খাঁটি কথাটি লেখক বলে দিয়েছেন এখানে।" [১০]

সমাজ কর্মী হিসাবে বিজয়দা একনিষ্ঠ। মানুষ হিসাবে অসাধারণ। তার সংস্রবে এসে অনেকে জীবনের গতি পায়। এখানে চরিত্রটির সফলতা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র সমূহ হচ্ছে - দেবপ্রসাদ, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, সরোজিনী, ঘটকী বামুনি ইত্যাদি। দেবপ্রসাদ আদর্শবাদী, মানব ধর্মের উপাসক। আধুনিকতা এবং প্রগতিশীলতার প্রতি প্রথম জীবনে দেবপ্রসাদের অনুরক্ততা ছিল। কিন্তু এক সময় তিনি হেরে গেলেন যুগের কাছে। রুখে দাঁড়ালেন প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি। যুগের প্রতি যে বিশ্বাস হারালেন শুধু তাই নয়, পেলেন বড় ধরণের আঘাত। শিক্ষিতা মেয়ে তার সাথে মিথ্যা বলে বিদেশী সৈনিকের সাথে ছবি দেখতে যায়। ছেলে নেপী পরিবারের দায়িত্ব, মায়া ত্যাগ করে রাতদিন রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকে। বড় ছেলে অমল এম.এ পাশ করে করত স্কুলে মাষ্টারী, যুদ্ধের বাজারে সেই সামান্য আয়ের চাকরিটিও হারায়। ফলে ছেলের সংসারও টানতে হচ্ছে তাকে। এদিকে যুদ্ধের জন্য তার ওকালতি পেশার আয়ও কমে আসে। অর্থ সংকটে পড়ে তিনি খাবার কম খাওয়া এবং দৈনিক পড়ার পত্রিকাটা পড়ে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করেন অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে।

মেয়ে নীলা গৃহত্যাগ করে চলে গেলে তার মনে হলো আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা, যান্ত্রিকতা এগুলি অভিশাপ। চরম ব্যর্থতা নিয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বড় ছেলেকে বলে গেলেন, তারা যেন গ্রামে চলে যায়। অন্তিম নির্দেশ দিলেন 'ছেলেদেরও চাষাবাদ করতে শিখিয়ো, লেখাপড়া যতটুকু না হলে নয় ততটুকু। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আমার নিষেধ রইল।" (মন্বন্তর, পৃ-২১২)।

এর আগে তিনি চরম ক্ষোভ নিয়ে বলেছিলেন, "আমার কাছে আজ ম্যালথাসের কথাই সত্য, পৃথিবীতে স্বাধীন শক্তিমান জাতিদের মধ্যে ফুলবাগানে আগাছার মত আমরা অনাবশ্যক ভাবে জায়গা জুড়ে রয়েছি। যুদ্ধে মহামারীতে ধ্বংস হওয়াই আমাদের নিয়তি"।(মন্বন্তর, পৃ-১১১)।
পরবর্তীকালে তার মনে হল এ সমস্ত কিছু পাপের ফল, কুল ধর্মত্যাগ করার পাপ।

প্রদ্যোত ভট্টাচার্য গীতার বাবা, এ উপন্যাসে যে চারটি পরিবারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেখানে প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের পরিবার একটি। ছেলে হীরেন, মেয়ে গীতা এবং স্ত্রী সরোজিনীকে নিয়ে তার সংসার। পন্ডিত বংশের ছেলে প্রদ্যোতের পূর্বপুরুষরা সচ্ছল এবং শিক্ষিত ছিল। কিন্তু প্রদ্যোতের লেখাপড়ায় প্রবেশিকার দ্বার ডিঙাতে পারেনি। ফলে উপার্জনের জন্য সওদাগরি অফিসের চাকরি এবং চাকরি ছেড়ে লাভের আশায় দালালী ব্যবসা করে বেশ স্বচ্ছল হয়ে ওঠে। এ সময় তার মনে দুরভিসন্ধি জাগায় তার অধঃপতন ঘটে। বাজারের দেনা ফাঁকি দিয়ে এবং বাড়িতে বসে আরাম আয়েশে জীবন কাটাবার যে চিন্তা তিনি করেছিলেন, তা আর পারলেন না। যুদ্ধের বাজারে তাকে চাকরিটিও খোয়াতে হয়। ফলে তার পরিবারে চরম দৈন্যদশা নেমে আসে। পেটের রোগ, ছেলে হীরেনের বখাটে ছেলেদের মতো জীবন যাপন, স্ত্রীর রুক্ষ ব্যবহার, এ সমস্ত কিছু তাকে খিটখিটে করে তোলে। অজীর্ণ থেকে তার হাঁপ ও কাশির উৎপত্তি হয়। অভাবের কারণে ক্ষুধায়, অচিকিৎসায় তার দেহ শীর্ণ হয়ে যায়। পেট শুকিয়ে পিঠে ঠেকে। খালি পেটে বিড়ি টানতে গিয়ে কাশে। কাশতে কাশতে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। এ সময় বাঁচার সর্বশেষ উপায় হিসাবে প্রদ্যোত এবং স্ত্রী সরোজিনী মিলে মেয়ে গীতাকে ঘটকীর

হাতে তুলে দেয় মেয়ের সাথে পাত্রী দেখার প্রতারণা করে। বিজয়দার ওখানে গিয়ে গীতা বাবা মার কথা ভাবতে গিয়ে উপলব্ধি হয় - পরিস্থিতি তাদের এত শোচনীয় হয়েছিল যে - হয়ত এ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। ভাই হীরেন বার-তের বছরের কিশোর। তার পক্ষে এ যুদ্ধের প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে কি উপার্জন করা সম্ভব ? বাবা অসুস্থ, বয়স্কা মাও অনেকটা তাই। বি বিজয়দার ঘরে বসে গীতা ভাবছে -

''বাড়ীতে রান্না করতো সে-ই। অবশ্য কিছুদিন থেকে অভাবের দরুণ সব দিন ঘরে উনোন জ্বলত না। আজ বাড়ীতে উনোন জ্বলছে কিনা কে জানে ? সে শিউরে উঠল। তাকে বিক্রি করে সংসারে উনোন জ্বালাবার ব্যবস্থা কতখানি পেটের জ্বালায় পড়ে যে তার বাপ মা করেছিলেন, ভেবে তার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল মমতায়, দুঃখে, ধিক্কারে'।''(মন্বন্তর, পৃ-১৮০)।

প্রদ্যোতের সাথে ঝগড়া করে ছেলে হীরেন গৃহ ত্যাগ করে। হীরেন তখন সিনেমায় টিকেট ব্ল্যাক করে সামান্য কিছু আয় করতো। এখন তাও আসবে না। এরপর ক'দিন কাটে চরম অভাবের মধ্যে। এ সময় ঘটকী বামুনী এসে সরোজিনীকে অমলবাবুর থেকে কিছু সাহায্য আদায় করে দেয়। ঘটকি, সরোজিনীর সিঁদুর মুছে ধবধবে থান কাপড় পড়িয়ে নিয়ে যায়। সরোজিনীর আসতে দেরী দেখে প্রদ্যোতের মনে সন্দেহ হয়, "উন্মত্ত প্রদ্যোত অকস্মাৎ নিজের চুল ছেঁড়া বন্ধ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সরোজিনীর উপর, দুহাতে টুঁটি টিপে ধরে পেষণ করতে আরম্ভ করেছিল। তারপর সরোজিনীর আর মনে নেই, জ্ঞান হলে দেখেছিল সে পড়ে আছে মেঝের উপর, প্রদ্যোত নেই। তার হাতের নোট দুখানাও নেই। সেই সাইরেনের বিপদ কালের মধ্যেই প্রদ্যোত তাকে মৃত মনে করে তার হাতের নোট দুখানা নিয়ে কোথায় চলে গেছে।"(মন্বন্তর, পৃ-২৪৩)।

এই বিশ টাকা সম্বল করে প্রদ্যোত হারিয়ে যায় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর বাজারে।

'মন্বন্তরে' নারী চরিত্র খুবই কম। নীলা, গীতা, সরোজিনী, ঘটকী বামুনদি এবং গুণদা'র স্ত্রী। এ পাঁচটি মাত্র চরিত্রই তাদের শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। এর

মধ্যে দুটি চরিত্র বেশ উজ্জ্বল, চরিত্র দুটি হচ্ছে সরোজিনী এবং ঘটকী বামুনী। সরোজিনী একটি বাস্তব চরিত্র। মা হয়ে সে মেয়েকে দেহ ব্যবসায় নামাতে যায়। স্বামী বেচে থাকতে ঘটকী বামুনির কথায় এবং স্বামীর ইচ্ছায় বিধবার সাজ পরে, সেই পুরুষের কাছে সাহায্যের জন্য দাঁড়ায় - যে তার মেয়েকে অর্থের বিনিময়ে ভোগ করেছিল। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা'র জহুর মা ফাতেমার সাথে এ চরিত্রের তুলনা করা যেতে পারে। স্বামীর প্রতি দুজনের ভালোবাসা অগাধ। দুজনই স্বামীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। তবু প্রদ্যোত নির্দোষ স্ত্রীর উপর শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে, শ্বাসরোধ করে তাকে অজ্ঞান করে তার শেষ সম্বল টাকা বিশটি নিয়ে চিরতরে উধাও হয়ে যায়। পরে জ্ঞান ফিরলে সরোজিনী স্বামী চলে যাওয়াতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মূলত দারিদ্র্যের চরমতা তখন এত প্রবল, প্রদ্যোত তখন উদভ্রান্ত স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল। গৃহকর্তা কর্তৃক পোষ্যদের ত্যাগ করার যে তাত্ত্বিক বর্ণনা গ্রীণো দিয়েছেন, তারাশংকর অনেক আগেই প্রদ্যোত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নিখুঁত ভাবে তাই-ই অংকন করেছেন। আশ্চর্য এখানে - মন্বন্তর যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখনো 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'র সূত্র কিংবা গ্রীনো'র রাজাদের প্রজাত্যাগ, অবস্থাপন্নদের অসহায়দের ত্যাগ, গৃহকর্তাদের পোষ্যদের ত্যাগ, তখনো শুরু হয়নি। কিন্তু তারাশংকরের অসাধারণ দূরদর্শিতা ফুটে উঠেছে এখানে - যে চিত্র আসন্ন তা তিনি অংকন করেছেন নিখুঁত ভাবে। সরোজিনীকে ত্যাগ করে তার শেষ সম্বল নিয়ে উধাও হওয়া আমাদের মনে এ ভাবনা জাগায় যে, একজন শিল্পীর দূরদৃষ্টি কিভাবে এতটা এগিয়ে থাকে ? গ্রীনো যা বিশ্লেষণ করে বলেছেন - "In the European tradition, famine violence was turned 'outward' and 'unward' against offending landlords, merchant and officials ; in Bengal the tradition was to turn violence 'inward' and 'downward' against client and dependants. This was the cold violence of abandoment, of ceasing to nourish, rather than of bloodshed and tumult. ১১

সমস্ত উপন্যাসে এ রকম abandoment তত্ত্বের অনেক চিত্র কিংবা সংলাপ পাওয়া যায় যা বাস্তবতায় ভরপুর। মন্বন্তরের বেশ পরে এ উপন্যাস লিখিত হলে এটাকে আমরা সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী উপন্যাস বলতাম। কিন্তু সমসাময়িক কালে রচিত এ উপন্যাসে এমন কিছু সত্যের নিদর্শন রয়েছে যা সাধারণের চোখে এমন কি সমাজ বিজ্ঞানী বা গবেষকদের চোখে তখনও ধরা দেয়নি। ১৯৪২এর ডিসেম্বরে তারাশঙ্কর বলেন, 'বড় দুঃসময় আসছে। দুর্ভিক্ষ বোধ হয় আসন্ন।'(মন্বন্তর, পৃ-২৮০)।

> বামপন্থী সমালোচকরা তারাশংকরকে প্রায়ই সমালোচনা করেন, মন্বন্তরের উপসংহারের জন্য। কিছুদিন আগেই এক প্রবন্ধে তাকে তিরস্কৃত করা হয়েছে 'কাহিনীর পরিসমাপ্তি কাহিনীর ধারার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির তাই উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত সুবিরোধী।" [১২]

অপর দিকে কম্যুনিস্ট বিরোধী শিবিরেও তারাশংকর সমালোচনার মুখে পড়েন। কিন্তু রাজনৈতিক চিত্ররূপ নিয়ে সমালোচনা করলেও তাঁরা রচনাশক্তির প্রশংসা করেছেন। তারাশ করের কথা থেকে আমরা জানতে পারি -

> "...'আনন্দবাজার'এ'মন্বন্তর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে সেদিন একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে নিন্দা, অন্য দিকে প্রশংসা বেশী এই কারণে বলব যে, বিষয়বস্তুতে আমি কমিউনিস্টদের ভাল বলেছি এ নিন্দা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও রচনাশক্তির প্রশংসা করেছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন" [১৩]

আবার কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যেও তারাশঙ্করের প্রায় একই অনুযোগ -

> "মন্বন্তর থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উপকার হয়েছিল কি হয়নি - একথা আমি বলব না, শুধু বলব, গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা এবং ভারতীয় সত্য ও অহিংসার প্রতি বিশ্বাস সত্ত্বেও, 'মন্বন্তর'এর নায়ক-নায়িকা ও কর্মী বিজয়বাবুদের - তাঁদের দলের লোক বলে মেনে নিতে এতটুকু প্রকাশ্য যৌথিক আপত্তি করতে দেখিনি বা শুনিনি।" [১৪]

'মন্বন্তর' তারাশঙ্করের একমাত্র উপন্যাস যা তাঁকে রাজনৈতিক আলোচনা সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে লেখকের উদ্দেশ্য এবং দোষ গুণ নিয়ে মন্তব্য শুরু হয়। ব্যক্তি জীবনে তারাশংকর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বটে, তবে তা মনে হয়, একেবারে 'এক চোখা' রাজনীতির পর্যায়ে পড়ে না। কারণ তিনি রাজনীতি কেন করেন, তা বলতে গিয়ে বলেন -

"আমি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতির কম্বলরূপী ভালুক আমায় ছাড়লে না।" [১৫]

রাজনীতির কারণে 'মন্বন্তর' যত আলোচিত শিল্পকর্ম হিসাবে তত নয়। মূলত উপন্যাস হিসাবে মন্বন্তরের দুর্বলতা অনেক। রসপ্রধান উপন্যাস মন্বন্তর নয়। উপন্যাসের শেষে মহাত্মার প্রতি ভক্তি তার কোন বিশ্লেষণ নেই। আর তা নেই বলেই এ শ্রদ্ধাবোধ অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু। কোন অসাধারণ চরিত্রও এ উপন্যাসে নেই। কাহিনীও গাঢ়বন্ধ নয়। এতো কিছুর পরেও মন্বন্তর উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ নয় তার একমাত্র কারণ - 'মন্বন্তর' বাংলা সাহিত্যে বাস্তব উপলব্ধির এক অপূর্ব সংযোজন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মৌলিক বেশ কয়েকটি কারণ মন্বন্তর উপন্যাসে এসেছে নিখুঁত ভাবে। যেমন খাদ্য মজুতদারী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খাদ্যের দাম বেড়ে যাবে এ কারণে অবস্থাপন্নদের খাদ্য কিনে রাখা, দেশীয়পণ্য প্রতিযোগিতায় হেরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, চড়া সুদ, সাইক্লোন, খাদ্যের রফতানী, শোষণ সমাজব্যবস্থা, মানুষের সীমাহীন লোভ, অমানবিক সাম্রাজ্যবাদ ডিনায়েল পলিসি, অজন্মা, গোমাংসের ত্যাগ, পরাধীনতার খেসারত ও যন্ত্রণা ইত্যাদি। এক বাক্যে মন্বন্তরের দু'একটি কারণ ছাড়া প্রায় কারণ এ উপন্যাসে এসেছে। মন্বন্তর চলাকালীন সময়ে রচিত উপন্যাসে মন্বন্তরের কারণগুলি যে সন্দেহাতীত ভাবে এসেছে, সত্যিই তা বিস্ময়কর। এ সমস্ত কিছু বিচার করে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, এটা যেন কোন গবেষকের দুর্ভিক্ষের বিস্তারিত বিশ্লেষণ। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের সমস্ত সার্থকতা এখানেই।

উল্লেখপঞ্জী :

১। ১৩৫০ সনের শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'মন্বন্তর' প্রথম প্রকাশিত হয়। মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত তারাশংকর রচনাবলীর ৫ম খণ্ডে মন্বন্তর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ গবেষণা পত্রে উদ্ধৃত করা হল সেখান থেকে।

২। জগদীশ ভট্টাচার্য, ভূমিকা, তারাশংকর রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, চৈত্র ১৩৯১, পরিশিষ্ট - ৬।

৩। তদেব।

৪। নিতাই বসু, 'তারাশংকরের শিল্পিমানস', দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ.৬১।

৫। অনুরাধা রায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্প সাহিত্য', অনুষ্টুপ, বর্ষা সংখ্যা - ১৩৯৬, পৃ.৪০।

৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,' মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ.৫৬১।

৭। অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ.৪১।

৮। সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আমার পিতা তারাশংকর', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, কার্তিক ১৩৯৮, পৃ.১২০-১২১।

৯। তদেব পৃ.১১১।

১০। অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ.৮।

১১। Paul R. Greenough.: 'Prosperity and misery in modern Bengal'. The famine of 1943 - 1944, Oxford University Press, 1982, Page - 271.

১২। অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ.৫১।

১৩। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আমার সাহিত্য জীবন,' আকাদেমী সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ.২৮০।

১৪। তদেব, পৃ.২৮৫।

১৫। তদেব, পৃ.৩১।

পঞ্চাশের পথ

উনিশশ বিয়াল্লিশের এপ্রিলে জাপান বার্মা দখল করে নিলে, বার্মার ডাক্তার বিনয় মজুমদার এবং আরো অনেক ভারতীয় বার্মা ত্যাগ করে চলে আসে। এ সময় থেকে গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) মন্বন্তর ত্রয়ী' উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'পঞ্চাশের পথ'(১৯৪৪)[১] উপন্যাসের পটভূমি শুরু, আর উনিশশ বিয়াল্লিশের আগষ্টের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রথম দিক(প্রস্তুতি সময়)পর্যন্ত এ উপন্যাসের কাল সীমা। সময় হিসাব করলে দাঁড়ায় চার-পাঁচ মাস মাত্র এ উপন্যাসের কাল সীমা। একথা সত্য পঞ্চাশের মন্বন্তরের সত্যিকার কাল সীমা শুরু হয়েছে অনেক পরে - উনিশশ তেতাল্লিশের মে থেকে। প্রশ্ন আসতে পারে, গোপাল হালদার 'মন্বন্তর ত্রয়ী' যে উপন্যাস লেখা শুরু করলেন, তার কাল সীমা উনিশশ তেতাল্লিশের পরিবর্তে উনিশশ বেয়াল্লিশের থেকে শুরু করলেন কেন ? তার কারণটা হচ্ছে মন্বন্তরকে অনেক ঔপন্যাসিক প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। গবেষণা ধর্মী দৃষ্টিতে এরকম আর কেউ দেখেননি। ফলে গোপাল হালদার সেখান থেকেই 'মন্বন্তর পর্ব' শুরু করেছেন, যেখান থেকেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের বীজ বপনটা শুরু হল। মন্বন্তর তৈরীর উপাদান ইংরেজরা ক্ষমতা নেয়ার পর পরই তৈরী হয়, কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের জোরালো প্রস্তুতি, বার্মার পতন, বার্মা থেকে অনেক শরণার্থীর আগমন, সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ এবং 'ডিনায়েল পলিসি'র মাধ্যমে শুরু। বাস্তব ঘটনার সাথে একটু মিলিয়ে দেখি -

> "১৯৪২ সাল থেকেই কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যেগুলি বাংলাকে ক্রমশ দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল এবং এগুলি সরকারী নীতিরই ফল। ... ১৯৪২ সালের মে মাসে জাপানীদের আক্রমণ সম্ভাবনার কথা ভেবে সরকার সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলি থেকে সব নৌকা (দশ জনের বেশী লোক নিতে পারে এমন) কেড়ে নেওয়া বা পুড়িয়ে দেয়ার আদেশ দেয়, যে আদেশের কথা শুনে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'এতো বাংলার চাষীর হাত পা কেটে নেওয়া' মৎস্যজীবীদের দুর্দশাও অনুমেয়।"[২]

এ সব ঘটনা'মন্বন্তর ত্রয়ী' প্রথম পর্ব 'পঞ্চাশের পথ' পর্বে সন-সাল মিলিয়ে পাওয়া

যায়। গোপাল হালদার 'উনিশশ চুয়াল্লিশে'র জুনের পূর্বভাগে মন্বন্তর ত্রয়ী লেখা শেষ করেন'[৩]।

এ উপন্যাস প্রসঙ্গে গবেষক অমিয় ধর বলেছেন -

"নিজের চোখে দেখা ঘটনাও মানুষকে যথাসাধ্য অবিকৃত রূপেই লেখক উপস্থিত করেছেন উপন্যাসের পাতায় ..."[৪]

এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্যও তাই -

"এই চিত্র রচনায় আমি কোন সত্যকারের ব্যক্তি বিশেষকেই অঙ্কিত করতে চাইনি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, অযথার্থ ঘটনাকে আমি কোথাও প্রশ্রয় দিই নি, ইতিহাসের সত্যকে আমি কিছু মাত্র বিকৃত করিনি।"[৫]

এ পর্বের কাহিনী হচ্ছে - বার্মা থেকে ফিরে ডাক্তার বিনয় মজুমদার যায় তার নিজের গ্রাম 'সোনাকান্দি'তে। সেখানে সরকার সৈন্যদের জন্য জমি বাড়ি দখল নিচ্ছে, গ্রামবাসীদের উৎখাত করে। অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় - " হুকুম হল, তোমরা গ্রাম ছাড়ো - চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে।' কোথায় গাড়ী, কোথায় লোকজন, কোথায় কে যাবে। এ যেন আবার সেই বর্মা-ছাড়ার পালা।" (পঞ্চাশের পথ, পৃ-১৪)। এ অবস্থা গ্রামের সব লোকের। সে শোচনীয় দুর্দশায় মানুষ দিক-বেদিক। "নীহার সেন জেলখানায়, কোথায় যান তাঁর বিধবা মা, তার বিধবা কন্যা রেণু আর বয়স্থা কন্যা বেণুকে নিয়ে ? কোথায় যায় বিনয়ের কাশেম মালী ? কোথায় যায় ছেলের বউ নাতি নিয়ে বুড়ো চাঁদ মিঞা ? কোথায় যায় পটুর আর হরিপদ মালী আর নবচন্দ্র ধুপী ? বাজারের দোকানীরা ? ব্যাপারীরা ?" (পঞ্চাশের পথ, পৃ-১৪)।

ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীরা বিনয়ের সাহায্য চায়। ক্ষতিপূরণ আদায়ের তদবিরে এগিয়ে আসে গ্রামের কম্যুনিষ্ট কর্মীরা। বিনয়ও দেশের জন্য কিছু করতে চায়। কিন্তু তা রাজনীতির জন্য নয়। মানুষের জন্য, একজন সাধারণ মানুষ হয়ে। বিনয় বলে "পলিটিক্স্ আমি বুঝিও না, জানিও না, আমার তাতে ইনটারেষ্টই নেই" (পঞ্চাশের পথ, পৃ-১০)। বিনয় পলিটিক্স্ করে না, কিন্তু কাজের সূত্র দিয়ে জড়িয়ে পড়ে যে কম্যুনিষ্ট কর্মীদের সান্নিধ্যে। চিকিৎসা করতে গিয়ে বিনয়ের সাথে পরিচয় ঘটে

কম্যুনিস্ট নেতা অমিত দা'র সাথে। এরপর কলকাতায় অমিতের শয্যাপার্শ্বে পরিচয় ঘটে উপন্যাসের নায়িকা, স্কুল টিচার, অমিত দা'র শিষ্যা সুধা গুপ্তার সাথে। চাঁপাডাঙ্গায়ও সৈন্যদের জন্য জমি দখল করা হচ্ছে, সুধা গুপ্তারা সেখানে যাবে গ্রামবাসীর সহযোগিতার জন্য। বিনয়ও রাজী হয় - তাদের সাথে যেতে। চাঁপাডাঙ্গায় সুধার জন সেবা, এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিনয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে। বিনয় সুধার প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে। চাঁপাডাঙ্গায় বিনয়ের পরিচয় ঘটে গ্রাম-বাসীদের সাথে। এরপর বিনয় কলকাতায় আসে তার এক মাত্র বোন হেনার বাড়ীতে। হেনার স্বামী শচীপ্রসাদ একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। শচীপ্রসাদ বিনয়কে নিয়ে ঘুরে ব্যবসায়ী মহলে। বিনয় তাদের উন্নতি দেখে ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শচীপ্রসাদ বিনয়কে ঔষধের কারখানা করতে সহযোগিতা করে। এদিকে শচীপ্রসাদের বন্ধু, সরকারী বড় কর্মচারী মিষ্টার মিত্তিরের সুন্দরী বোন চিত্রা'কে হেনা পছন্দ করে। বিনয়কে অনুপ্রেরণা দেয় চিত্রাকে বিয়ে করার জন্য। চিত্রা শুধু সুন্দরী নয়, সুসংযত, নম্র, সংযতবাক্, লজ্জাবতী। বিনয়েরও পছন্দ হয় চিত্রাকে। সর্বোপরি বিনয়ের মতো মেয়েটিও রাজনীতিতে নেই, রাজনীতি অনেকটা অপছন্দ করে। এরপর বিনয় আবার গ্রামের বাড়ীতে যায়, এবার বিনয়ের সাথে আলাপ এবং সম্পর্ক হয় অনেকের। পরিচয় হয় কম্যুনিস্ট কর্মী মজিদ, শিবুদা, শাহেদ, লীগের নেতা জাহেদ, কন্ট্রাকটর ইদ্রিস মিয়া, খাঁ বাহাদুর, প্রতিবাদী গ্রাম্য যুবতী মহিলা উদার হৃদয়া বাই আম্মা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমর্থক ইংরেজ কর্মকর্তা করীন সাহেব এবং স্কুল টিচার মিস্ সীতা রায়ের সঙ্গে। বিনয়ের মন দোদল্যমান হয় 'চিত্রা' এবং 'সুধা'কে কেন্দ্র করে। সহজলভ্য 'চিত্রা'র প্রতি বিনয়ের আগ্রহ কমে আসতে থাকে। চিত্রাকে বাগদত্তা করার জন্য হেনার বার বার তাগাদাকে বিনয় কর্মব্যস্ততা দেখিয়ে ইচ্ছাকৃত দেরী করে। এ সময় সুধার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, দীপ্তিময়ী চোখ, কর্মনিষ্ঠা - সর্বোপরি সুধার রাজনৈতিক আদর্শ থেকে নিজের মতের পথে আনতে ব্যর্থতা ডাওনর বিনয়কে সুধার প্রতি আগ্রহী করে তুলে। অন্য দিকে সোনাকান্দিতে স্কুল টিচার - সীতা রায়ের প্রতি বিনয়ের স্নেহ বন্ধুত্ব, ভালো লাগার একটি পর্বের জন্ম হয়, বিনয় অনুভব

করে সীতা তার সমস্ত কিছু সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করে এবং বিনয়কে মন থেকে শ্রদ্ধা করে। সীতার প্রতি বিনয়ের গভীর প্রেম অনুরাগ জন্ম না নিলেও বিনয় নিজের মনে মনে সুধা এবং সীতার তুলনা করে। বিনয় এর পর ব্যস্ত হয়ে পড়ে কাজে। মানুষের চিকিৎসা, তার শহর সোনাপুর, গ্রাম সোনাকান্দি থেকে শুরু করে নেয়ামতপুর, বারাসাত এবং কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে ঘুরাঘুরি, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক মহলে ধর্ণা তাকে ব্যস্ত করে রাখে। বিনয়ের দৈনন্দিন ব্যস্ততা এবং মানুষের বিভিন্ন দুর্যোগকে কেন্দ্র করে উপন্যাস এগিয়ে যায়। এরপর দেখা যায় কংগ্রেস ত্রিশক্তি মিশন আলোচনা ভেঙ্গে যেতে, দেশময় আগষ্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। কংগ্রেস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, কম্যুনিষ্ট পার্টি সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেসের অনেক নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়। এ সময় বিনয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জনযুদ্ধ নীতি নিয়ে প্রশ্ন রাখে। কারণ এ 'জনযুদ্ধ' নীতিতে ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে সহযোগিতার কথা আসে। অপরদিকে বিনয় দেখে দেশের মানুষের অবস্থা সংকটাপন্ন। অনেকে বাড়ী হারা, খাবার নেই। যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। সৈন্যদের এবং ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তাদের মানুষের উপর নির্যাতন করে যুদ্ধ নীতি। সামগ্রিক মিলিয়ে প্রায় জনমত শাসকদের বিরুদ্ধে। মানুষের সমস্ত দুর্যোগের মূলে যে ব্রিটিশ সরকার, তাকে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে না। ফলে বিনয় সুধার কাছে প্রশ্ন রাখে "আর আপনারা করবেন তবু যুদ্ধে সাহায্য ?"(পঞ্চাশের পথ, পৃ·২৮১)।

এরপর বিনয় বলে, "এ দেশের মানুষ আজ আপনাদের শাসক বন্ধুদের বিষে বিষে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আপনাদের রুশিয়া আছে, তার বন্ধু বলে ইংরেজদেরকেও যুদ্ধে আপনারা সাহায্য দেবেন। তা দিন। কিন্তু দয়া করে জনতার নাম করবেন না, বলবেন না এ জনস্বার্থে দিচ্ছেন, জনমতের নামে দিচ্ছেন।"(পঞ্চাশের পথ, পৃ·২৮১)। বিনয় একদিকে কম্যুনিষ্ট কর্মীদের জনসেবা, ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ, নিম্ন আয়ের মানুষের সাথে সহমর্মিতা দেখে, অপরদিকে দেখে শোষক ব্রিটিশ শাসককে কম্যুনিষ্ট পার্টির সহযোগিতা। আবার কংগ্রেসের জন্য বিনয়ের শ্রদ্ধাবোধ, মহাত্মা গান্ধীর নীতি

আদর্শের সাথে বিনয়ের চোখে দেখা, শচীপ্রসাদ, মেহতা প্রভৃতি ব্যবসায়ীর লোভ তাকে দ্বন্দ্বে ফেলে। দেশ ব্যাপী আগষ্ট আন্দোলন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। বিনয় নিজেকে প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড় করায় তার করণীয় কি ?'

- এটা হচ্ছে পঞ্চাশের পথ পর্বের কাহিনী। ঔপন্যাসিক নিজে বলেছেন - "সত্য সত্যই মন্বন্তরের এই তিন পর্বের চিত্র তিনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ"[৬]। এরপর বলেছেন - "এ উপন্যাসের কোন পর্বই সূত্রত্র নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি পর্বই সু-সম্পূর্ণ"।[৭] ইতিহাসের ঘটনা হিসাবে দেখলে এ সময়ের ঘটনা নিয়ে এ পর্ব সুসম্পূর্ণ কিন্তু নায়ক বিনয়ের জীবনের সমীকরণ খুঁজলে এ মন্বন্তর ত্রয়ী'র এ পর্ব কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসে না, না তার প্রেমের ক্ষেত্রে, না তার রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে। তাই পাঠককে নির্ভর করতে হয় উপন্যাসের দ্বিতীয় -তৃতীয় পর্বের উপর।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। পঞ্চাশের পথ, প্রথম প্রকাশ হয় অক্টোবর ১৯৪৪ সালে, পুঁথিঘর, কলকাতা থেকে। দ্বিতীয় প্রকাশ হয় সেপটেম্বর ১৯৪৬ সালে একই প্রকাশনী থেকে। এ গবেষণা পত্রে তা থেকে উদ্ধৃত করা হল।

২। অনুরাধা রায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্প সাহিত্য', অনুষ্টুপ, বর্ষা ১৩৯৬, কলকাতা, পৃ.৪।

৩। অমিয় ধর : 'গোপাল হালদার জীবন ও সাহিত্য' অতএব প্রকাশনী, কলকাতা বৈশাখ ১৩৯২, মে ১৯৯২, পৃ.৫২।

৪। তদেব।

৫। গোপাল হালদার : লেখকের কথা, 'উনপঞ্চাশী' পুঁথিঘর কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৪৬।

৬। তদেব।

উনপঞ্চাশী

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ীর দ্বিতীয় পর্ব 'উনপঞ্চাশী'(১৯৪৬)[১]এর আগে 'পঞ্চাশের পথ' পর্বে যে সংকট ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন এ পর্বে সে সংকটকে চরম শিখরে পৌঁছতে দেখা যায়। এ পর্বের কাল সীমা ১৯৪২ এর আগষ্ট থেকে ১৯৪২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল জাপানী সৈন্যদের বর্মা দখলের পর - এ পর্ব শেষ হচ্ছে, জাপানী সৈন্যদের কলকাতা আক্রমণ এবং মানুষের কলকাতা ছেড়ে দিক-বিদিক পলায়নের মধ্য দিয়ে। মন্বন্তর ত্রয়ী'র প্রথম পর্বের তুলনায় এ পর্বের গুরুত্ব কম। কারণ এ পর্বকে সময়ের ডায়েরী বলা যায়। এ ছাড়া এ পর্বে তেমন নতুনত্ব কিছু নেই। এ পর্বের প্রধান ঘটনা বিনয় - ব্যক্তি জীবনে 'চিত্রা'কে ছেড়ে সুধার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তাতেও নাটকীয়তা কিছু নেই। কারণ বিনয় বুঝতে পারছে চিত্রা তার মনে কোন সময়ই দাগ রেখে যায়নি। এ পর্বের দুর্বলতা, আগের পর্বের বেশ কিছু বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এ পর্বে। একই বিষয় ঘুরে ফিরে আবার আসাতে গল্পটা শ্লথ মনে হয়। বাস্তব সময়ের ধারাবাহিক দৃশ্যায়ন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এ বেড়া জালে আবদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এতো ইতিহাস বা দিনলিপি নয়, এ যে ঐতিহাসিক উপন্যাস। কারণ ঔপন্যাসিক নিজেই বলেছেন -

> "পঞ্চাশের পথ' ও '১৩৫০'র লেখকের কথায় আমি যথা সম্ভব পরিষ্কার করে এই মন্বন্তরের চিত্র রচনার উদ্দেশ্য ও এই উপন্যাসের মূলরূপ বলতে চেষ্টা করেছি। এই খন্ড সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য তাই - 'উনপঞ্চাশী ও সমসাময়িক ইতিহাসের এক চিত্র - ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্ব কেমন করে উদঘাটিত হয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন টাইপের মানুষ সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কি বিশেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে থাকে, এবং বিভিন্ন মানুষের মত ও মন এই ঘটনাবর্তে কেমন করে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলে এই আমার রচনার লক্ষ্য।
>
> ... বলা বাহুল্য, কথা চিত্রের ও তার চরিত্রের নিজস্ব দাবিও এ বিচারে - একেবারে বিস্মৃত হলে চলবে না। কারণ এ গ্রন্থ ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক কথাচিত্র, অর্থাৎ ইতিহাসকে বিকৃত না করেও স্বীকার করা মানুষকে।" [২]

কিন্তু জীবন, বিশেষত দ্বন্দ্বহীন জীবনের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা যদি, একই তার প্রতিক্রিয়া হয় - যার মাঝে ব্যতিক্রমী কোন ভূমিকা কিংবা কোন রোমান্স নেই পাঠক সেই একই ঘটনা বা একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনতে ইচ্ছুক হয় না - অন্তত উপন্যাসে, তাই ঔপন্যাসিক প্রতিটি পর্বের সুয়ংসম্পূর্ণতা দাবী করলেও শিল্পকর্ম হিসাবে উৎকৃষ্ট তার দাবী করতে পারেনা এ পর্বগুলি। পরে ঔপন্যাসিকের চেতনায়ও এ উপলব্ধি এলে বলেছেন -

> " ... যখন পথে পথে লোক মারা যাচ্ছে এবং অসহনীয়, যাকে বলা যেতে পারে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটছে দেশে, তখন আমার মনে হয়েছিল - আমার মত অনেকেরই মনে হয়েছিল এর একটা চিত্র রাখা দরকার। ... কলকাতার এক সাধারণ সাংবাদিক হিসাবে অনেক রিপোর্ট আমার হাতে আছে। এই সব থাকাতে আমার স্বভাবতই মনে হল যতটা পারি ডকুমেন্টারি জিনিসকে গল্পের আকারে রাখব। এবং গল্পটাকে অত্যন্ত গৌণ করে ফেলে আমি একটা - ঐ যাকে বলে ডকুমেন্টারি যদি রাখতে পারি - তাই রাখার চেষ্টা করলাম। গল্প এলো তবে সম্ভবত আমি সচেতন ভাবেই, যে শিল্প প্রয়োজন ছিল, তাকে ক্ষুন্ন করেও তার তথ্যগত প্রয়োজনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। সচেতন ভাবেই দিয়েছি।" [৪]

তাই শিথিল গাথুনীর মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি তৎকালীন সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা। রাজনৈতিক হালচাল, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের প্রস্তুত প্রেক্ষাপট - তার সম্পৃক্ত এবং শিকার মানুষ নিয়ে ডকুমেন্টারি সে বিষয় আমাদেরকে দেখায় একটা ভূখন্ড কিভাবে ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের পথে এগিয়ে যায়। এ উপন্যাসে আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি, পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব প্রেক্ষাপট এবং কিছু কারণ, যা সচরাচর উপেক্ষিত হয়েছে বা এড়িয়ে গেছে অনেকের দৃষ্টি।

উপন্যাসের শ্রেণীকরণ করা হলে এ পর্বকে একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে হয়, যদিও উপন্যাস হিসাবে এ পর্বের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের কাছে সমালোচকের যে দাবী থাকে এ উপন্যাসে তার বেশ কিছু বিষয় উপেক্ষিত

হয়েছে। তবুও এটাকে রাজনৈতিক উপন্যাসের আওতায় আনার প্রধান কারণ এ উপন্যাসের রাজনৈতিক চেতনা অনেক জোরালো। বিশেষতঃ কংগ্রেসের চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং কম্যুনিজম ও কংগ্রেসের তৎপরতা এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপায়ণ। আমরা দেখি এ পর্বে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেফতার, কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন, জনতার বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর, ডাকঘর জ্বালিয়ে দেয়া, ট্রাম বন্ধ করে দেয়া, এদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পুলিশ মিলিটারী, এরা জনগণের উপর বেপরোয়া গুলি চালায়। বিভিন্ন কর্মীদের গ্রেফতার করে। কিন্তু তখন কংগ্রেসের সমর্থক ব্যবসায়ী শচীপ্রসাদ, মেহরা, মথুরা দাস মুনাফার লোভে অস্থির। তারা বড় বড় স্ট্রাইকের কথা বলেন, কিন্তু নিজেরা থাকবে মুনাফা বৃদ্ধিতে। অপরদিকে কম্যুনিস্টরা জার্মানের সোভিয়েত আক্রমণের কারণে এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ নিয়ে কংগ্রেসের সাথে আন্দোলনে সহযোগী হয়না। ফলে কম্যুনিস্টদের উপর কংগ্রেসীদের সন্দেহ তারা ইংরেজের পক্ষ হয়েছে, এবং ইংরেজ সরকার থেকে টাকা পাচ্ছে। কিন্তু কম্যুনিস্ট কর্মীদের আমরা তখন দেখি দেশের মানুষের জন্য নিরলস খেটে যেতে। সোনাপুরের প্রমথ, মজিদ, শিবুদা থেকে শুরু করে কলকাতায় অমিতদা, সুধা গুণ্ডারা - সোনাপুর, চাপাডাঙ্গা, মেদিনীপুর - সবখানে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষের সেবায় দিন রাত খাটে। সুধা কাজের মাঝে নিজেকে এমন জড়িয়ে দেয় যে, বিনয়ের কাছে আত্ম সমর্পণ করেও সান্নিধ্য দেয়ার সময় পায় না। বিনয় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, যে বিনয় সুধা গুণ্ডার আর্ত মানবতার সেবাময়ী ব্যক্তিত্ব রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিনয় সুধার এ ব্যস্ততাকে ঈর্ষা করে, হৃদয় দুন্দ্বে ভুগতে থাকে, কারণ এ সময় বিনয় সুধার জন্য অস্থির হলে সুধা জানায়, সব চেয়ে বড় সংকটের মুখোমুখী আজ তারা, তাদের দল, মানুষ কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, তাদের আটকাতে হবে, নতুবা বার্মার মতো জাপানীদের হাতে কলকাতাও ছেড়ে দিতে হবে। সুধারা ব্যস্ত মানুষকে কলকাতায় রাখতে, কিন্তু বিনয় এ ব্যাপারে একমত হতে পারে না। কারণ সে দেখেছে যারা প্রথমে বার্মা ছাড়েনি তাদের পরিণতি। বিনয়ের এ মত সুধারা মেনে নিতে রাজী নয়, কারণ তাদের মতে এ কাপুরুষের কাজ। এ সময় সুধা বিনয়ের মত না মেনে তাদের উদ্দেশ্য মত কাজ নিয়ে ব্যস্ত হলে, বিনয় ভাবে, সুধা তাকে উপেক্ষা করেছে। বিনয় ভাবে, সুধা কি তাকে

কাপুরুষ ভাবে ? ভাবে সে বর্মা থেকে পালিয়ে এসেছে প্রাণ ভয়ে ? সোনাপুর থেকে ও পালিয়ে এসেছে, কলকাতা থেকেও পালাতে চায়। বিনয়ের জেদ চাপে, সে সুধাকে বীরত্ব দেখাবে। এ পর্বে ঔপন্যাসিক একটি শক্তিশালী চরিত্র হিসাবে তৈরী করেছেন সুধা গুপ্ত'কে। রাজনৈতিক মোহ যাকে অন্যান্য সমস্ত মোহের উর্ধ্বে তুলে দেয়। যদিও লেখক বিনয়ের চোখ এবং ভাবনা দিয়ে কাহিনী এগিয়ে নিয়েছেন। মন্বন্তর ত্রয়ী'র প্রথম পর্বে লেখক বিস্তারিত ভাবে যে পোড়ামাটি নীতির (ডিনায়েল পলিসির) চিত্র দেখিয়েছেন - এ পর্বেও সে সবের জোর তৎপরতা দেখা যায় - ঔপনিবেশিক সরকারের মানুষের কথা ভাবার সময় নেই, যুদ্ধ এবং সৈন্যরা এসময় সরকারের প্রধান বিষয়। ফলে বাজারে "চাল নেই, চিনি নেই, কেরোসিন নেই, দেশলাই নেই সব যাগগী"। (উনপঞ্চাশী, পৃ০৮২)। কিন্তু নেই, হাহাকার শুধু জনগণের জন্য। মিলিটারীর খাদ্য, বস্ত্র, সরঞ্জাম মজুত আছে। আরো মজুত হচ্ছে। কারণ ধনকুবের এবং শিল্প-পতিরা মিলিটারী সরবরাহের জন্য উন্মাদ। যতই তারা দেশের কথা বলুক, ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করুক, বাস্তবে তারা মিলিটারীর একটা কনট্রাক্টও ছাড়ছে না। আমরা দেখি শচীপ্রসাদের মতো শিল্পপতিরা চাল মজুত করে রাখে। শ্রমিকদের চালের লোভ দেখিয়ে মৃত্যুপুরী কলকাতাতে কৌশলে ধরে রাখছে - মিলিটারীর জন্য বান্ধব তৈরীর জন্য। মৃত্যুপুরী কলকাতাতে তৈরী হচ্ছে শুধু সৈনিক সরঞ্জাম। যুদ্ধ ঘিরে কম্যুনিস্টদের যে নীতি ঔপন্যাসিককে কৌশলে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায়। উপন্যাসের নায়ক বিনয় যে ভাবে 'আমি রাজনীতিতে নেই' এবং কংগ্রেসের প্রতি যার দুর্বলতা রয়েছে, সে উপলব্ধি করতে শুরু করে, কম্যুনিস্টকর্মীরা কপটাচারী নয়। এই মুক্তি সংগ্রামে তারা মিথ্যাচার করে না। তবে বিনয়ের ক্ষোভ কংগ্রেসের উপরও নয়। ব্যবসায়ীদের উপর। তার কথা "... দেশের প্রতি, জাতির প্রতি যদি কেউ আজ বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তবে তা করেছে কে আমি দেখেছি। করেছে তা দেশের ধনিকেরা - যারা কংগ্রেসকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে, আর নিজেরা একটা যুদ্ধের কন্ট্রাক্টও ছাড়েনি। একটা কল বন্ধ করেনি"। (উনপঞ্চাশী, পৃ০১১২)।

এই ব্যবসায়ীরা সরকারের পোড়া মাটি নীতিকে কাজে লাগিয়েছে। তারা সুবিধা নিয়েছে। বলে "চালান আসছে না, রেলগাড়ীর গোলমাল"।(উনপঞ্চাশী, পৃ.১৪৮)। কংগ্রেস আন্দোলন করে রেল উপড়ে ফেলে। ফলে মুসলিম লীগ-এর জাহেদ বলে, "সরকার আর কংগ্রেসে মিলে দেশের মানুষের মরণের বন্দোবস্ত করছে চারিদিকে। জাপানীদের হাতে পড়বে - ডুবাও নৌকা। জাপানীদের হাতে পড়বে - উজাড় কর দেশ, সরিয়ে ফেল চাল-ডাল, সাবাড় করছে দেশের চাল ইব্রাহিম ভাই-এর লোকেরা - হাফেজ জুটেছে তাদের দালাল" (উনপঞ্চাশী, পৃ.১৪৮)। ফলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হচ্ছে আর " ... ইব্রাহিম ভাই'র গুদামে চাল জমছে লাখ লাখ মণ, ... সব চাল জাহাজ ভরতি কলকাতা যাবে বিদেশের জন্য। (উনপঞ্চাশী, পৃ.১৬৭)।

আমরা যদি বাস্তবের দিকে তাকাই দেখব মন্বন্তরের প্রধান কারণ ছিল যুদ্ধ, যুদ্ধ ঘিরে মজুতদারী এবং খাদ্যের রপ্তানী। সাংবাদিক গোপাল হালদারের শিল্পী গোপাল হালদারে রূপান্তরে বাংলা সাহিত্য নেতৃত্ব দিল মন্বন্তরের সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্লেষণের, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। উনপঞ্চাশী, প্রথম প্রকাশ পুঁথিঘর, কলকাতা, ১৯৪৬। লেখকের কথা অনুযায়ী উনপঞ্চাশী মুদ্রণের জন্য প্রেসে গিয়েছিল ১৯৪৪ এর জুন মাসে আর গ্রন্থ আকারে বেরিয়ে আসে ১৯৪৬এর জানুয়ারী মাসে। (দ্রষ্টব্য–গ্রন্থ সংলগ্ন লেখকের কথা)।

২। গোপাল হালদার : লেখকের কথা, তদেব।

৩। উনপঞ্চাশী মন্বন্তর ত্রয়ীর দ্বিতীয় পর্ব হলেও প্রকাশিত হয় তৃতীয় পর্ব 'তেরশ পঞ্চাশ' প্রকাশের পর। এ জন্য 'উনপঞ্চাশী' পর্বের লেখকের কথায় গোপাল হালদার বলেছেন, 'সত্য সত্যই মন্বন্তরের এই তিন পর্বের চিত্র তিনটি অনেকটা সুসংসম্পূর্ণ, নইলে মধ্যপর্ব না পড়ে প্রথম ও তৃতীয় পর্ব পড়া শুধু অসম্ভব নয়, হাস্যকর হত'। প্রেসের বিড্রাটের কারণে মধ্যপর্ব প্রকাশ হতে দেরী হয়ে যায়। এর আগে শেষ পর্ব 'তেরশ পঞ্চাশ' প্রকাশ এবং সাথে সাথে বিক্রিও হয়ে যায়।

৪। গোপাল হালদার : 'প্রসঙ্গ : পঞ্চাশের মন্বন্তর' সংস্কৃতি ও সমাজ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ.১১-১২।

তেরশ পঞ্চাশ

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী'র তৃতীয় পর্ব 'তেরশ পঞ্চাশ'[১](১৯৪৫)। আগের দুটি পর্বে পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে প্রস্তুতি পাওয়া যায়, এ পর্বে এসে তা আত্ম প্রকাশ করে। এতো দীর্ঘ পটভূমিকা মন্বন্তরের অন্য কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না। তিনটি পর্ব মিলে এক হাজার উনচল্লিশ পৃষ্ঠা। ঘটনাধর্মী এ উপন্যাসে অনেকগুলি চরিত্র রয়েছে বটে, বেশির ভাগ চরিত্র উপন্যাসে গুরুত্ব পায় নি। পঞ্চাশের মন্বন্তর নামক ইতিহাসের ঘটনাটিই মূলত এ উপন্যাসের নায়ক বা মহানায়ক। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা বিনয় চরিত্রটিকে লক্ষ্য করি। রাজনীতি বিমুখ বিনয়ের বার্মা আগমন থেকে শুরু করে তার জীবন এবং জীবন সংশ্লিষ্ট চরিত্র বা ঘটনা উপন্যাসে আদৃত বলে আমরা ধরে নিই বিনয়ই এ উপন্যাসের নায়ক। বিনয়ের বিশ্বাসের উত্তরণে এবং নায়িকা সুধার সাথে মিলনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি - এ সমস্তের আয়োজন এবং রূপায়ণ আমাদেরকে বিনয়কে নায়ক হিসাবে ধরে নিতে সহায়তা করে। কিন্তু প্রশ্ন আসে বিনয়ের মধ্যে নায়কোচিত কোন গুণটি আছে ? যা তাকে নায়ক চরিত্রে উত্তীর্ণ করবে। বিনয় দেশের মানুষের কথা ভাবে, অপরদিকে মজুতদার, কালোবাজারী, দুর্নীতিপরায়ন ব্যবসায়ীদের সাথে পুঁজি খাটায়। মুনাফা বাজার থেকে সেও লাভবান হয়। সে বার্মা থেকে এক লাখ টাকা আনে, মিলিটারির জমি রিকুজিশন থেকে সাতাশ হাজার টাকা পায়। তার টাকার সামান্য অংশও সে দুর্গতদের জন্য খরচ করেনি। বরঞ্চ সে টাকা খাটিয়েছে ভেজাল ঔষধ তৈরীর কারখানায়। চাল মজুতদারদের ট্রাস্টে। বাক্ বিতণ্ডায় সে মজুতকারীর বিপক্ষে, কিন্তু বিতর্কে যতটুকু দৃঢ়, কাজের ক্ষেত্রে সে দৃঢ়তা কোথাও চোখে পড়েনি। সুধা, সীতা, চিত্রা তিনজনের সাথেই সে প্রেমের দোলাচলে দোলতে থাকে। কম্যুনিস্টদের বিরোধীতা করে, আবার তাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে। দেশের দুর্যোগের প্রশ্ন তুলে চিত্রা কে বাগদত্তা করতে যাবে যাবে করে যায় না, অথচ তার চেয়ে বড়ো দুর্যোগ সময়ে সুধার সান্নিধ্যের জন্য উতলা হয়ে ওঠে। এ সমস্ত আচরণকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করালে দেখা যায় - এ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে দেশ যখন যুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্নীতির চরম সংকটে - তখনকার

নায়ক হবার কোন যোগ্যতাই বিনয়ের নেই, ফলে একটি উদ্দেশ্যের অবলম্বন বিনয় চরিত্র, যার কাঁধে ভর দিয়ে একটি ক্যামেরা ঔপন্যাসিক বিভিন্ন জায়গায় চালিয়ে গেছেন। অতএব নায়ক দেখা যায় মনুন্তরের ঘটনাই। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার প্রসঙ্গে গবেষক অমিয় ধর খুব সুন্দর কথা বলেছেন -

> " ... লেখক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ব্যক্তি মানুষকে স্থাপন করেছেন এবং ... চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘটনা যেন সত্য হয়ে উঠতে পারে' সে দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন বেশী। ঘটনা সম্পর্কেই উপন্যাসের মধ্যে বহু চরিত্র হাজির হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্গতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা নর-নারীর জীবনের অন্তরালচারী রূপ ও রহস্যের জটিলতার ছন্দ ও শ্রী ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে লেখক বিশেষ মনোযোগ দেন নি। ফলে বহু ক্ষেত্রেই উপন্যাসের চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি।" [২]

'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসের সময়কাল উনিশশতেতাল্লিশের জানুয়ারী থেকে উনিশ চুয়াল্লিশের এপ্রিল পর্যন্ত। আমরা আগের দুটি পর্বে লাভ করি - বর্মা ফেরত বিনয়ের সাথে ঘটনাচক্রে-পরিচয় সুধার সাথে। তারপর সোনাপুরে পরিচয় হয় সীতার সাথে, কলকাতায় বোন হেনার অনুপ্রেরণায় বিয়ের কথা এগিয়ে যায় চিত্রা'র সাথে। আগের পর্বগুলিতেই বিনয় 'চিত্রা'র প্রতি মোহ অনেকটা ভঙ্গ হয়ে যায়, এবং সুধার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে আগের দুটি পর্বে বিনয়ের ব্যক্তি জীবন। উপন্যাসের মূল বিষয় হিসাবে লাভ করি, বর্মা থেকে শরনার্থী আগমন, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের সৈন্য সমাবেশ, জনগণের জমি বাড়ি জবর দখল, পোড়া-মাটি নীতি, মানুষের দুর্গতি, আস্তে আস্তে খাদ্য সংকট, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং জাপানী সৈন্যদের কলকাতায় বোমা বর্ষণ - মানুষের কলকাতা ছেড়ে পলায়ন। এখন এই ত্রয়ী উপন্যাসের মূল পর্বে দেখি নিম্নের ঘটনা - কলকাতা থেকে বিনয় সোনাপুরে ফিরে আসে। সোনাপুরের মানুষ খেতে পায় না। স্কুল কলেজ বন্ধ হতে চলেছে।

ভুখ মিছিলও চলছে। চালের দাম হয় টাকায় তিন সের চিনি নেই, কেরোসিন নেই, কয়লা দেশ থেকে উঠে গেল, কাঠ নেই কাগড় নেই, লবণ নেই। এ অবস্থা হত না, পৌষের ফসল ভাল হয়নি বটে, তবে মূল কারণ তা নয়, ইব্রাহিম ভাইরা কিনে নেয় চরের ধান, ফলে দেশ থেকে ধান চাল লোপাট হয়ে যায়, এ সময় খবর এল কলকাতায় বোমা পড়ছে। খবরটা গুজবে চলে যায়, হাওড়ার পুল উড়ে গেছে, শিয়ালদা স্টেশন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ইত্যাদি, রেল চলবে না, নৌকা চলবে না, স্টিমার চলবে না, মোটর চলবে না, অতএব কলকাতার মাল আসবে না, ব্যবসায়ীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। সমস্ত চাল কিনে নিচ্ছে মজুতদার মুকুন্দ পাল আর পাল্লা দিয়ে সরকারের এজেন্ট ইব্রাহিম ভাইরা। (এ ইব্রাহিম ভাইরা হচ্ছে বাস্তবের ইস্পানী কোম্পানীর উপন্যাসে ছদ্ম নাম)। জাহেদুদীন বললেন, "দিল্লী সরকার ইব্রাহিম ভাইদের এজেন্ট নিযুক্ত করেছে - যুদ্ধের চাল চাই। হাফেজ বলেছিল, 'বাংলা সরকারেরও এজেন্ট তারা।'(তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.১৬)। এ সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে চাল মজুত করছে সিলেটের চা-মালিকেরা শ্রমিকদের জন্য। রেলওয়ে, জাহাজ কোম্পানী, তারপর দেশীয় লস্করারাও চরের লাল চাল ছাড়া খেতে চায় না। ইদ্রিস কন্ট্রাক্টার, যশোদা, এরোড্রোমের ঠিকেদার সবাই - চাল কিনতে থাকে। ঠিকাদার, দোকানদার, চোরাকারবারী, ব্যবসাদার, সরকারের এজেন্ট সবার গুদামে চলে যায় সমস্ত চাল, সাধারণ মানুষ আর চাল পায় না। মানুষ আধ পেটা খাচ্ছে। কেউ ধানের গাড়ী নৌকা লুঠ করতে যায়। কেউ আরো হতাশ হয়ে জলে ঝাপ দিচ্ছে, বা গলায় দড়ি দিচ্ছে।

গ্রামে 'জনরক্ষা সমিতি' গঠন করা হয়। ইব্রাহীম ভাইদের চালের ব্যবসার দালালীতে জুটে যায় লীগের অনেকে। জাহেদুদীন যে লীগের এম.এল.এ., হাফেজ যে লীগের সেক্রেটারী, মুকুন্দ পাল হাফেজের পিছনে পুঁজিওয়ালা। এ ছাড়া চালের দালালীতে জুটে লীগের কর্মী আরসাদ, রশিদ, আবদুল হাকিম। এ সব দেখে পীর শহেদুদীন বলেন -"হতভাগা মুসলমান জাতটা। এত যাদের নিজেদের গতিশক্তি, তাদেরই সব-চেয়ে দুর্গতি - এই নেতাদের নীতি-হীনতায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব চেয়ে বড়ো

ট্র্যাজেডি এই- এত বড় সচল শক্তির এমন নিশ্চলতা।"(তেরশ পঞ্চাশ, পৃ·২৪-২৫)।

বিনয় পথের দিকে তাকিয়ে ভাবে নেই, নেই, কিছু নেই। দুর্দিন নয় দুর্ভিক্ষ, দুয়ারে দুর্ভিক্ষ। বিনয় সীতার মুখে শুনে পাশের গাঁয়ের যুগী পাড়ায় একটা বউ বিষ খেয়ে মরেছে। যুগীরা সুতা পায় না, তাঁত বন্ধ - খাবে কি করে ? ছেলে মেয়েগুলোর অভাবে পড়ে যান লজ্জা কিছু রইল না। নানা রকমের দালাল এসে ফৌজের জন্য তাদেরকে নিয়ে যায়।

এর পর জেলা বোর্ডের নির্বাচনে দুর্ভিক্ষকে ঘিরে শুরু হয়ে যায় ভোটের মহড়া। কংগ্রেসের এখন প্রধান দাবী পরাধীনতা মোচন আর সে দাবী ইংরেজদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে মুসলিম লীগ এখন দ্বিজাতি তত্ত্বের দিকে ঝুঁকছে। একমাত্র মুসলিম কংগ্রেস শাহেদুদ্দীন বিনয়কে প্রশ্ন করে - "আর কেন কংগ্রেস মুসলিম আছে এ জেলায় ? বিনয় উত্তর দেয় 'না'। শাহেদুদ্দীন তার কংগ্রেস ম্যান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে - "যতদিন ভারতবর্ষ পরাধীন থাকবে ততদিন আমার এই একমাত্র পরিচয় - আমি কংগ্রেস ম্যান"। (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ·১০২)।

শাহেদুদ্দীন বিশ্বাস করে কম্যুনিষ্টরা এখন ইংরেজদের যুদ্ধকে সহযোগিতা করছে। তারা আপাতত এখন স্বাধীনতার কথা ভাবছে না। শিবুদাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। চাল লুটের মিথ্যা অভিযোগ দেয়। জামিনে মুক্তি পায় শিবুদা। সুধার উপর অভিমান করে বিনয় কলকাতা ছেড়ে এসেছিল। অভিমানী বিনয় সুধার কাছ থেকে একটি বই উপহার পায়। বইয়ের নাম 'সোশ্যালাইজড্ মেডিসিন ইন্ সোভিয়েট ইউনিয়ন'। বইয়ের ভিতরে স্পষ্ট অক্ষরে বাংলায় লেখা "বিনয়কে - বিশে ডিসেম্বরের স্মৃতি - সুধা"। অনেকদিন ধরে বিনয় এরই পিপাসা নিজের হৃদয়ে পোষণ করে চলছিল।

পরদিন বিনয় কাগজ হাতে নিয়ে চমকে ওঠে - মহাত্মা গান্ধী আজ থেকে উপবাস করছেন। ব্যাপারটা বিনয়কে ভাবায়। গান্ধীজীর অবস্থা এমনই উদ্বেগজনক হয়ে উঠে। অন্যান্য দলও তা নিয়ে ভাবে। বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলে। সীতা বলে -

"- সে কি ডাক্তারদা', প্রমথ শিবুদা ওরা নয় গান্ধীভক্ত নয়, তাবলে দেশের নেতাকেও ভক্তি করবে না ?

- দেশের নেতা, কিন্তু তিনি তো ওদের নেতা নন। - বিনয় বললে।

-দেশের নেতা যখন, তখন ওদের নেতাও। নইলে ওরাই দেশের কেউ নয়।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.১২৯)।

নির্মল দাসগুপ্ত দেখে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরণপথে সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই, যত অস্থিরতা গান্ধীজীর অনশন নিয়ে। তাই সে রাগ করে বিনয়কে বলে "একজন লোক শখ করে না খেয়ে আছে, আপনাদের ঘুম নেই তাই চোখে। লক্ষ লোক যে না খেতে পেয়ে আজ মরছে, সে কথাটাও তাই আপনাদের কাছে কিছু নয়, না ?"(তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.১৪২)।

আত্মহত্যার পরিমাণ বাড়তে থাকে। প্রতি সপ্তাহেই দু'চারটি আত্মহত্যার খবর আসে। অনাহারে মৃত্যুর খবরও আসতে থাকে। সর্ষেখালি, সল্লখালি, এবং হাকিম পাড়ার আশে পাশে মানুষ মরতে থাকে।

বেগমপুরার বেশ্যাপাড়ায় মেয়ে বিক্রি হচ্ছে। সোনাকান্দির লোক এসে জানিয়ে যায়, ওদিকে কলেরা, জ্বরে লোক মারা যাচ্ছে। বিনয়ও সোনাকান্দি গিয়ে দেখে, যুবক ও সমর্থ পুরুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে ফৌজে, কিংবা কাজের খোঁজে বেগমপুরার বাজারে বা শহরে। তারা চাল আনলে গ্রামে যারা আছে তারা খায়। গ্রামের শ'চারেক লোকের অর্ধেক লোক আধ পেটা খেয়ে থাকে তাও কচু, গাছের ফলমূল, পাতা যা পায় তা দিয়ে উদর ভরতি করে। বিনয় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় যায়। সব খানে একই অবস্থা। সোনাকান্দি, সর্ষেখালি, সল্লা খালি সব খানে। বিনয় শহরে ফিরে আসে। এ.ডি.এম মিস্টার ব্যানার্জির সাথে দেখা করে। মিস্টার ব্যানার্জি সব শুনে বললেন - "মৃত্যুর খবর আপনারা হয়তো বেশী বেশী শুনছেন। তবে লোকে বরাবরইতো আধপেটা খেয়ে থাকে, এখন খেতে পাচ্ছেনা তাতে আর আশ্চর্য কি? আর আস্তে আস্তে নানা রোগে তা হলে মরবেও।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.১৪৯)।

সব বোঝেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোঝাতে চান - করবার কিছু নেই, সাধ্য নেই কারুর কিছু করবার। এরপর -

"... মিস্টার ব্যানার্জি বললেন, কিছু করবার পথ রেখেছেন আপনারা ? চমৎকার আপনাদের মন্ত্রী, মেয়র, নেতারা সব। একটা ঘাটতি জেলা, তা বাড়তি জেলা বলে বলা হয় - মন্ত্রিরা দেখলেনও না। আমরা তো লিখি, কিন্তু তারা এখন ব্যস্ত – আইন সভা চলছে।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ·১৪১)।

এরপর চালের দর লাফিয়ে লাফিয়ে পঁচিশ টাকা হয়ে যায়। একদিন হাওড়া, চব্বিশ পরগণার দশ হাজার মেয়ের একটি দল গিয়ে হাজির হয় - এ্যাসেম্‌ব্লিতে। তারা চাল চায়। দৃশ্যটির উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিকের কৌতুকবোধ চমৎকার ঔপন্যাসিকের ভাষায় -

"হক সাহেব হৈ-হৈ করেন – যেমন তার স্বভাব, – আমার দেশে মা। বোনে খেতে পায়না - আজ থেকে আমি এক বেলা খাব।' জাহেদ বলেন, সবাই শুনে হাসে - হক সাহেবের কথা তো। একজন বললে, 'কিন্তু তাতে এতো লোকের কি হবে ? আপনি এক বেলা না খেলে বড় জোর দুজন লোকের দুবেলার খোরাকী বাঁচবে। এত লোকের খোরাক তো হবে না।' ... একজন বললেন, 'এরা চাল চায়, হক সাহেব, রস-গোল্লা চায় না, ঘটন-চপও চায় না'। হক সাহেব বললেন, 'চাল আমি পাব কোথায় ? ইস্পাহানি সাহেবের চাল আছে, দিন না ?" জাহেদুদ্দীন বললেন, "তখন আমাদের ইস্পাহানি সাহেব বলেন, 'আমি তো দিতেই রাজী, সরকার বললেই হয়।" কিন্তু সরকারটা কে ? হক্ সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে শাদামুখো কর্তারা - তারা চুপ। কে একজন বললে, 'কোথায় যাবে সরকারী এজেন্টের চা'ল ? শাদামুখো কর্তা বলেন, 'সে আমি বলব না। এ চাল এখানে বিলির জন্য নয়।' তখন হক সাহেবও চুপ।" এই তো আমাদের মন্ত্রী"। (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ·১৫৮)।

বিনয়, প্রমথ, সীতা'র কাছে আই·বি· থেকে অভিযোগ আসে, কোন কোন অঞ্চলে অনশনে মৃত্যু প্রভৃতির নাম করে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে চলছে, এবং

যুদ্ধের সুপরিচালনায় বাধা জন্মাইতে পারে - এমন কাজ করিতেছে। বিনয়কে বিনা অনুমতিতে শহর ত্যাগ এবং সভা-সমিতি, মিছিল করতে নিষেধ করা হয়। থানায় তাদের নামে এ অভিযোগ তদন্ত করা হয়। কংগ্রেসের মতাবলম্বীরা বলল, এই গর্ভমেণ্ট কিছু করতে দেবে না। বাঁচাবার কথাও বলতে দেবে না। কয়েক দিন পর ফজলুল হক পদত্যাগ করেন। নতুন বৎসর ঢুকে তেরশ পঞ্চাশ। বৈশাখের মেলা বসবে বিকালে। হঠাৎ অনেক দিন পর এ শহরে আবার সাইরেন বেজে উঠে। "বিনয়ের মনে পড়ে গেল, মানুষের পাপ কত ভাবেই না আজ তাকে পাশবদ্ধ করেছে। ক্ষুধা আছে, যুদ্ধআছে - অভাব নেই মানুষের মৃত্যুদণ্ডের।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.১৬৫)। বিনয়ের চোখের সামনে মারা যায় ভাতের আশায় গ্রাম থেকে শহরে আসা গরীব মুসলমানের এক স্ত্রী এবং তার বক্ষলগ্ন ক্ষুদ্র শিশু। অদূরে বোমা হামলায় হতাহত হয় আরো কিছু লোক। বিনয় তাদেরকে এ.আর.পি'র হাসপাতালে নেয়। বিনয়দের উপর থেকে আই.বি'র অভিযোগ প্রত্যাহার হয়। কারণ বিনয়দের ছাপানো ইস্তাহারের প্রত্যেক কথা সত্য। তবু ম্যাজিস্ট্রেট চেষ্টা করে বিনয়দের ফাঁসাতে। কিন্তু তদন্তকারী অফিসার আমানুল হকের কর্তব্য নিষ্ঠার কারণে সম্ভব হয়না। আমানুল হকের কথা, দেশের লোক না খেয়ে মরছে, আর আমি বলব, তারা খেয়ে মরছে, তেমন বান্দা আমানুল হক নয়।

সমস্ত পরিস্থিতি দেখে বিনয়ের উপলব্ধি হয় 'বাই আয়্যা 'র মতো সাধারণরাই দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করছে। আর শিক্ষিত মানুষের দল ফিরছে মানুষের শিকারে আর মুনাফার নেশায়। সোনাপুরে সরল আনন্দময়ী সীতা বিনয়কে কাজে উৎসাহ দিয়ে যায়। বিনয়ের সাথে সমঝোতা করে সীতা তার সংকট মুহূর্তে করণীয় নির্ধারণ করে। অনেকের চোখে সীতার স্বাধীনতাপ্রিয়তা দৃষ্টিকটু ঠেকে। ব্যক্তি-স্বার্থে ব্যর্থ হয়ে অনেকে সীতার পিছনে লাগে। এমন কি সীতার ব্যক্তি-জীবনে কলঙ্ক মাখার চেষ্টা চালায়।

তেরশ পঞ্চাশ সবে ঢুকেছে, জাপানীদের বোমা বর্ষণের সাথে সাথে চালের দাম বাড়তে থাকে, পঁচিশ টাকা থেকে লাফ দিয়ে চালের দাম এসে দাঁড়ায়, এক লাফে

সাইত্রিশ টাকায়। অবশেষে অনেক তদবিরের পর চাল আসে। কিন্তু চাল এলে কি হবে, মধ্যবিত্তদের কেনার বাইরে থাকে সে চাল। হ্ সাড়ে বার টাকা দরে কেনা চাল বাজারে বিক্রি হয় পঁচিশ টাকা করে। সময়ে আজ তা অপেক্ষাকৃত সস্তায় বলা যায়। তাই অবস্থাপন্নরা এ চাল কিনতে থাকে। মুকুন্দ পাল, মোহন বাঁশী, ঢাকাপট্টি, শিলেটপট্টির সকলের কাছে বিনয় ক্ষেপে গিয়ে অভিযোগ করে তের টাকায় কেনা চাল পঁচিশ টাকা দাম করে। তারা অস্বীকার করে বলে, এ চাল সে চাল নয় - এ বাজার থেকে কেনা চাল।

বিনয়ের মনে আগুন জ্বলে। সে পথে পথে ঘুরতে লাগল। বিনয় বুঝল, সে পরাজিত হয়েছে, প্রতারিত হয়েছে। তাদের প্রতারণা দেখে বিনয় ভাবে এরাই ব্যবসায়ী। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। মুকুন্দ পাল, মোহন বাঁশী, সুরেন্দ্রনাথ এরা দেশের লোক, বরাবরের ব্যবসায়ী। ঔপন্যাসিক বলছেন - "তাদের দানে ঠাকুর বাড়ী চলে, তাদের চালে রামকৃষ্ণদেবের মহোৎসব হয়, তাদের গুরু ব্রাহ্মণের ভক্তিতে হিন্দু সমাজ গৌরবান্বিত। তারা ইস্কুলে টাকা দেয়, বন্যায় চাঁদা দেয়, কংগ্রেসের খরচও জোগায় - তারাই আবার ইব্রাহিম ভাইর এজেন্ট হয়ে চাল চালান দিয়েছে সেদিন, বিনয় তাও বুঝতে পারে। তারা ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ের দায় বোঝেনি তার দায়িত্ব কত। কিন্তু সুখিপুরের চাল নিয়ে ওরা এমনভাবে প্রতারিত করলে খাদ্য-সমিতিকে, দেশের লোককে ? লোভ এত বড় হয়েছে আজ ? বিনয় তা ভাবতে পারে না।"(তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.২০২)।

এজন্যই বিনয় মিস্টার মিত্র'র কাছে ব্যঙ্গ করেছিল -

" - কিন্তু ওরা সাংসারিক লোক।

- কারা ডক্টর মজুমদার ?

- এই আমাদের ব্যবসায়ীরা।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.২০৮)।

মিস্টার মিত্রকে বিনয় কন্ট্রোল দরে চাল দেয়ার কথা বলে। কিন্তু মিত্রের কথাবার্তা ব্যবসায়ীদের পক্ষেই। মিস্টার মিত্র, যে নিজেকে বলে গোলাম - বড় দেশের গোলাম।

বিনয় ভাবে, বিকৃত আমলাতন্ত্র ওদের আরও বিকৃত করছে।

বিনয়ের ডাক পড়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ওখানে। বিনয় সেখানে গিয়ে কমিশনার সাহেবকে বলে রিলিফ দিতে। দুর্ভিক্ষ হলে যেমন করা হয়। কমিশনার বলল, দুর্ভিক্ষ তো হয় নি। বিনয় বলল, মানুষ মরছে তবু দুর্ভিক্ষ হয় নি ? সাহেব বলল, মানুষ না খেয়ে আছে, মরছে এ খবর কি করে ঠিক হয় ? মানুষ না খেয়ে থাকে কি করে ?

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ভারত সচিব মি• আমেরির কথা। আমেরি বলেছিল, অতি ভোজনের জন্যই দুর্ভিক্ষ।

এর পর কমিশনার সাহেব বলল, গৃহস্থ কৃষক নিজেদের ঘরেই খাবার মজুত রেখেছে।

অবশেষে যাদের আয় বিশ টাকার কম, তাদের রিলিফের চাল দেয়ার জন্য কমিশনার সাহেব রাজী হয়। বিনয়দেরকে বণ্টনের ভার নিতে বলে। অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব আসে বিনয়ের উপর। চাল বণ্টন নিয়ে মহিমবাবুরা বিনয়ের পিছনে লাগে। অভিযোগ আনে বিনয় পক্ষপাতিত্ব করছে, মুসলমানদের চাল দেয়া হচ্ছে বেশী। কিন্তু গরীবেরা, শহরের বস্তীবাসীরা বিনয়কে আশীর্বাদ করে, তারা বরাদ্দ মত চাল পায়, এ কি কম ভাগ্য। কিন্তু ক'দিন পর রিলিফ বন্ধ হয়ে যায়। চালু হয় লঙ্গরখানা। একশ'র উপর লঙ্গরখানা খোলা হয়, কিন্তু প্রায় দেয়া হয়েছে প্রেসিডেন্ট, পঞ্চায়েৎদের হাতে। লোকে খেতে পায় না। পেলেও যা পায়, তা খিচুড়ির নামে অখাদ্য, কারণ খাদ্য যা তা প্রেসিডেন্টের আত্মীয়রা চোরাবাজারে বিক্রয় করে। গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে যাওয়া শুরু করে। বিনয়ের দুয়ারের পার্শ্বে বসে পড়েছে এক প্রৌঢ়া। তারও বাড়ি সোনাকান্দি। বিনয় জিজ্ঞাসা করল বাড়ীতে কে আছে ? বৃদ্ধা উত্তর দেয়, ছেলে ছিল, পালিয়েছে আসামে। বউ ছেড়ে পালাল। বউ ছোট মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ফৌজের ছাউনির দিকে। বৃদ্ধার বয়স নেই, রূপ নেই কে খাওয়াবে ? তাই বৃদ্ধা মাটি নিয়ে শহরে চলে এসেছে। সোনাকান্দি যাবে কিনা বিনয় জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধা জবাব দেয় -

"না, না, না। মরে যাব, মরে যাবে চের্। কিছু নেই, কিছু নেই। পোড়া দেশ, পুড়ে গেছে সব, পুড়ে গেছে —। ... সেই সোনাকান্দি, বিনয়ের সোনাকান্দি ... বিনয় অস্থির হয়ে উঠল — কি করবে সে ? কিন্তু আরও আসছে ওরা — কোথা থেকে ঠিক নেই। ... আসছে নিকটের গ্রাম থেকে, চর থেকে, উজান থেকে, ভাটি থেকে, পূর্ব থেকে, পশ্চিম থেকে — আর সেই একটানা ক্রন্দন উঠছে — 'ভাত, ভাত, ভাত।'" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ-২১১)।

খাদ্য সমস্যার সাথে সাথে সামাজিক সমস্যাও বেড়ে চলে। মেয়ে-স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সীতাকে সহ্য করতে হয় সমাজের দুর্নীতি গ্রস্থ মানুষগুলির উৎপাত। স্কুলের প্রেসিডেন্ট বৈকুণ্ঠবাবু, তাকে চাকরি থেকে রিজাইন দেয়ার চাপ দেয়। অনধিকার শাসন চালাতে চায়। চাকরিটা সীতার অতত এই দুর্যোগ সময়ে দরকার। বাড়িতে তার মা, ভাই, বোন তার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে এক সময়ের কম্যুনিষ্টকর্মী বীরু সেন পেটি বুর্জোয়া বনে যায়। হয়তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেও বনে যায় দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের সহযোগী। তার পত্নী এবং শ্যালিকা নিয়েও সৃষ্ট হয় সমস্যা। এদিকে ইদ্রিস মিঞা যে একদা ছিল কন্ট্রাক্টার, অর্থ তাকে পাল্টে দেয় জীবনবোধ। সে এখন অনেক টাকার মালিক। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর চক্রান্তে মেয়ে আমিনাকে সে চায় জামাতা মজিদের কাছ থেকে তালাক নেয়াতে এবং তার উদ্দেশ্য স্ত্রীর ভাইপো কাসেমকে শাদী করুক আমিনা। আমিনা কিন্তু স্বামীর প্রতি অনুরাগী। ফলে সৃষ্টি হয় সমস্যা। আমিনা চায় লেখাপড়া করতে, মজিদের কাছে ফিরে আসতে। সে তালাক মানতে রাজী নয়। অবশেষে বিনয় কৌশলে ইদ্রিস কন্ট্রাকটরকে জেলা বোর্ডের নির্বাচনে প্রলুব্ধ করায়, এবং কৌশলে জানায়, মজিদকে কন্ট্রাকটরের দরকার আছে। মজিদ এখন ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে। মজিদের এখন অনেক ক্ষমতা। খাঁ বাহাদুর রাতদিন ডাকা ডাকি করে। ইদ্রিস মিঞার মতি বদল হয়। বিনয়ের সহযোগিতায় আমিনা-মজিদের অবশেষে মিলন হয়।

উপন্যাসের পর্বে পর্বে দুর্ভিক্ষের কারণগুলি আসে। বিভিন্ন স্থানে যা খাদ্য আছে, দেখা যাচ্ছে যানবাহনের অভাবে তা আনা যাচ্ছে না। অনেক গবেষক এই পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য যানবাহন সমস্যাকে দায়ী করেছেন। সে সমস্যাও শাসকদের

অবহেলা আর অপব্যবহারের ফল। বিনয়ের চিন্তা দিয়ে গোপাল হালদার তাই প্রকাশ করেছেন, "একদিন রেল ধুলে ইংরেজ বলেছিল, 'আর দুর্ভিক্ষ হবে না এ দেশে।' আজ দুর্ভিক্ষ যখন এল দেখা গেল, রেলগাড়ীও নেই - যা আছে, আছে ইব্রাহিম ভাই আর মিলিটারি কন্ট্রাক্টারদের জন্য, বিদেশে চালানের জন্য, দুর্ভিক্ষ বাড়াবার জন্য।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.২৫২)।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে রেল লাইন বসাবার পর থেকে ভারতে দুর্ভিক্ষের পরিমাণ বেড়ে গেছে।[২]

বিনয় আবার কলকাতায় ফিরে যায়। কলকাতায় গিয়ে খবর পায় সব ব্যবসায়ী চালের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। মুরারি সেন, পাঞ্জাবী ধরম বীর-মেহরা, ভাটিয়া পরমেশ্বর প্রসাদ, মারোয়াড়ী হরসুখলাল সবাই কলকারখানা ছেড়ে চাল, কয়লা চিনিতে টাকা খাটাচ্ছে। আর খাটাচ্ছে মানে প্রধানত, মজুতদারী। পাটের ব্যবসায়ী, ব্যাংক-কলকারখানার মালিক সবাই চালের বাজারে নেমে পড়েছে। বিনয় দেখে, চোরা বাজারে সব ব্যবসায়ী এক হয়, সংঘবদ্ধ হয়। ট্রাস্ট গঠন করে। একা ইব্রাহিম আর চালের ব্যবসায়ী নয়, তার সহযোগী হয় অনেকে।

পনের বছর পর শিরীনের সাথে বিনয়ের দেখা। যে শিরীন ছিল বিনয়ের যৌবনের চোখে দেখা প্রথম মেয়ে। সে শিরিন এখন ইব্রাহিম ইলাহি-ডাইর চতুর্থ স্ত্রী। মুরারী ডাই এবং ইব্রাহিম ভাই থেকে সোনাপুরের জন্য চালের প্রতিশ্রুতি আদায় করে বিনয় আবার সোনাপুরে ফিরে যায়। এক মাস পরেই ফসল বের হবে, কিন্তু এই একমাস মানুষ বাঁচাতে হবে। তার জন্য চাই চাল, কিন্তু মুরারি সেন বা ইব্রাহিম ভাই কারও চাল এলোনা, চাল পাঠানো যাচ্ছে না মাল গাড়ীর অভাবে। এমন সময় খবর বের হয় 'দামোদর' নদীর জল ডাসিয়ে নিয়ে যায় পশ্চিম বাংলার পাঁচ লক্ষ জমির শস্যভরা ক্ষেত ঘর-দুয়ার দশ লক্ষ মানুষের ঘর দুয়ার ক্ষেত ডুবে যায়। এ সময় কলকাতায় আইন সভা শুরু হয়। মন্ত্রীরা কখনো বলছেন দেশে অভাব নেই। কখনো বলছেন তাঁরা দোষী নন। মন্ত্রীরা দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা দেয়ার পর ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, ভারত গর্ভনমেন্ট ফসল দেয় না, রেল বিভাগ মালগাড়ী দেয় না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাই তীব্র আবেগে মন্ত্রীসভার দুরভিসন্ধি উদ্‌ঘাটন করে দেয়। অভিযোগ জানিয়ে বলে, মন্ত্রীরা ইস্পাহানির তাঁবেদারী করছে। কোটি কোটি টাকা নিয়ে ইস্পাহানিকে ছিনিমিনি খেলতে দিয়েছে তারা। নতুন ফসল বের হয়, কিন্তু দাম নামে না। ছাব্বিশে আগস্ট থেকে চালের দর বেঁধে দেয়া হয় আর সাথে সাথে কলকাতায় চাল উবে যায়। কালও দোকানে চাল ছিল, কিন্তু আজ আর নেই। দোকানী-দের ভাষা, জোগাড় করে দিতে পারি, দর চল্লিশ টাকা। এক রাত্রির মধ্যে কলকাতার চাল উবে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অন্য খানের চালও উবে যায়। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, ত্রিপুরা সব খান থেকে খবর এল সেখানে চাল নেই, চট্টগ্রামে তো চাল নেইই।

এবার শুরু হয় সত্যিকার ট্রাজেডি। যে ট্রাজেডি মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। এ ট্রাজেডি ক্ষুধা নয়, মৃত্যু নয়। তার চেয়ে মর্মান্তিক স্নেহের মৃত্যু, ক্ষুধার জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন। ঔপন্যাসিকের ভাষায় বর্ণনাটা দেয়া যেতে পারে। "গ্রাম খানি ত্যাগ করে চলে গেল পুরুষেরা। ... বীজ ধান খেয়ে, জমি বিক্রী করে, গরু বিক্রী করে, ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে। তারপর এল গ্রামের বাইরে - ছুটল এখন ভাতের খোঁজে - শুধু নিজের প্রাণ বাঁচানোর চিরন্তন দায়ে। স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পিতা নয় কেউ আর আপনার নয়। সব চেয়ে আদিম যে চেতনা, প্রাণ-রক্ষা, তাই তাড়িত করে নিয়ে চলেছে তাদের - 'বাঁচো, বাঁচো' ... যুবতী স্ত্রী-লোকের বাঁচবার সুবিধা আছে, অধিকার আছে - ঘর ? ধর্ম ? মর্যাদা ? কতক্ষণের তা ? স্বামী ? সন্তান ? — সে সবতো মানুষের আবিষ্কার - সভ্যতার দান, জীবজগতের সব চেয়ে চরম তাড়না তো ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা। জয়ী হচ্ছে জন্তু, পরাজয় হচ্ছে মানুষের।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.৩০৫)। কলকাতায় এখন আর 'মা ভাত' সেই ধ্বনি নেই, তার বদলে 'মা ফ্যান, মা ফ্যান'।

সাহিত্য পত্রিকার মালিক গৌরীনের স্ত্রী উষা বিনয়কে দুঃখ হয়ে বলে, আজ ভাত ফেলে মানুষ ছেলে বিক্রি করে ফেলে। কলকাতার ফুটপাতে মানুষ মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিনয়ের চোখের সামনে ডাস্টবিনের মধ্য থেকে বড় বড় হাড় নিয়ে হাড়ের মাঝখানের নরম মাংসটুকু নেয়ার চেষ্টা করে এক ক্ষুধার্ত বালক। আর তার পাশে

দুটি কুকুর - অন্য একটি হাড়ের রক্তমাখা অংশ চাটছে। এক মা এক হাড়ি ফ্যান ভাত নিয়ে মুখে পুরছে আর পুরছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই তার। আর তার বছর সাতেকের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এসে বলে - 'দে মা এট্টু, দে মা এট্টু'। বাঁশের চেলার এক এক ঘা বসিয়ে তাকে তাড়ায় মা। কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে সরে যায় - আবার ফিরে আসে তখনি। আবার বাঁশে ঘা দিয়ে তাকে তাড়ায় মা। গোপাল হালদার বলেন - 'মাকেও বাঁচতে হবে।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.৩৫৬)।

এ রকম অনেক বাস্তব দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে যান ঔপন্যাসিক। এক মা তার দেখতে সুন্দর এক মাত্র ছেলেকে বিনয়ের কাছে বেচতে চায়, প্রথম পাঁচ টাকার বিনিময়ে, পরে বলে দু'টাকা, বিনয়ের আগ্রহ না দেখে বলে, না না টাকায় কাজ নেই, নিয়ে চলে যান, শুধু একটু খাওয়াবেন, অমনি তাজা হয়ে উঠবে। সুন্দর দেখবেন, ওর বাবার মতন ফর্সা ও।

সোনাপুরে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত। দুদিনের জ্বরে মারা যায় বুড়ী 'বাঈ-আম্মা'। মারা যায় শিবুদা। শিবু দা'র মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে সীতা। বিনয় প্রথম উপলব্ধি করে শিবুদাকে ভালোবাসতো সীতা। শিবুদা'র মৃত্যুর পর সোনাপুরের উপর বিনয়ের আকর্ষণ কমে গেল। বিনয় এতোদিন পরে সুধার দেয়া বইখানা এবং ইংরেজ শ্রমিক ট্যানারের দেয়া বই 'India Today' পড়ে। বই দুখানা বিনয়ের নতুন বোধ জাগায়। কলকাতা থেকে বিনয়ের কাছে টেলিগ্রাম আসে। শচীপ্রসাদের এক মাত্র মেয়ে বিনয়ের ভাগ্নী ইরার টাইফয়েড। শচীপ্রসাদ ইরাকে খুব ভালোবাসে। দু'হাতে টাকা খরচ করে যায়, টি-এ-টি ইনজেকশান দেয়া হয়েছে। বিনয়েরই কারখানায় তৈরী ওষুধ। সে ভেজাল ওষধ বাঁচাতে পারে না ইরার জীবন। প্রমথকে বিয়ে করে সীতা। কম্যুনিষ্টদের মূল কথা - এই সভ্যতা আজ শুধু একটা মুনাফার মৃগয়া - নিজের অজান্তে বিনয় অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করে এ তত্ত্ব, এ সত্য অমিতদার কাছে তা প্রকাশ করতেই, অমিতদা বলে, না সুধা, তোমাকে হারাতেই হলো, এতোদিন বিনয়ের প্রণয় প্রস্তাব গ্রহণ করেও দূরে দূরে ছিল সুধা আদর্শগত কারণে। এখন সুধা নিজেকে সমর্পণ করে বিনয়ের এ উপলব্ধির কাছে। 'সভ্যতা আজ শুধু একটা মুনাফার মৃগয়া', কম্যুনিষ্টের যা মূল তত্ত্ব।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ, পরিণাম সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত কিছুই গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ীর পর্বগুলিতে এসেছে। তাই গোপাল হালদারের পক্ষেই বলা সম্ভব -'

"আসলে এই মন্বন্তরকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন ঐতিহাসিক নয়, স্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে তবু একটি সম্পূর্ণতার স্বাক্ষর থাকবেই।" [৩]

উপন্যাস হিসাবে মন্বন্তর ত্রয়ী অনেক সমালোচকের দৃষ্টিতে ব্যর্থ। প্রধান কারণ উপন্যাস কাকে বলে এবং কি কি বৈশিষ্ট্য তার থাকা দরকার তার একটা তালিকা সাহিত্য সমালোচকরা নিয়েই উপন্যাসকে বিচারের জন্য দাঁড় করায়। সে বিচারে মন্বন্তর ত্রয়ী সফলতা দেখিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এ বার দেখি আমরা সে ব্যর্থতাগুলি কোথায় ? উপন্যাসের তিনটি পর্বে অর্ধ-শতাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্র রয়েছে। ডাক্তার, মাষ্টার, উকিল, কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেসী, মুসলিম লীগ, মজুতদার, কন্ট্রাকটার, চোরাকারবারী, শিল্পপতি, কৃষক, শ্রমিক, ভিক্ষুক, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, আমলা, ইংরেজ, মন্ত্রী, বিপ্লবী, লেখক, সম্পাদক, অধ্যাপক, জেলে, চাকর – সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে তুলে এনেছেন উনিশশ বিয়াল্লিশের এপ্রিল থেকে উনিশশ চুয়াল্লিশের এপ্রিল পর্যন্ত দু'বছরের ক্যানভাসে। অমিয় ধর-এর ভাষায় -

" ... গ্রাম ও শহরের সমাজের নানা স্তরের, নানা বৃত্তির ও নানা মতামতের মানুষের এক বিরাট চরিত্র-চিত্র-শালা এই উপন্যাস।" [৪]

এত গুলি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কিন্তু মূলতঃ তিনটি শ্রেণী চরিত্র দিয়ে একটি বিশৃংখল সময় চিত্র এঁকেছেন। এ শ্রেণী চরিত্র তিনটি হচ্ছে, একটি শোষক, একটি শোষিত, অন্যটি শোষক থেকে শোষিতকে উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টাকারী। এ তিন শ্রেণীর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি চরিত্রও এ উপন্যাসে নেই। এখানেই সাহিত্য বিচারে মন্বন্তর ত্রয়ী ব্যর্থ। গোপাল হালদার নিজেও উপন্যাসে কোন নায়ক সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি নিজেও বলেছেন -

"আমি এই ঘটনাবলী উপস্থিত করেছি একজন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিপথ থেকে, দেখতে চেয়েছি এই ঘাত-প্রতিঘাতে তার সম্ভাবনীয় পরিণতি। সে চিত্রের কেন্দ্র নয়, সমসাময়িক কালের সে সহজ ও সক্রিয় সাক্ষী।" [৫]

এ সাক্ষী, একজন সাধারণ বাঙালী। লোকটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ডাঃ বিনয় মজুমদার। প্রশ্নটা আসতে পারে, ঔপন্যাসিক তাকে চিত্রের কেন্দ্র বা নায়ক না বানিয়ে সাক্ষী কেন বানালেন ? কারণ, ঔপন্যাসিক ঘটনাকে নায়ক বানাতে চেয়েছেন। খন আমরা গাণিতিক পদ্ধতিতে একটা সমীকরণে যাই, ধরে নিই ঘটনাই এ উপন্যাসের নায়ক। এখন উপন্যাসটি কতটুকু সার্থক। পূর্বেই বলেছি আমরা, সাহিত্য সমালোচকরা উপন্যাস বিচারের একটা তালিকা, অর্থাৎ একটা মাপকাঠি রাখেন। সে মাপকাঠি দিয়ে মন্বন্তর ত্রয়ীকে না মেপে তার জন্য একটা ভিন্নধর্মী মাপকাঠি নেয়া দরকার। কারণ "লেখকের এই বই তিনটি সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস থেকে একটু ভিন্ন।" [৬]

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী ভিন্ন ধর্মী রাজনৈতিক উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের দাবী, এটি একটি সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাস। যদিও আধুনিক সমালোচক বলেন

"রাজনৈতিক উপন্যাস বলে কোনো শ্রেণী বিভাগ দরকার আছে কি ? সব উপন্যাসেই সমাজের প্রেক্ষাপটে মানুষকে উপস্থিত করা হয়। যে মানুষকে আরিস্টটল বলেছিলেন – 'Political Animals'. [৭]

এ কথাটাই আমরা শুনি সুধার মুখে, বিনয় যখন বলল - পলিটিক্স্ সে বুঝেও না, জানেও না, আর তার ইন্টারেস্টই নেই পলিটিক্সের ব্যাপারে তখন সুধা বলে, বৃদ্ধ এ্যারিস্টটলের কথা Man is a political animal. সুধা নিজেও এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, কিন্তু এ বিশ্বাস সুধা কোথায় পেল ? নিশ্চয় গোপাল হালদার থেকে। কারণ গোপাল হালদারের বক্তব্য -

"... উপন্যাসে আমাদের দেশে খুঁজি রাজনীতি বর্জিত পন্দ। আমার বিচারে সেরূপ একদিক থেকে সত্য। তবে তা অসম্পূর্ণ, আর

নিশ্চয়ই সমসাময়িক ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা অনেকাংশে
অবাস্তব।" [৮]

এই অসম্পূর্ণ এবং অবাস্তব থেকে মুক্তিলাভের জন্য লেখকের এক আদর্শবাদ আমরা লক্ষ্য করি - মানুষ মাত্রেই Political animal.কিন্তু বাধ সেধেছে বিনয়, গোঁ ধরেছে সে পলিটিক্সে নেই। যদিও নিজের অজান্তে সে যা করে যাচ্ছে, তাই মূলত পলিটিক্স্। এখানেই Man is political animal. কেউ জানে, কেউ জানে না। কেউ স্বীকার করে, কেউ স্বীকার করে না। বিনয় এই কথাটাই দীর্ঘদিন জানে নি, গোপাল হালদার এত দীর্ঘ পটভূমিকা টেনে গিয়েছেন, শুধু এই একটি সত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা। এবার আমরা একটু গভীরে যাই--বিনয়কে গোপাল হালদার কংগ্রেস-ম্যান করে না আঁকলেও কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি বিনয়ের বরাবর দুর্বলতা দেখিয়েছেন। যে দুর্বলতা তার কম্যুনিজমের প্রতি ছিল না, যদিও ছিল তা কম্যুনিস্ট কর্মীর প্রতি। অপর দিকে কংগ্রেসের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল, কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর গ্রেফতার, অনশন, যুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগিতা সমস্ত কিছু বিনয়ের সহানুভূতি লাভ করে, কিন্তু কংগ্রেসের বীর শাহেদুদ্দীনের মতো দু'একটি চরিত্র ছাড়া প্রায় মানুষগুলির মাঝে সে দেখে সুবিধাবাদী মনোভাব। তাই সে দ্বিমুখী দ্বন্দ্বে ভোগে। এ দ্বন্দ্ব থেকে তার মুক্তিলাভ যেখানে, সেখানেই সে হবে Political man. পূর্বেই বলেছি এটা একটা রাজনৈতিক উপন্যাস। রাজনীতি আশ্রিত বলে নয়, রাজনৈতিক পটভূমিকায় সৃষ্ট বলেও নয়, রাজনৈতিক চরিত্রে ভরপুর বলেও নয়, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মানুষকে মুক্তিদানের জন্য সাম্যবাদী ইঙ্গিতের রাজনৈতিক আশাবাদ এ উপন্যাসে ব্যক্ত করা হয়েছে তাই উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাসের মর্যাদায় দাড়িয়ে যায়। 'তেরশ পঞ্চাশ' পর্বের আলোচনার শুরুতে বিনয় চরিত্রের বিশ্লেষণ রয়েছে। এবার অন্যান্য চরিত্রের আলোচনা করা হল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উপন্যাসে অর্ধশতাধিক বিভিন্ন পেশার চরিত্র রয়েছে, এ অর্ধশতাধিক চরিত্রের মধ্যে বেশীর ভাগ চরিত্রের আলাদা কোন স্বাতন্ত্র্যতা নেই, কারণ বেশীর ভাগ চরিত্রের প্রধান পরিচিতি তারা রাজনৈতিক কর্মী। তাই অমিত, মজিদ, প্রমথ শিবুদা, সুধা এদের প্রধান পরিচিতি এরা কম্যুনিস্ট কর্মী।

শাহেদুদ্দীন, সুরেশ দত্ত, যাদব বাবু, বরদা বাবু - এদের প্রধান পরিচিতি এরা কংগ্রেস ম্যান, জাহেদুদ্দীন, হাফেজ, ইব্রাহিম, খাঁ বাহাদুর, এদের প্রধান পরিচিতি মুসলীম লীগের কর্মী।

শচীপ্রসাদ, মুরারি সেন, ইলাহি ভাই, যশোদা চৌধুরী, ইদ্রিস মিঞা, প্রমোদ চৌধুরী, মুকুন্দ পাল, সুরেন চৌধুরী - এদের একমাত্র পরিচিতি এরা ব্যবসায়ী।

নারী চরিত্রের মধ্যে হেনা, উমা, চিত্রা, শিরীন, বেণু রেণু প্রমুখ. চরিত্রের কোন উজ্জ্বলতা নেই। এক মাত্র ব্যতিক্রম সুধা এবং স্বল্প পরিসরে উজ্জ্বল বাই আম্মা চরিত্রটি। মজলুল হক, সুরাবর্দি, মহাত্মা গান্ধী, জিন্নাহ, শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইস্পাহানি - এরা উপন্যাসে এসেছে আলোচনায় বিষয় হয়ে, চরিত্র হিসাবে নয়।

মনুন্তর স্রষ্টা'র দুর্বলতা এখানে - একই স্বভাবের অনেকগুলি চরিত্র দেখানো হয়, আবার এই চরিত্রগুলি একই ঢঙে কথা বলে, কখনো একই কথা বলে, ফলে এই টাইপ চরিত্রগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাতে ব্যর্থ হয়, এবং একই বিষয়ের পুনরোক্তিতে গল্পটা শিথিল হয়ে পড়ে। লেখক চমৎকার দুএকটি চরিত্র এঁকেছেন মাত্র, যেগুলি আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। তার মধ্যে বাই আম্মা প্রধান। খুব স্বল্প পরিসরে এ চরিত্র-টিকে আনা হয়। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব, উদারতা, সাহসিকতা, নীতিবোধ আমাদেরকে মুগ্ধ করে রাখে। এই প্রতিবাদী গ্রাম্য বয়স্কা মহিলা - বাই আম্মা কে কমিশনার সাহেব ডেকে বলল, কি চাই তোমাদের ? আম্মা বলল, ভাত দাও, সাহেব। ফ্যান দাও। কমিশনার সাহেব বলল 'কোথা থেকে সরকার তা দেবে ? লড়াইয়ের টাইম'। শুনেই আম্মা ক্ষেপে গেলেন - 'লড়াইয়ের টাইম তোমাদের কোথা, সাহেব ? তোমাদের হাকিম চলছে, হুকুম চলছে, আলো জ্বলছে, পওয়া চলছে, গাড়ী চলছে, ফূর্তি চলছে। লড়াইয়ের টাইম তো আমাদের। - আমাদের ছেলে গেছে লড়াইতে, আমরা পাই না ভাত, হালিম গেছে ফৌজে, আর তার বাচ্চারা আজ না খেয়ে মরছে। ওমরালী মরেছে ফৌজে - তার আউরাৎ সেদিন পেটের জ্বালায় ফাঁসি দিতে গেল।

মোহন দাসের ব্যাটা গেছে লড়াইতে - তার মা-বাপ খেতে পায় না, বিধবা বোন্ যাবে কোথায় ? আমরাই গেছি লড়াইতে, আর আমরাই না খেয়ে মরছি - লড়াই তোমাদের কি, সাহেব ?"(তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.১৮৭-৮৮)।

বাই আম্মা যখন মুখের উপর এ কথা বলে, তখন আমাদের স্মরণ হয় আমাদের তৎকালীন সাহেবদের তল্পিবাহক, নেতা-মন্ত্রিদের কথা, বাই-আম্মার মতো জোরালো নিভীক দেশপ্রেমী মন তাদের ছিলনা বলেই, ধুঁকে ধুঁকে অনাহারে আমাদের এতগুলি মানুষ মারা গেল। তারাশঙ্করের বক্তব্য প্রণিধান করে প্রশ্ন করা যায় - যুদ্ধ তো বিলাতের মাটিতেও হয়েছে, মূল যুদ্ধ তো সেখানে, সেখানে অনাহারে মরল কে ?'

বাই আম্মা বিশ্বের সাম্যবাদীদের জন্য তার সমস্ত সম্পদ দান করে দেয়। কারণ সমস্ত মজুর-কিসান, শোষিত শ্রেণী তার আপনার। বিনয় তাই ভাবে, "কোথায় খালেকুজমান - কোথায় আজ কে ? তার বুড়ী মায়ের কাছে লড়াইয়ের দিনে আজ সমস্ত গাঁয়ের লোকেরা তাঁর আপনার হয়ে উঠছে, সমস্ত মজুর কিসান তার আপনার ছেলে হয়ে উঠেছে - সব মানুষ হয়েছে আপনার।" (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ.১৮৮)।

এই বাই আম্মা চরিত্রটি উপন্যাসে শুধু নারী চরিত্র নয়, সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যেই বেশ উজ্জ্বল। স্বল্প পরিসরের এ চরিত্রটি স্মরণ করায় ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের মা চরিত্রটির কথা। যদিও দুটি চরিত্রের মাঝে পরিবেশগত, পরিসরগত অনেক পার্থক্য, তবু মনে হয় কোথায় যেন বেশ মিল।

এ ছাড়া একটি বিষয়, এ উপন্যাসে নারী চরিত্রের পরিমাণ খুব বেশী নয়, তার মধ্যে কয়েকটা চরিত্রের কোন সক্রিয়তা নাই। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রের মধ্যে সুধা গুপ্তা চরিত্রটি প্রধান। উপন্যাসের তিনটি পর্বেই এ চরিত্রটি বিস্তৃত। উপন্যাসের শুরু বিনয়ের সাথে সুধার পরিচয় দিয়ে, আর উপন্যাসের শেষ বিনয়ের সাথে সুধার মিলনের মধ্য দিয়ে। মধ্যে দু'বছরে ঘটে গেছে অনেক কিছু, দেশব্যাপী,

পৃথিবীব্যাপী, সুধা ছিল কর্তব্যে অটল। বিনয়কে ঘিরে তার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি একথা পরিপূর্ণ সত্য নয়, কারণ বিনয়ের সাথে তার রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে সুধা সংশয়ে ভুগেছে, কিন্তু সে সংশয় হৃদয় দ্বন্দ্বে বলিষ্ঠ হয়ে ফুটে উঠেনি এক-মাত্র কারণ, সুধা তখন জয়-পরাজয়ের সংশয়ে, এমন এক রাজনৈতিক সংকটে, যেখানে প্রণয় সংকট বা হৃদয়ের দ্বন্দ্ব আঁচড় কাটতে পারেনি। ঔপন্যাসিক খুব পরিকল্পিত ভাবে এ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন, চরিত্রটির কোথাও কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। লোভ-মোহ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে এ চরিত্রটির গন্তব্যে এগিয়ে যাবার দায়িত্ববোধ দেখে মনে হয়, মানুষ নয়, যেন একটি রোবট তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ফলে সমালোচক বলতে বাধ্য হন - "... ভাষায় তীব্র সাঙ্কেতিকতা প্রাচুর্য ও স্থানে স্থানে বিশ্লেষণ কুশলতা থাকিলেও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের - ঘাত-প্রতিঘাতের নিবিড় সমন্বয় সাধিত হয় নাই"।[১]

ঔপন্যাসিকের এক অনন্য সৃষ্টি সুধাগুপ্ত চরিত্রটি। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর'এর নায়িকা নীলার মতো সে কম্যুনিষ্ট কর্মী হলেও রাজনৈতিক চরিত্র হিসাবে সে অনেক বলিষ্ঠ।

সুধা গুপ্তা বি.এ, কলকাতার মেয়ে স্কুলের টিচার, আধুনিকা, কিন্তু তার প্রধান পরিচয় সে কম্যুনিস্ট অমিত দার শিষ্যা, রাজনৈতিক কর্মী, তার রাজ-নৈতিক ব্যক্তিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং এর সাথে দীপ্তিময়ী উজ্জ্বল দুটি চোখ বিনয়কে দুর্বল করে তুলে। বিনয় সুধার জন্য অস্থির, কিন্তু সুধার কোন আবেগ-উদ্বেগ নেই, হৃদয় নয় কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বই তার চরিত্রের প্রধান দিক। এ ছাড়া নারী চরিত্রের মধ্যে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ-চরিত্র সীতা রায়, মিস সীতা রায় সোনাপুরের মেয়ে-স্কুলের টিচার। সদালাপী, হাস্যময়ী মিস্ সীতা রায় অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়া হয় বিনয়কে। সেখানে বিনয়ের সাথে সীতা রায়ের প্রথমে পরিচয় এবং পরে আস্তে আস্তে ভাল লাগার সম্পর্ক হয়। বিনয় একসময় সীতার সাথে সুধার তুলনা করতে বসে। সীতার সাথে বিনয়ের সম্পর্কটা প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ তার আগেই একদিকে সুধার প্রতি বিনয় দুর্বল ছিল, অন্যদিকে সহজ সরল মানুষ শিবুদাকে সীতার পছন্দ। কিন্তু এ পছন্দ সফল ভালোবাসায় উত্তীর্ণ হতে

পারে না, সীতা অবশেষে শিবুদার মৃত্যুর পর প্রথমকে বিয়ে করে। দুর্গত মানুষের জন্য সীতা নিজের চাকরির ঝুঁকি নিয়ে আর্তসেবায় নিয়োজিত হয়। বৈকুণ্ঠ বাবু মহিম জোট পাকিয়ে এই অল্প বয়সী মেয়েটির পিছনে লাগে। তার উপর বিভিন্ন ধরণের শাসন চালায়, দুরভিসন্ধি নিয়ে তাকে চিঠি লিখে, কিন্তু সীতা বুদ্ধিমতি, ফলে সে কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে অবশেষে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। শিবুদা'র মৃত্যুতে সে যখন বিনয়ের সামনে কেঁদে ফেলে, তখন তার হৃদয়ের কোমলময়ী দিকটি ফুটে উঠে। সীতাচরিত্রটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকটগুলি দেখানো হয়েছে।

চিত্রা চরিত্রটির উজ্জ্বল কোন দিক নেই, কারণ রাজনৈতিক এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের আদর্শের সাথে তার মিল নেই। সে রাজনীতি বোঝে না, রাজনীতি করে না। সত্যিকার ভাবে, রাজনীতিতে তার কোন ইন্টারেস্ট নেই। সে সুন্দরী, সুগায়িকা, সংযতবাক, সুসংহত, তার এসব গুণ প্রথম দিকে বিনয়ের ভালো লেগেছিল, ফলে বিনয় তাকে বিয়ে করতে মনস্থ হয়। কিন্তু কিছুদিন পর বিনয়ের মোহভঙ্গ হয়। কারণ গৃহনিপুণা রূপ-সুন্দরীকে বিনয় আর বিয়ে করতে রাজী নয়, সে তত দিনে সুধার মাঝে পেয়ে গেছে অন্য সম্মোহনী শক্তি। এ চরিত্রটির ট্রাজেডি গড়ার কিছু সুযোগ ছিল, কারণ বিনয়কে সে বর হিসাবে পাচ্ছে স্বপ্ন দেখার পর তার এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। এছাড়া অধ্যাপক সেন রায় তার জীবনের উপর একটা আঁচড় দিয়ে দেয়, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাকে ট্রাজিক চরিত্র হিসাবে গড়ে না তুলে দেখালেন জামসেদপুরের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তার এখন সুখের সংসার, সে এখন বেতারের গায়িকা।

হেনা, উমা, রেণু, বেণু প্রভৃতি চরিত্রের উজ্জ্বল কোন ভূমিকা নেই। হেনা ব্যবসায়ী শচীপ্রসাদের স্ত্রী এবং গৃহবধূ, এই তার পরিচিতি। উমা পত্রিকা সম্পাদক শৌরিনের স্ত্রী। রেণু, বেণু প্রথমে কম্যুনিষ্ট কর্মী পরে ব্যবসায়ী বীরু সেনের বউ এবং শালিকা। তাদের ঘিরে বীরুর হৃদয়- দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু

তা খুব একটা বলিষ্ঠ হয়ে উঠে না। সে তুলনায় আমিনা চরিত্রটির বিপ্লবী ভূমিকা রয়েছে। বেণু অবশ্য একজন মুসলিম ডাক্তারকে বিয়ে করে সামাজিক সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠতে যায়। মুসলিম সমাজের কিছু প্রতিবাদী মেয়ে ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে এবং শিক্ষার দিকে ধাবিত হতে চায়, আমিনা তাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিনয়ের সুবিরোধী আচরণ আগে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের দুর্বলতা—বেশীর ভাগ চরিত্র রাজনৈতিক কর্মী, এবং তাদের দোষ গুণ বড় নয় - তাদের রাজনৈতিক আদর্শই বড়। এর মধ্যে অমিত চরিত্রের সাথে তারাশঙ্করের মন্বন্তর উপন্যাসের বিজয়দার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অমিতদা কম্যুনিষ্ট দলের শুধু একজন কলকাতার নেতা নয়, একজন সৎ মানুষ। তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাকে গুরুর স্তরে উন্নীত করে। তার কর্মীরা তার শিষ্য-শিষ্যা হয়ে কাজ করে। এই গুণ তৎকালীন বেশ কিছু কম্যুনিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিল। ফলে জাতীয়তাবাদী তারাশঙ্করকে শিল্প বাস্তবতার খাতিরে বিজয়দা চরিত্রটি সৃষ্টি করতে হয়। কম্যুনিস্টকর্মী চরিত্রগুলির মধ্যে আর একটি চরিত্র গুরুত্ব পেয়েছে। সে হচ্ছে শিবুদা। তাকে অনেকে ভালবাসে। কারণ সে শিশুর মত সরল, নেতার মত উদার, কর্মীর মত আন্তরিক। সে কম্যুনিষ্ট হয়ে একজন কংগ্রেসী ছোঁয়াছে রোগীর সেবা করতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। শিবুদার মৃত্যুতে সীতা কেঁদে ফেলে, বিনয় সোনাপুরের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

কংগ্রেস ম্যানদের মধ্যে মীর শাহেদুদ্দীন একজন স্বার্থহীন লোক। মুসলমানরা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে মুসলিম লীগের পতাকা তলে চলে গেলেও শাহেদুদ্দীন তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না। দেশব্যাপী যখন অর্থ আয়ের সুযোগ, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে মুনাফা লাভের ঢল বয়ে যায়, সে সময় অনেক মুসলিম নেতা কর্মী তাতে নেমে পড়লেও শাহেদুদ্দীন কোন লোভ-মোহের শিকারে যায় না।

মুসলিম লীগের চরিত্রগুলির মধ্যে আদর্শবাদী চরিত্র ঔপন্যাসিক খুব একটা দেখাননি, যেটা দেখিয়েছেন কম্যুনিষ্টদের মধ্যে। মুসলিম লীগের এম·এন·এ শাহেদুদ্দীন

সহ প্রায় কর্মীকে দেখিয়েছেন সুবিধাবাদী রূপে। অবশ্য তখন সুবিধাবাদের জোয়ারে বাস্তবে কিছু নেতা-কর্মী গা ভাসিয়েছিল।

ব্যবসায়ী চরিত্রগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক সৎ কোন চরিত্রই আঁকেননি। মুরারী সেন, ইব্রাহিম ভাই থেকে শুরু করে মুকুন্দ পাল, সুরেন পাল সবার একটাই পরিচয় মুনাফা শিকারী। এদের আর আলাদা পরিচিতি কোন প্রতিষ্ঠা পায় না। মুনাফার জন্য এরা যা করেছে তা কোন সুস্থ ব্যবসা নয়, মজুতদারী, কালোবাজারী দুর্নীতি। যে কোন উপায়ে মুনাফা আয় ছিল এদের উদ্দেশ্য। দুর্নীতি করে অর্থ আয়ের জন্য এরা আবার জোট বাধে, ট্রাস্ট গঠন করে, এরা এরা সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সম্পর্ক যেন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যুর জন্য এদের ভূমিকা ছিল প্রধান, মনে হয় লেখকের চেতনায় এ বিশ্বাসের উপস্থিতি কখনও স্থান হারা হয় নি।

উপন্যাসে প্রভাত চৌধুরী, রাজেন্দ্র বাড়ুজে কিংবা সীতা রায়ের মধ্য দিয়ে স্কুল শিক্ষকদের ঐ সময়ের দুর্গতি দেখানো হয়েছে, যখন মন্বন্তরের প্রভাবে স্কুলগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, শিক্ষকদের বেতনও বন্ধ কিংবা বেতনের সাথে ব্যয়ের সংগতি ছিল না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে গঙ্গাচরণ কিংবা দীনু অ্যাচার্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শ্রেণীর দুর্যোগের প্রতি আলোকপাত করিয়েছিলেন।

দীর্ঘ পটভূমিকার মন্বন্তর ত্রয়ীর উল্লেখযোগ্য চরিত্র সমূহ আলোচনা করা হল। এবার খুঁজে দেখি এ উপন্যাসে মন্বন্তরের কারণ হিসাবে কি দেখানো হয়েছে। এ কারণগুলি বাস্তব দলিল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গোপাল হালদার ঔপন্যাসিক হলেও তাঁর অন্য পরিচয়ও রয়েছে, তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, সমাজ বিজ্ঞানী, এবং সর্বোপরি তার দৃষ্টি ছিল - অনুসন্ধানী –গবেষণামূলক।

আমরা জানি পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পথ প্রস্তুত করেছিল, তার

বিস্তারিত রূপায়ণ মন্বন্তর ত্রয়ী। মুদ্রাস্ফীতি এ মন্বন্তরের আর একটি কারণ ছিল, সে মুদ্রাস্ফীতি দেখাতে একটি সহজ কথাই গোপাল হালদার বলেছেন মি·সেনের মুখ দিয়ে। বিনয় যখন জিজ্ঞাসা করল - "আচ্ছা এত টাকা গভর্মেণ্টই বা পাচ্ছে কোথায় ? সেন হাসলেন : কেন ? ছাপা কাগজ তো, ছাপালেই টাকা হয়।" (পঞ্চাশের পথ, পৃ·১০৬)।

এর পর এসেছে ডিনায়েল পলিসির কথা। খুব বিস্তারিত ভাবে দেখানো হয়েছে সরকারের এ পোড়া-মাটি নীতির ফলে জনগণের দুর্যোগ, ধান চাল নিয়ে সৃষ্ট সংকট এবং খাদ্য সংগ্রহের সমস্যা ইত্যাদি। রেলপথ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন, রেল বসানো হয়েছে খাদ্য পাচার করার জন্য।

রাজনৈতিক দুর্নীতি দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক বিভিন্ন চিত্রের মধ্য দিয়ে। ইস্পাহানীর সাথে সরকারের সম্পর্ককে বলেছেন, ইস্পাহানীর তাবেদারী। এ ছাড়া উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে দেখানো হয়েছে - সাম্রাজ্যবাদিতা এবং দুর্নীতিগ্রস্থ শাসকদের শাসন নামক অত্যাচার পদ্ধতি। কোথাও কোথাও লেখকের ব্যঙ্গ উক্তি· বেশ সরস। ঘুষ প্রসঙ্গে বলেছেন "পৃথিবীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চলছে আর এ চলবে না ? ওরা জার্মান নয়। ওদের রাজ্যটা ঘুষের উপর গড়া। ওরা সিঙ্গাপুর কনস্ট্রাকসন থেকে রেঙ্গুন ডেস্ট্রাকসন-এ পর্যন্ত ও জিনিসের মর্যাদা রেখেছে"। (পঞ্চাশের পথ, পৃ·১৫)।

এ ছাড়া মন্বন্তরের কারণ হিসাবে ঔপন্যাসিক বড়ো করে দেখিয়েছেন মজুতদারী, কালোবাজারীকে। ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা কোন পর্যায়ে ছিল বুঝা যায়, তিনি প্রতিটি ব্যবসায়ীকে দেখিয়েছেন যখন - অসৎ হিসাবে। ঔপন্যাসিকের এ উপলব্ধি ছিল অভিজ্ঞতা থেকে। এখানে তিনি কিছুই অতিরঞ্জিত করে দেখান নি, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয় না। গোপাল হালদার এক পত্রিকা সাক্ষাৎকারে তার ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন -

> "আমি সে সময় একটা নাম করা ইংরেজী কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতাম। বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করে বা বিরোধীতা করে এবং সরকার যে অন্যায় ভাবে লোককে নিপীড়িন করছে - এই মর্মে আমাকে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লিখতে হতো। কিন্তু যখন

কোন প্রবন্ধে মজুতদার বা কালোবাজারীদের আক্রমণ করতাম তখনই দেখতাম উপরকার কোন কোন লোকের কাছ থেকে বাধা আসছে। বুঝলেন। আমি তো কর্মচারী।" [১০]

গোপাল হালদার দেখিয়েছেন - সব জিনিসে ভেজাল। ভেজাল খেয়ে মানুষ এমনিতেই মারা যাচ্ছে। কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এ ছাড়া ঔষধেও ভেজাল। ভেজাল ঔষধ উৎপাদনকারী শচীপ্রসাদের এক মাত্র মেয়ে ইরা মারা যায়, তারই কারখানার তৈরী ভেজাল ইনজেকশনের কারণে। ঔপন্যাসিক তাই ব্যাঙ্গোক্তি করেন, এমন যুগ কুইনাইনও আর তেতো নয়। ঔপন্যাসিক এঁকেছেন বীভৎস এক চিত্র। যেখানে ভেজাল, ঘুষ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ফটকা বাজার, দালালী, এর সাথে টাকার ঢল চলছে। মুনাফা শিকারীরা হন্যে হয়ে উঠেছে। যেন যা-পার এ বিশৃঙ্খল সময়ে কুড়িয়ে নাও। এ এক মহা সুযোগ। স্মরণ করা যেতে পারে 'কত ক্ষুধা' উপন্যাসের চরিত্র অমরেন্দ্র বাবুর কথা "এমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে, ... আর্থিক দুনিয়ায় এখন নেপোলিয়ন হতে হবে।" [১১] মার্কিন গবেষক পল আর গ্রীণো পঞ্চাশের মন্বন্তরে অন্নদাতা কর্তৃক পোষ্যদের ত্যাগের তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করে যে তত্ত্ব দিয়েছেন - গোপাল হালদার তার আগেই উপন্যাসে এ তিনটি পর্যায়ের চিত্র এঁকেছেন। যেমন উপন্যাসে আমরা শাসকদের অর্থাৎ গোপাল হালদারের ভাষায় শাদামুখো কর্তাদের দেখি, প্রজাদের উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে। যেমন পূর্বেই একটি উদ্ধৃতি আছে, শাদা মুখো কর্তা, ফজলুল হকের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এ চাল এখানের জন্য নয়। অথচ ইস্পাহানী চাল দিতে তৈরী ছিল, তার অর্থ চাল যথেষ্ট মজুত ছিল।

গ্রীণোর দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রেণী, গরীবদের উপর থেকে সমাজের অবস্থাপন্নদের মুখ ফিরিয়ে রাখার দৃশ্য দেখি আমরা এ উপন্যাসে। মিস্টার সেন চরম দুর্ভিক্ষের সময় যে ভোজের আয়োজন করে তা যেন মানুষের দুর্দিনে পিশাচের হাসি। অসহায় মুমূর্ষু প্রায় মানুষগুলি যখন ফ্যানের জন্য আহাজারি করছে, সে সময় তাদেরই মুখের আহার কেড়ে যারা হৃষ্টপুষ্ট তাদের ভোজ সভায় খাবারের যে মেনু তা পড়ে শেষ করা যায় না। ছাপানো হয়েছে পুরোপুরি চৌষট্টি পদ। ঔপন্যাসিকের শ্লেষোক্তি - মেনুটা ঘরে রাখার মত। গ্রীণোর তত্ত্বের তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে এসেছে গৃহ-স্বামী বা উপার্জনক্ষম

ব্যক্তি কর্তৃক পরিবার বা পরিজন ত্যাগ। তার অনেকগুলি খন্ড চিত্র রয়েছে এ মন্বন্তর ত্রয়ী'তে।

গোপাল হালদারের এ উপন্যাসের বিজয় এখানে;ঐতিহাসিক বা অনুসন্ধান কমিটির তৈরী রিপোর্ট দেখে গোপাল হালদার উপন্যাস লেখেননি। কারণ উপন্যাস রচিত হয়েছে মন্বন্তরের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়ার অনেক আগে। তবে অবশ্য দৃষ্টে মনে হয় ঔপন্যাসিকরা দলিল ধর্মী যে উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন তা থেকে গবেষকরা তথ্য বা ইঙ্গিত নিয়েছেন। আবারো বলতে হয়, মন্বন্তরের উপন্যাসের বাস্তববাদীতা প্রশংসনীয়। আধুনিক উপন্যাস মাত্রই আজ বাস্তববাদী হওয়া চাই। স্মরণ করা যেতে পারে, সোফোক্লিসের 'ইডিপাস' ট্রাজেডি সামনে রেখে আরিস্টটল ট্রাজেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন। কি উৎকৃষ্ট শিল্প, তার প্রমাণের জন্য দিচ্ছে।
গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী নিয়ে সমালোচকের যে অভিযোগ রয়েছে -

> "উপন্যাসের তিন পর্বের কোনটিতে কাহিনী সংহত নয়, ...
> গল্পরস কম। সাংবাদিক ধর্মী রচনা"[১২]

তা স্বীকার করেও বলতে হয় উপন্যাস বা শিল্প কর্ম বিচারের মাপকাঠিতে এ বিষয়গুলি নির্ধারিত ভাবে খোঁজা হয় বলেই -

> "এই উপন্যাসের সমতুল্য বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আর
> না ঘটা সত্ত্বেও শিল্পকর্ম হিসাবে এটি সম্পূর্ণ সুসংহত
> হয়ে ওঠতে পারেনি।" [১৩]

কিন্তু অনেক অভিযোগ উপস্থাপনার পরেও এ কথা স্বীকার করতে হয় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 'ভারত ছাড়ো'আন্দোলন' প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলার আর্থ-সামাজিক শোষণ ও শোষিত সমাজ ব্যবস্থার এটি একটি মহামূল্যবান ডকুমেন্ট।

এই উপন্যাস ত্রয়ীতে গোপাল হালদার কম্যুনিষ্টদের ভূমিকাকে খুব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। এ কথা ঠিক, যে কথা তারাশঙ্কর ও 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দেখিয়েছেন, কম্যুনিষ্টরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য অনেক সেবা-মূলক কাজ করেছিলেন। সে সময় বিয়াল্লিশের আন্দোলনে কংগ্রেসের বড় এবং ছোট

প্রায় নেতাই জেলে বন্দী থাকায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় কম্যুনিস্টরা সেবার কাজে সে শূন্যতা পূরণ করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে কম্যুনিস্টরা এই দুর্ভিক্ষের জন্য মূলত দায়ী যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন, তার বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন সংগঠিত করে নি ? কেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে দলবদ্ধ করে খাদ্য ছিনিয়ে নেবার কাজে নেতৃত্ব দেয়নি ? কারণ ছিল সোভিয়েট ভূমি জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পরে কম্যুনিস্টরা জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্র পক্ষের যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করে। এই মিত্র পক্ষে সোভিয়েতের মিত্র ছিল ব্রিটিশ সরকার। এ কারণেই ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টা যাতে বাধা না পায়, সেই দিকে কম্যুনিস্টদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। দুর্ভিক্ষ নিয়ে ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে ইংরেজ সরকার বিব্রত হত। সেই কারণেই কম্যুনিস্টরা আন্দোলন করে নি। খাদ্য ছিনিয়ে নেবার জন্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে উৎসাহিত করে নি। একই ব্যাপার আমরা বিজন ভট্টাচার্যের বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটকে লক্ষ করেছি। সেখানে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে 'ধর্মগোলা' প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলা হয় নি।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। তেরশ পঞ্চাশ : প্রথম প্রকাশ, পুঁথিঘর, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৪৫।

২। দ্রষ্টব্য : এ গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রেল লাইন স্থাপন প্রসঙ্গ।

৩। গোপাল হালদার : ভূমিকা, পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহা মন্বন্তর', জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪।

৪। অমিয় ধর : 'গোপাল হালদার জীবন ও সাহিত্য, অতএব প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৯, মে ১৯৯২, পৃ.৫৩।

৫। গোপাল হালদার : লেখকের কথা, 'তেরশ পঞ্চাশ', পুঁথিঘর, কলকাতা ১৯৪৫।

৬। গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : 'পরিচয়', জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১, গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পৃ.২০১।

৭। অশ্রুকুমার সিকদার : 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০০, অক্টোবর ১৯৯৩ পৃ.১৮৩।

৮। গোপাল হালদার: লেখকের কথা, 'তেরশ পঞ্চাশ', পূর্বোক্ত সংস্করণ।

৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৭৩, পৃ.৬৫৭।

১০। গোপাল হালদার : সাক্ষাৎকার, 'সংস্কৃতি ও সমাজ পত্রিকা' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ.১০৪-১০৫ (সাক্ষাৎকারটি শ্রী মৈত্রেয় ঘটক গ্রহণ করেন ১৯৮২ সালের জুন মাসে)।

১১। বিনতা রায় চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কথাসাহিত্য' সাহিত্যলোক, কলকাতা, মাঘ ১৪০৩, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ.১৪৩।

১২। শৈলেশ বিশ্বাস : 'কথা শিল্পী গোপাল হালদার : 'অতএব ভাবনা', ২য় সংখ্যা, মে ১৯৯২, পৃ.৮৪।

তিলাঞ্জলি

'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪)[১] সুবোধ ঘোষের প্রথম উপন্যাস। মন্বন্তরকে বিভিন্ন উপন্যাসিক বিভিন্ন ভাবে তাদের রচনায় ধরে রাখতে চেয়েছেন। এর জন্য গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন কলাকৌশল। চরিত্র এনেছেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে। সচেতন শ্রেণী হিসাবে এনেছেন শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, শিল্পীদের। শিল্পীমাত্রেই সমাজ সচেতন। তাকে গ্রহণ করতে হয় মানুষের প্রতিদিনকার অনুভূতি। সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) সচেতন হয়ে একজন সুরশিল্পীকে মন্বন্তর পটভূমিকার উপন্যাসে কেন্দ্রবিন্দুতে এনে উপন্যাস এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর এই সচেতন উদ্যোগ আমাদের স্মরণ করায় জয়নাল আবেদিন, সোমনাথ হোর, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখের কথা, মন্বন্তর যাঁদের অনুভূতিকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছিল। তিলাঞ্জলিতে সুরশিল্পী শিশির মন্বন্তর থেকে মুক্তির জন্য খুঁজে ফিরেছেন বিভিন্ন গলি গলি। জীবনবাদী কোন গানে সচেতন করা যায় মানুষকে, তার জন্য কি করা উচিত এ নিয়ে উদগ্রীব শিশির। কখনো রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'কে নিয়ে সুর বাঁধা, কখনো গ্রামে গঞ্জে, গান গেয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা, সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য মন্বন্তর নামক 'হত্যাকান্ড' থেকে মানুষকে উদ্ধার। এ দুর্যোগ কত স্পর্শকাতর তা বোঝা যায় চরিত্রগুলির পরস্পরের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি চিন্তা-চেতনা থেকে। কম্যুনিষ্ট, ন্যাশনালিষ্ট, ক্যাপিটালিষ্ট এতোদিন অবচেতন ছিল। এখন সবাই তৎপর। জোট বাঁধতে, কিংবা অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষ উদগীরণ করতে আর দ্বিধা করছে না। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছে যা রীতিমত দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ে। এর মধ্যে শোষক, মজুতদার এবং চোরাকারবারী ছাড়া অন্যদের সবার উদ্দেশ্য মানুষকে এই দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করা। পথ আলাদা, কিন্তু উদ্দেশ্য এক, তবু পরস্পরের প্রতি অভিযোগ বেড়ে চলে।

ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগঠন 'জনযুদ্ধ' যেমন একদিকে প্রচারণায় এসেছে, তেমনি এসেছে মার্কিন-ব্রিটিশ বা ইম্পায়ারালিষ্ট বিরোধী মনোভাব। কারো ভাবনা, জাপানের জয় মানে নির্যাতনের জোয়ার, কারো ভাবনা যে ব্রিটিশ রাজকে সহযোগিতা

করা বোকামী, যারা জাত সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতবর্ষের আজীবন শোষক। দুটিনটি দলে চরিত্রগুলি ভাগ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কংগ্রেসী মতাদর্শে বিশ্বাসী অবনীনাথ, ইন্দ্রনাথ, শিশির। শিশির মধ্যে একবার সিতার কথায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সংগঠনে যোগ দেয়। কিন্তু সেখানে প্রতারণা পেয়ে ফিরে আসে। অবশ্য শিশিরের কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান এবং ফিরে আসা কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ নয়। মনে হয় লেখকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অন্য দিকে বিরোধী মনোভাব নিয়ে ডাক্তার বনমালী মুখার্জী, কালীকিঙ্কর বাবু। উপন্যাসে দেখা যায় চরিত্রগুলির কাছে মনুষ্যত্ব নয়, রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব অনেক বড় হয়ে উঠেছে। যেমন -"অবনী হাত তুলে তার ভুরুর উপর একটা পুরাতন ক্ষতচিহ্ন দেখালো। এটার ইতিহাস জানো ? অরুণা-না। অবনী আমি আর ইন্দ্র একই স্কুলে পড়তাম। দেশের কাজ করতে গিয়ে আমাদের ছেলে বেলার জীবন ও দুটো দলে ভাগ হয়েছিল। আমাদের ছিল মুক্তি সমিতি, ইন্দ্রদের দিন শক্তি সমিতি। ইন্দ্র নামের প্রথম দেশ সেবার কীর্তি হলো এই দাগটা। অরুণা বুঝতে পারছিল না, অবনী তাই আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ ছুরি মেরেছিল। অরুণা। - ইন্দ্রনাথ ?

অবনী - আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা চরকা একজিবিশন সেরে দুর্লভপুর থেকে মাঠে মাঠে ফিরছিলাম, ইন্দ্রনাথ কোথা থেকে ছুরি নিয়ে এসে পথ রুখে বললো দেশের শত্রুকে শেষ করবো। অরুণা। - দেশের শত্রু ?

অবনী । -হ্যাঁ, আমরা তখন দলের শত্রুকেই দেশের শত্রু বলতাম, অর্থাৎ রাজনীতি চর্চা করতাম। ...

অরুণা। - আবার দুই শত্রু বুঝি বন্ধু হয়ে গেলে ? অবনী একটু অন্যমনস্কের মত বিড় বিড় করে উত্তর দিল - হ্যাঁ, সেই শত্রুতার পরেও তো ইন্দ্র আবার এসেছে। পথ বন্ধ হয়নি কখনো। সব দাগ মিটে গিয়েছিল। কিন্তু এবার ইন্দ্রনাথ আর আসবে না। পথ বন্ধ হয়ে গেছে। .... অবণী। - না অরুণা, তুমি জান না। জাগৃতি সঙ্ঘের লোকেরা সঙ্ঘেরই মানুষ। তাদের মনুষ্যত্বই ভিন্ন। খেতাবী মানুষ যেমন সকলের কাছে পর হয়ে যায়, ঐ সঙ্ঘের অফিসটি সেই রকম একটি অমনুষ্যত্বের সূত্রধর। যে সেখানে যায়, সেই সরীসৃপ হয়ে যায়। চারিদিকের আলোকের জীবনের জন্য কোন দরদ থাকে না।" (তিলাঞ্জলি, পৃ.১৬০-১৬১)।

অথচ জাগৃতি সঙ্ঘের সদস্যরা বিশেষত, সীতা, প্রকাশ বাবু, উর্মিলা কাঞ্জিলাল বিশ্বাস করে তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনমত সৃষ্টি তাদের কাজ। তাদের বিশ্বাস জার্মানী, ইটালি, জাপান এরা পররাজ্য গ্রাস করতে এবং শোষণ করতে চায়। এর জন্য তারা নতুন একটা সামরিক এবং অর্থনীতিক পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে, যেটা ভয়ানক, নিষ্ঠুর, কঠোর এবং সে ফ্যাসিস্টরা পৃথিবীর একমাত্র সাম্যবাদী দেশ রুশিয়াকেও আক্রমণ করেছে এবং তা অন্যায় ভাবে। জাগৃতি সঙ্ঘের আদর্শের সাথে যারা একমত পোষণ করে না, তাদের অনেকে কুৎসা রটনা করে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগঠন নিয়ে। সুবোধ ঘোষ এ উপন্যাসে কম্যুনিজমের আদর্শকে আক্রমণ করে তার বিরুদ্ধে মতবাদ দিয়েছেন। তারাশঙ্কর সাম্যবাদীদের উপন্যাসের নায়ক নায়িকা করেছেন তাদের মন্বন্তর প্রতিরোধে মহৎ উদ্যোগের জন্য, যদিও তারাশঙ্কর উপন্যাসের শেষে 'মহাত্মা'র প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি দেখাতে গিয়ে প্রচারবাদী বলে সমালোচকের কাছে অভিযুক্ত হয়েছেন। তবু তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের কম্যুনিস্টকর্মী চরিত্র সমূহ মূলত আদর্শবাদী ছিল, কিন্তু সুবোধ ঘোষ তৎস্থলে ফ্যাসিস্ত বিরোধী সঙ্ঘের নিন্দা করেছেন। প্রকাশ বাবুকে দেখিয়েছেন চরিত্রহীন। সংগঠনকে বলেছেন জোচ্চরের সংগঠন। ড. বিনতা রায় চৌধুরী বলেছেন -

> "লেখক এখানে কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মপদ্ধতি, আদর্শ, নিষ্ঠার সরাসরি নিন্দাবাদ করেছেন। শাণিত বাক্যবাণে বিদ্রুপ করেছেন। কম্যুনিস্টদের অন্তঃসারশূণ্যতা, নীতিহীনতা দেখাতে কম্যুনিস্ট নেতা প্রকাশ বাবুকে ব্যাভিচারী রূপে আঁকতেও দ্বিধা করেননি। কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যদের সরাসরি জোচ্চর পর্যন্ত বলেছেন ... বিপরীত দিকে কংগ্রেসীয় মতবাদের, কর্মপদ্ধতির, আদর্শ নিষ্ঠার সপক্ষে লেখক এমন অতিরিক্ত সমর্থন সূচক বক্তব্য দেখিয়েছেন যে তাকে কংগ্রেসের সপ্রচারক মনে হয়েছে।" [২]

দেখা যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রায় সমস্ত কিছুই এ উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে। মজুতদারী, চোরা কারবারী, কন্ট্রোল ব্যবস্থার দুর্নীতি, ছেলে বিক্রি, নারী পুরুষের গ্রামত্যাগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সচেতন তৎপরতা, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ ঘিরে মুদ্রাস্ফীতি,

আন্তর্জাতিক আদর্শতত্ত্ব কোনটাই এ উপন্যাস থেকে বাদ পড়েনি। কমলকুমার মজুমদারের মতো সুবোধ ঘোষও ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তবে পার্থক্যটা হচ্ছে, কমলকুমার ঘৃণা করেছেন পেশাকে, আর সুবোধ ঘোষ ঘৃণা করেছেন ভিক্ষুককে। ব্যক্তি জীবনেও সুবোধ ঘোষ ভিক্ষুককে অপছন্দ করতেন। ব্যক্তি জীবনে "দরজার কাছে আগত কোন ভিখারীকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ভিক্ষে তো দিতেনই না বরং কিছুটা মারমুখী ভাব দেখাতেন। কাজলীর কাঙালি ভঙ্গিটাই তার অসহ্য ছিল।" [৩] সুবোধ ঘোষ গরীব এবং ভিক্ষুক দেখিয়েছেন আলাদা করে। কিন্তু একটি প্রশ্ন কি আসে না ? পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিক্ষা করতে নেমেছিল, ভিক্ষা কি তাদের পূর্ব পেশা ছিল ? নাকি ভিক্ষাবৃত্তি একটা লাভজনক পেশা বলে তা গ্রহণ করেছিল ? পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সাধ করে কেউ ভিক্ষুক সাজে নি, যেখানে 'ফ্যানে'র জন্য কাড়াকাড়ি - মারামারি হচ্ছে, সেখানে সাধ করে কে ভিক্ষুক সাজবে। তিলাঞ্জলি আলোড়িত উপন্যাস। এই আলোড়ন মূলতঃ রাজনৈতিক মতবাদ ঘিরে। সুবোধ ঘোষের বড় ছেলে উত্তম ঘোষ লিখেছেন -

> "'ফসিল', 'গোত্রান্তর' গল্প নিয়ে যাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'র তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।" [৪]

উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সময় যে বিতর্ক সমালোচনা ঝড় তুলেছিল তা নয়, পঞ্চাশ বছর পরে এসেও প্রশ্ন করা হচ্ছে -

> "...'তিলাঞ্জলি' উপন্যাস সুবোধ ঘোষের শুধু প্রথম উপন্যাসই নয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন কর্মকান্ডের তিক্ত সমালোচনায় বাংলা সাহিত্যের লোমহর্ষক উপন্যাসের নজির হয়েই আছে 'তিলাঞ্জলি', অথচ যে সুবোধ ঘোষের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়েছিল শ্রেণীদ্বন্দ্ব, সমাজ মনস্কতা, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার সরণি ধরেই। - এমন কেন হয়েছিল ? এমন কেনই বা হয় ? লেখক শিল্পীদের এই ভাবে যাত্রাভঙ্গ ঘটে কেন ?" [৫]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের অনেক উপন্যাসই রাজনৈতিক প্রচারণার আশ্রয় স্থল হয়েছে। তবে তা কৌশলে এবং শিল্পের মধ্য দিয়ে আগত বলে বিতর্কের ঝড় তুলেনি। গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী, তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' ভবানী ভট্টাচার্যের 'নো মেনি হাঙ্গারস' প্রভৃতি উপন্যাসে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গি প্রতিফলিত, তবে সেখানে তিলাঞ্জলির মত সরাসরি বিরোধী আদর্শের দলকে অশৈল্পিক আক্রমণ ঘটে না। সমালোচক বলেছেন -

> "... এক দুঃখজনক ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় মুহূর্তে ১৯৪২এর ৮ই মার্চ লেখক সোমেন চন্দের হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়, যার ফলস্বরূপ 'ফাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয়, রাজনীতি নিরপেক্ষ লেখকগণও যার শরিক হন, অন্যদিকে ১৯৪৪এ গড়ে ওঠে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ - 'তিলাঞ্জলি' দ্বিতীয় শিবিরের সৃষ্টির বছরে রচিত এবং তার চিন্তাবহনকারী।" [৬]

"কমিউনিস্ট বিদ্বেষই এ উপন্যাসের সৃষ্টি মূলে নিহিত।" [৭]

ফলে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রকাশ বাবুর মুখ দিয়ে বলা হয় - "কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টির ভয়ে হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র জাতিয়তাবাদী আত্মাদুঃস্বপ্নে আতকে উঠেছে ... আমাদের যতকিছু শ্লোগান এই পার্টিকে বড় করার জন্যই। পার্টির প্রতিষ্ঠার পথে অন্য যে কোন দলের প্রভাবকে নৃশংসভাবে, ছলে বলে কৌশলে উপড়ে ফেলতে হবে। ... পার্টির অন্যতম প্রিয় নেতা ডাক্তার খোপড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টো আমাদের কাছে বেদ বাইবেল কোরআনের মত। পার্টির কর্মীদের শুধু সৈনিকের মত এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে - "they are not to reason why" (তিলাঞ্জলি, পৃ.১৬৮-৬৯)।

উপন্যাসের কাহিনীতে রাজনৈতিক তত্ত্ব গুরুত্ব পেলেও হৃদয় দ্বন্দ্ব গুরুত্ব পায়নি। উপন্যাসের কাহিনীতে দেখা যায়, ব্যবসায়ী গুরুদয়াল বাবুর কন্যা সীতা ভালোবাসে সুরশিল্পী শিশিরকে। অপরদিকে গুরুদয়ালবাবুর পছন্দ তরুণ ব্যবসায়ী জয়ন্ত মজুমদারকে। শিশিরের প্রতি ভালোবাসার ব্যাপার গুরুদয়াল বাবু প্রথম দিকে জানতেন না। জানলে শিশিরকেই গ্রহণ করতেন, কারণ এক মাত্র মেয়ের পছন্দ

অপছন্দই গুরুদয়াল বাবুর কাছে বড়। শিশিরের কোন মোহ নেই অর্থ সম্পদের প্রতি। ফলে তার আত্মবোধ এবং অহংকারী ভাব সিতার হৃদয়ে ঈর্ষা সৃষ্টি করে। বিনতা রায়চৌধুরী বলেছেন -"কিন্তু সিতা ও শিশিরের পারস্পরিক আকর্ষণকে কেন্দ্র করে প্রেম কোথাও দানা বাধতে পারে নি। তার কারণ উপন্যাসের কাহিনী সুসংহত নয়।" [৮]

শিশিরের আদর্শের প্রতি সিতার মূল দুর্বলতা। বিভিন্ন দলের, কর্মী এবং মানুষের কাছে মাত খেয়ে শিশিরও আদর্শচ্যুত হয়, তাই সিতা যখন শিশিরকে বলে তুমি বড় লোক হতে চাইছ। তখন শিশির বলে - ঠিক বড়লোক নয়। প্রয়োজন আছে বলেই টাকার ওপর লোভ আছে। শিশিরের পরাজিত এই হীন রূপ সিতার কাছে তাকে তুচ্ছ করে তোলে। সিতা এ সময় শিশিরকে জাগৃতি সঙ্ঘের সদস্য হয়ে কাজের মাঝে অনুপ্রেরণা প্রদানের চেষ্টা চালায়। কিন্তু শিশির সেখানে গিয়ে দেখে সঙ্ঘের ভন্ডামী। ফলে সে রুদ্র তেজী রূপ পুনরায় লাভ করে। সিতা এ সময় শিশিরের আবার সেই পূর্বের আদর্শনিষ্ঠা রূপ দেখে দুঃসাহসী ভালবাসার পথে উদগ্রীব হয়। ডোভার লেনের বসু-ভবনের ঐশ্বর্য ছেড়ে, শিশিরের পথের জীবনের সঙ্গী হতে মোহাচ্ছন্ন হয়। কিন্তু এর পরে যখন শোনে শিশির অবনীনাথের প্রতি ঈর্ষা এবং জীবনে অরুণাকে না পাওয়ার শূন্যতা সিতাকে দিয়ে পূর্ণ করতে চায়, তখন সীতার মনে হল "এতক্ষণে যেন সে একটা পাথরের মূর্তিকে ভুল করে জড়িয়ে ধরেছিল"(তিলাঞ্জলি, পৃ.৩৩৩)। উপন্যাসে শিশির সিতা এবং জয়ন্ত মজুমদারকে ঘিরে প্রেম-কাহিনী কোথাও শক্তি-শালী গতি পায়নি। এ ছাড়া অন্য জুটি অবনী ও অরুণাকে ঘিরেও আকর্ষণীয় গল্পরস নেই। সে তুলনায় যুদ্ধ, মন্বন্তর এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব উপন্যাসে বেশ জোরালো। উনিশশো বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দানা উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্তরে স্তরে ছড়িয়ে আছে। উপন্যাসের কাহিনীতে মন্বন্তরের চিত্র খুব বেশী না হলেও মূলত উপন্যাসটি রাজনীতি এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর- কেন্দ্রীক। মজুতদারী, কন্ট্রোল ব্যবস্থা, চোরা বাজার, অগণিত নারী পুরুষের 'পেট চাড়ালের পুজো' করতে কলকাতায় আগমন, ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষার বিভিন্ন কৌশল, এমনকি ভিক্ষুকদের জীবনবোধ, ভিক্ষুকদের মনের সংকীর্ণতা এ উপন্যাসে মূলত। ঔপন্যাসিকের

শ্লেষোক্তি - "ঘুষ-ইনফ্লেশন আর ঘুষখোর আমলা - তিন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় মুনাফাবাজের কাছে সোনার ফেরদৌস হয়ে উঠলো কচুরিপানার বাংলাদেশ। বাঙালীর জীর্ণ মুন্ডে যেন প্রচন্ড এক জিজিয়া বসাবার ফরমান পেয়েছে তারা। সদরে, মফঃস্বলে, রাজধানীতে - খালের মুখে, ঘাটের ওপর, গাছের ডালার - মৃত নিরন্নের মুন্ডগুলি গুণতে পারলে এই অতিলোভী হিংসার একটা হিসাব দাঁড় করানো যেত। (তিলাঞ্জলি, পৃ.২১৭)। কিংবা "উনিশশো তেতাল্লিশের কলকাতার একটি অপরাহ্নের এই এক রূপ। বিরাট একটা কটাহে যেন মনুষ্যত্ব ভাজা হচ্ছে।" (তিলাঞ্জলি, পৃ.১১৬)। অথবা "মিত্রশক্তি ? না শক্তির মিত্র ?" (তিলাঞ্জলি, পৃ.১১৫)। লেখকের এই বাক্যগুলির ব্যাপ্তি অনেক গভীর। এছাড়া সিতার জন্মদিনে গুরুদয়াল বাবুর বাড়ীতে ডাঃ বি. এম. মুখার্জী এবং জাগৃতি সংঘের সদস্য প্রকাশের সংলাপের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ ঘিরে কম্যুনিস্ট এবং কম্যুনিস্ট বিরোধী যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তার তীক্ষ্ণতা এবং বুদ্ধির মারপ্যাঁচ উদ্দেশ্যমুখী হলেও প্রশংসনীয়।

নায়িকা সিতা ছাড়া অন্যান্য চরিত্রচিত্রণ নিখুঁত হয়নি। নায়ক হিসাবে কখনো কখনো শিশির, কখনো কখনো অবনীনাথ গুরুত্ব পায়। অবনীনাথ কংগ্রেস সমর্থক। কম্যুনিস্টরা তার পিছে লাগে। তার স্ত্রীকে দলে টানতে, তাকে চাকরি হারা করতে কিংবা খুন করতে কম্যুনিস্টদের প্রচেষ্টা দেখানো হয়। অবনীনাথকে লেখক আদর্শবাদী হিসাবে আঁকেন। সে চোরাবাজার বর্জনের জন্য এক নীতি গ্রহণ করে, চোরাবাজার থেকে চাল না কিনা। সে নিজে উপাস থাকে, কিন্তু চোরাবাজার থেকে চাল কিনে না। তাকে লেখক কেন্দ্রীয় চরিত্রের গুরুত্ব দিতে চাইলেও, নায়কের গুণাবলী তার মধ্যে পাওয়া যায় না। সে তুলনায় শিশির চরিত্রে প্রথম দিকে আদর্শবাদী নায়কের গুণ পাওয়া যায়। শিশির প্রথম দিকে অবনী নাথের সংস্পর্শে গিয়ে কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী হয়। কিন্তু অকস্মাৎ উদ্দেশ্যহীন তার পরিবর্তন ঘটে। সে হঠাৎ তার সংগীত দিয়ে গণচেতনার দায়িত্ব ছেড়ে ফিরে আসে গ্রাম থেকে প্রাণ ভয়ে, সিতার এবং টাকার প্রতি আকস্মিক তার মোহ জন্ম নেয়। তার আদর্শনিষ্ঠা বিসর্জন দেয়। জাগৃতি সঙ্ঘে যোগ দেয়, সেখানে নীতিহীনতা দেখে আবার পূর্বের তেজী নায়কের ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়। তার এই পরিবর্তন এবং দুর্বলতা তাকে শক্তিশালী নায়কের আসন থেকে নামিয়ে দেয়।

উপন্যাসে সব চেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র সিতা, যার মধ্যে নায়িকার গুণ রয়েছে। সে হৃদয় দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয়েছে। উপন্যাসে যে টুকু রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়েছে সে সিতাকে কেন্দ্র করেই। সে অনুভূতি পরায়ণ, উদার আবেগময়ী, আবেদনময়ী। তার চরিত্রের দুর্বলতা অথবা দুর্ভাগ্য, জেদী শিশিরকে সে কখনো বশীভূত করতে পারেনি, পেরেছে দুর্বল, নীতিহারা শিশিরকে - যা তার জন্য হতাশাজনক।

কালীকিঙ্কর বাবুই একমাত্র উপন্যাসে শক্তিশালী খল চরিত্র। গুরুদয়াল বাবু কিংবা জয়ন্ত মজুমদারের কোন ব্যক্তিত্ব না থাকাতে চরিত্রগুলি দুর্বল মনে হয়। অরুণা, জ্যোৎস্না কিংবা ইন্দ্রনাথ চরিত্রের সৃষ্টি মনে হয়, উপন্যাসে কংগ্রেস চরিত্র বাড়াবার জন্য। এ চরিত্রগুলি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন -

> " কংগ্রেসকর্মী অবনীনাথ, অরুণা, জ্যোৎস্না ও কংগ্রেস মতে নূতন দীক্ষিত ইন্দ্রনাথ - ইহাদের কাহারও ব্যক্তিগত জীবন দলগত আবেষ্টন হইতে স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সক্ষম হয় নাই।" [৯]

তিলাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সমালোচক বলেছেন -

> " ... তার বর্ণনা দুর্ভিক্ষের করুণ রসকে প্রাধান্য দেয়নি, তীব্র শ্লেষের সঙ্গে একটা উৎকট বীভৎসতা ও অনুভূতির মাধ্যমে মানবজীবনের শোচনীয় অসামঞ্জস্যকেই প্রকট করে তুলেছে। তাই 'তিলাঞ্জলি' পাঠককে শোকাভিভূত করে না। গভীর একটা আত্মধিক্কারে বিষণ্ন করে তোলে।" [১০]

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'তিলাঞ্জলি' সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, ২৭ কার্তিক ১৩৫০ থেকে ২৩ বৈশাখ ১৩৫১ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ আকারে প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসাবে দেশ পত্রিকার সম্পাদক, সাগরময় ঘোষের নাম প্রকাশিত হয়।

২। ড· বিনতা রায়চৌধুরী,'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যালোক, কলকাতা ১৯৯৭, পৃ·১৪১।

৩। উত্তম ঘোষ : "সুবোধ ঘোষ বড় বিস্ময় জাগে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃ·৬৭।

৪। তদেব, পৃ·৫৬।

৫। বারিদবরণ চক্রবর্তী :'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য উচ্চ মানের গবেষণা গ্রন্থ', 'নন্দন' ৩৩ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, (নব পর্যায়ের সপ্তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা) কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ·৭৭।

৬। সমরেশ মজুমদার : 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর', রত্নাবলী, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ·৩১৬।

৭। তদেব, পৃ·৩১৮।

৮। ড· বিনতা রায়চৌধুরী : 'পূর্বোক্ত গ্রন্থ' পৃষ্ঠা ৪১।

৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা ১৯৭৩, পৃ·৬৫৬।

১০। সৌমেন্দ্রনাথ সরকার : 'সুবোধ ঘোষ ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শ্রাবণ-আশ্বিণ, কলকাতা ১৩৭৭, পৃ·১৯৬।

সর্বংসহা

সুবথনাথ ঘোষের (১৯০৯-৮৪) সর্বংসহা(১৯৪৪)[১] উপন্যাস ও এ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। উপন্যাসটির ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদের কয়েকটি পরিচ্ছেদে পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্র রয়েছে। এ উপন্যাসের মূল গল্প মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে গড়ে না উঠলেও লেখক আধুনিক নগর সভ্যতাকে ঘিরে নৈতিক অধঃপতন দেখাতে গিয়ে মন্বন্তরের যে বিষয় এনেছেন, তা বেশ বাস্তবনিষ্ঠ।

রাজ্যেশ্বর বাবু বিলেতি আদর্শে লালিত বাঙালী বুর্জোয়া। গ্রামীণ এবং সনাতন ধর্মের সভ্যতা আদর্শকে অবহেলা করে তিনি বিলাতী এবং নাগরিক সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন হন। গ্রাম এবং গ্রামের মানুষের প্রতি অনিহা দেখান। কিন্তু এক সময় রাজ্যেশ্বর বাবুর নাগরিক মোহ ভঙ্গ হয়। তার কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা তাকে আঘাত দিলে তিনি সচেতন হয়ে গ্রামীণ সভ্যতায় এসে আবার শান্তি খোঁজেন। যে 'এপিসোড'টিতে রাজ্যেশ্বর বাবুর নাগরিক সভ্যতায় বিশ্বাস ভঙ্গ দেখানো হয়েছে, একই 'থীম' তারা-শঙ্করের মন্বন্তর উপন্যাসেও দেখা যায়। উপন্যাসের নায়িকা নীলা বাবাকে না বলে বিদেশী সৈনিক স্টুয়ার্ড আর ম্যাকেঞ্জির সাথে ছবি দেখতে গেলে নীলার বাবা দেব-প্রসাদ মনে প্রচন্ড আঘাত নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের সভ্যতাকে আদর্শবান মনে করেন। এখানে সর্বংসহা উপন্যাসেও দেখা যায় - রাজ্যেশ্বরবাবু মেয়ে চেরীকে আধুনিকা করতে গিয়ে বুঝলেন, ভুল হয়ে গেছে। চেরী এক আমেরিকান মিলিটারী অফিসারের সাথে খোলামেলা মেলামেশা শুরু করলে, তার মা বাধা দেয়। আধুনিকা মেয়ে মাকে জানিয়ে দেয়, মা বিষয়টাকে ঈর্ষা করছেন। এ ব্যাপারে রাজ্যেশ্বর বাবু কোন ভূমিকা না নিলে, স্ত্রী রাগ করে রাজ্যেশ্বর বাবুকে ছেড়ে চলে যায়। মেয়েও এর সাথে সেনা বাহিনীর চাকরি নিয়ে রাজ্যেশ্বরবাবুকে ছেড়ে চলে যায়। অসহায় রাজ্যেশ্বর বাবুর তখন অবস্থা হয় নীলার বাবা দেবপ্রসাদের মতো। নগর সভ্যতায় তার বিতৃষ্ণা দানা বেধে ওঠে। বিনতা রায় চৌধুরী বলেছেন -

> "এখানে লেখক নগর সভ্যতার ও যন্ত্র সভ্যতার বিরোধী, কৃষি সভ্যতার সমর্থনকারী।" [২]

লেখক এখানে রাজ্যেশ্বর বাবুর বিপরীত একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এ চরিত্রটি

হচ্ছে রাজ্যেশ্বর বাবুর ভাই সর্বেশ্বর, সর্বেশ্বর গ্রামের ধারক, বাহক। সে আদর্শবান। মন্বন্তর শুরু হলে সর্বেশ্বর সমস্ত গ্রামটাকে সংকট থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব নেয় -। এ উপন্যাসের নায়ক কানাই একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এক সময় সে আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি নিয়ে দুঃখে কষ্টে চলে যাবার অবস্থায় ছিল। মন্বন্তরের সময় সে চাকরিটা হারায়। শিক্ষা তার বিবেককে সব সময় তাড়া দেয়। তার ঊর্ধ্বতন কর্তা ছিল একজন ইংরেজ। তার শাসন এবং অত্যাচার কানাই মেনে নিতে পারে নি, ফলে তাকে যুদ্ধাঞ্চল আসামে বদলি করা হলে, যুদ্ধের জন্য তার বাবা-মা তাকে সেখানে যেতে দেয় না। কানাইয়ের পরিবারের দুর্যোগ প্রসঙ্গ ধরে লেখক মন্বন্তরের বেশ কিছু চিত্র দেখান। যেমন চালের দাম বাড়ে তিন চার গুণ। কয়লা পাওয়া যায় না। কেরোসিন পাওয়া যায় না। চারিদিকে অভাব, ঔষুধ পাওয়া যায় না। আট দশ গুণ দাম দিয়ে যা পাওয়া যায় তাতেও ভেজাল। বাঙালী শিক্ষিত বেকারের দুর্দশা দেখাতে গিয়ে লেখক সমাজের সর্বস্তরের দুর্নীতির কথা বলেছেন। লেখক দেখান, ঘুষ, নৈতিক অধঃপতন, ভেজাল, মজুতদারী ব্যবসা এ সবের জয়-জয়কার। কানাইয়ের বিরাট সংসার। বৃদ্ধ মা-বাবা, অবিবাহিত ভগ্নি শিক্ষার্থী দুটি ভাই, দুটি নাবালক শিশু। যুদ্ধ শুরু হলে কানাইয়ের বাবা হারাধন বাবুর চাকরি চলে যায়। অসুখে তিনি মারা যান। মৃত্যুর কারণ চৌষট্টি টাকা দিয়ে যে ইনজেকশনটা দেয়া হয়েছিল তা ছিল নকল। সব কিছুতে ভেজাল। অনেক দাম দিয়ে বাজারে যে চাল পাওয়া যায়, সেখানে চার ভাগের এক ভাগ পাথর মেশানো। অনুমান করতে কষ্ট হয়না এ পাথর ইচ্ছা করে মেশানো। লেখক বলেন -
"চালের চেহারা দেখে পন্ডিত গৃহিনীর চোখে জল এসে পড়ল। কি অবস্থা তাদের ছিল আর এখন কি দাড়িয়েছে।" (সর্বংসহা, পৃ.১৫৬)।
চোখের জল আসার কথা, এই চালই আনতে হয়েছে দু'তিন ঘন্টা কন্ট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়ে। তাও সর্বোচ্চ-পাঁচ সের বরাদ্দ।

ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে বিমলের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখান যে, শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি, চিত্র পরিচালক, সকলে দায়িত্বহীন। এটাই একমাত্র উপন্যাস, যেখানে

মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে দেশের সৃজনশীল সকল শ্রেণীকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সুবিধাবাদী, অর্থলোভী, দায়িত্বজ্ঞানহীন করে। এ অভিযোগ কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করে না। বাস্তবে আমরা দেখি পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং মন্বন্তর ঘিরে মানুষের দুর্যোগকে নিয়ে শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি শাখা, এমনকি সব পত্রিকা ছিল সরব। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা এতো সৃষ্টি চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন যা ছিল আশাতীত, বিস্ময়কর। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত বিভাগ এ বিষয়গুলি ছিল বাংলা সাহিত্যের 'মাইল স্টোন'। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এমন কোন সৃজনশীল শাখা নেই, যা পঞ্চাশের মন্বন্তরকে উপেক্ষা করেছে। পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয় চিত্র পরিচালকরাও তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, একটু দেরীতে হলেও। তবে সব শিল্পী কি শিল্প আর বাস্তবতার সমঝদার ? বাণিজ্যিক চিত্র পরিচালক, বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা আর বাণিজ্যিক লেখকরা পঞ্চাশের মন্বন্তরকে বিষয় করবে কেন ? তারা তো সৃষ্টিশীল নয়, বিবেকহীন ব্যবসায়ীর মত মুনাফা শিকারী।

এ উপন্যাসে লেখক কানাই চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলের জীবন সংগ্রাম দেখিয়েছেন। কানাইকে বদলি করা হলে, মুখার্জি বলে যেখানে তাকে যেতে দেয় না মা বাবা, সে কানাইকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের চাকরি নিতে হয়।

উপন্যাসটির গল্প-রস শিথীল। শক্তি-শালী চরিত্রও কম, রাজ্যেশ্বর চরিত্রটিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

বিমল চরিত্রের অভিজ্ঞতা দিয়ে মেদিনীপুরের বন্যাজনিত দুর্গতির বর্ণনা পাওয়া যায়। বিমল মেদিনীপুরে শুধু যে প্রকৃতির আঘাত দেখেছে তা নয়। সে "মানুষকে জানোয়ারের কাজ করতে দেখেছে। মানুষ যে কতদূর অমানুষ হ'তে পারে তা সে নিজের চোখে দেখেছে"। (সর্বংসহা, পৃ-১৫৮-১৫৯)। সে দেখে সব খানে শিক্ষিত মানুষদের ভন্ডামি, সে তুলনায় অশিক্ষিত, গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলিই সৎ। ভদ্রবেশী শিক্ষিত রেলওয়ের টিকেট বিক্রেতা, গ্রামের নিঃস্ব চাষাদের ঠকায়। শুধু তাই নয়, লেখক দেখান, শহরের মানুষরা

অমানবিক। তাদের আচরণ দৃষ্টিকটু। চরম দুর্যোগের সময়ও শহরের স্কুল কলেজের ছেলেদের মুখে দিব্যি হাসি। সিনেমার গল্প করতে করতে তারা চলছে, কখনো মনের সুখে গান গাইছে, 'যদি ভাল না লাগে তো দিওনা মন'। ফলে শহর সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য শোনা যায় " দুভাগ্য বাংলাদেশের। এইখানে দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেরা থাকে।" (সর্বংসহা পৃ-১৬১)। তাই বিনতা রায়চৌধুরী বলেছেন -

> " ... মানুষ নগর সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কৃষি সভ্যতাকে অবহেলা করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত প্রগতিবাদী সেই সব শহুরে মানুষদের অন্তঃসারশূন্যতাই মন্বন্তরের কারণ। তাই এই উপন্যাসে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত শহর জীবনই চিত্রিত।" ৩

উল্লেখপঞ্জী :-

১। সর্বংসহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা থেকে। একই প্রকাশনী থেকে তৃতীয় মুদ্রণ হয় মাঘ, ১৩৬৭ সালে। এ গবেষণা পত্রে সেখান থেকে উদ্ধৃতি নেয়া হল।

২। ড. বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৯৭, পৃ.১৬০।

৩। তদেব।

চিন্তামণি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) 'চিন্তামণি'(১৯৪৬)[১] ক্ষুদ্র পরিসরে একটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। 'চিন্তামণি'র কাহিনী বিন্যাস গতানুগতিক কাহিনী বিন্যাসের বাইরে। সমালোচকের কাছে "লেখকের এই স্টাইলটি প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।" [২] শুধু এই উপন্যাসটি নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিটি উপন্যাসের ভাষা, বুদ্ধি - আর বাস্তবতার সংমিশ্রণ। মানিক উপন্যাসে যদি রোমান্স খোঁজেন, তাও বাস্তবতার উত্তরণ ঘটিয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন –

> "বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান এবং প্রথম পরিচয় এই যে তিনিই বাংলা কথাসাহিত্যে যথার্থ অর্থে বাস্তবতার প্রবর্তন করেন। যদিও একথা সত্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বেই কিছু কিছু লেখকের রচনায় বাস্তবতার সুর ধ্বনিত হতে আরম্ভ করেছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই শক্তিশালী লেখক ছিলেন। সমাজের বাস্তব চেহারার নির্মোকমুক্ত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে তাঁদের কোন দ্বিধা ছিল না, কিন্তু বাস্তব সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংকল্পে অবিচল, লক্ষ্যে নিশ্চিত এবং বক্তব্যে শাণিত ছিলেন, বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাববোধই তাঁকে সাহিত্যিক প্রতিভার রুদ্ধ দুয়ার খুলতে সাহায্য করেছিল।" [৩]

মানিকের সমসাময়িক কালের মন্বন্তরের ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে বাস্তবতার অভাববোধের কথাটি পুরোপুরি না খাটলেও একথা ঠিক যে, চরিত্র সৃষ্টির বাস্তবতায় মানিক তুলনাহীন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলি গল্প রয়েছে। 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণের পুদাম', 'নমুনা', 'তারপর', 'নেড়ি', 'অমানুষিক', 'প্রাণ,' 'আজকাল পরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়' প্রভৃতি গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিভিন্ন সমস্যা এবং যন্ত্রণাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দরদী মন দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। চোরা

কারবারী, মজুতদারী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিভিন্ন নারীর পণ্যে পরিণত হওয়া, বস্ত্র সংকট, সামাজিক অবক্ষয়, প্রভৃতি চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন গল্পে রূপদান করেছেন। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত এসব গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নারীর প্রতি বরাবরই সহানুভূতি পরায়ণ। চিন্তামণি উপন্যাসেও তারই প্রকাশ ঘটেছে। মন্বন্তরের আক্রান্ত কয়েকটি চরিত্রের ভাবের আদান প্রদান ও মনস্তাত্ত্বিক চেতনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাদের ব্যক্তি যন্ত্রণা ও সমাজবোধ। চিন্তামণিকে লেখা তার দিদির পত্র গুচ্ছের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় দুর্ভিক্ষকালীন তার দুঃসহ জীবনের অভিজ্ঞতা। চিন্তামণির দিদির দেয়া চিঠি, লেখকের বক্তব্য এবং চরিত্রগুলির সংলাপকে উপন্যাসের রূপে দাঁড় করালে তার যে কাহিনী দাড়ায় তা হচ্ছে – যুদ্ধ এবং যুদ্ধকে আশ্রয় করে মন্বন্তর শুরু হলে চিন্তামণি নিজের গ্রাম ত্যাগ করে মধুবনীতে আসে কাজের এবং বাঁচার আশায়। এসে পটলের সহযোগিতায় কাজ পায় হরমণি রাইসমিলের মালিক নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়িতে। বাবুর বাড়ির জন্য সে দুধ আনতে যায় গৌরাঙ্গের বাড়িতে। সেখানে গৌরাঙ্গের সাথে চিন্তামণির সম্পর্ক গড়ে। গোয়ালা গৌরাঙ্গ মাকে নিয়ে বসবাস করে। গৌর অর্থাৎ গৌরাঙ্গকে চাঁদ কাকা আলাদা করে দিয়েছে। কোন ঝগড়া ফ্যাসাদ নয়। কোন কারণ ছাড়া। আলাদা হয়ে বসবাস করবে বলে। চিন্তামণির সাথে গৌরের সম্পর্ক এগিয়ে যায়। চিন্তামণিকে গৌরের ভাল লাগে। তবে দাসীগিরি করে বলে বিয়ে করার পুরো সিদ্ধান্ত নিতে পারে, না। গৌর চিন্তামণির সাথে অভিসার করে লুকিয়ে। গৌরের এই মতিভ্রম গৌরের বুড়ী মা বুঝতে পারে। ছেলেকে প্রস্তাব দেয়, বিয়ে একটা করলেই পারে। গৌর বুঝতে পারে এ প্রস্তাব চিন্তামণির সাথে মাখামাখি না করার ইঙ্গিত। এমনি সময়ে রঘু পায়ে মন্বন্তর ঢুকে মধুবনিতে। ক্রমে তা প্রকট হতে থাকে। খাঁটি চাষী, ভূমিহীনচাষী প্রত্যেকের টানাপোড়ন শুরু হয়। মজুর হতে এ অঞ্চলের খাঁটি চাষী, মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষী পরের জমিতে মজুরগিরি করে, তবু চাষাবাদ ছাড়া আর কিছু করতে চায় না। কিন্তু নিরুপায়। ফলে সদয়, পচা, ছোলেমান, মৈনুদ্দিন, কয়েক টুকরো জমি চষে বটে, কিন্তু ফসল বোনার সময় ছাড়া কয়লার খনিতে কুলি খাটে। সাত কাঠা জমি জগুর। সে বাড়তি আয় রোজগার করে মুচিগিরি করে। সরোজ বাড়ুয্যে মুদীখানা খোলে। রঘু সামন্তের অবস্থা তুলনামূলকভাবে একটু স্বচ্ছল। রঘু সামন্তর সাথে গৌরের বন্ধুত্ব। রঘু সামন্ত'র থেকে গৌর চাল ধার নেয় কয়েক বার। মন্বন্তর চরমে পৌছলে

ঘুটাঘুটি সচ্ছল রঘু সামন্তও খাদ্যের টানাপোড়নে পড়ে। এ সময় গৌর তার কাছে চাল ধার চাইতে এলে সে স্বার্থপর হয়ে উঠে। আগের বন্ধুত্ব আর আগের পর্যায়ে থাকে না। গৌর গিয়েছিল আর কিছু চাল ধার চাইতে। রঘু উল্টা আগের ধার ফেরত চেয়ে বসে। রঘুসামন্ত'র ধারণা গৌরের সংসারে মাত্র দুজন লোক, অতএব তাদের খাদ্যসংকট কম। রঘু এমন ভাবে কথা বলে আগের বন্ধুত্ব-সম্পর্ক, ধাক্কা খায়। হতাশ গৌর ভাবে রঘুর উপর সে কতটুকু নির্ভরশীল ছিল। সচ্ছল অবস্থায় চিন্তামণিকে গৌর রূপার পৈঁছে দিয়েছিল ভালবেসে। মন্বন্তরে দিকবিদিক গৌর যায় চিন্তামণিকে দেয়া সে রূপার পৈঁছে ফেরত আনতে। ভাগ্য ভালই। চিন্তামণি এমনিতে অভিমান করে আছে গৌরের উপর। গৌর চিন্তামণির সাথে যোগাযোগ রাখে না বলে। চিন্তামণি আপনা থেকেই ফিরিয়ে দেয় রূপার পৈঁছে। গৌর কতটা অভাবে পড়েছে তার প্রতি পরোক্ষ অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন লেখক এই চিত্রের মধ্য দিয়ে। রূপোর পৈঁছে বিক্রি করে ক'দিন খায় ? ক'দিন পর গৌরের মা জানায়, ওবেলা হাঁড়ি চড়বে না। এর মধ্যে না খেয়ে মারা যায় গৌরের চাঁদকাকা। মারা যায় চাঁদ কাকার ছেলে এবং ছেলেবৌ। চাঁদ কাকার পরিবারের অবশিষ্ট বেঁচে থাকা একমাত্র পুঁটুকে মানবিক কারণে ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় গৌর। যদিও তার প্রচন্ড মোড় চাঁদকাকা আজীবন তাদের সাথে শত্রুতা করেছে। পুঁটুকে রেখে চাঁদ কাকার ঘরে যাওয়াটা গৌরের মনে হয় এখানেও একটা শত্রুতা করেছে চাঁদকাকা। তবু এই আকালে গৌর পুঁটুর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর। অভাব প্রকট হলে দেখা যায় - চাল পাওয়া যায় না, মিলের কাপড় পাওয়া যায় না, তেল নুন মসলার দোকানে আধলা ছিদামের বেচা বিক্রি বন্ধ। পেট ভরে লোকে খেতে পায় না। চিন্তামণির দিদি লেখে - না খেয়ে উপোস থাকার পর পোড়া পেটের জ্বালায় ব্যারাকে চাকরি নিয়েছে। সেখানে তার মতো আরো অনেক পোড়া কপালী বিঃ কারো সতীত্ব নাই এরূপ কান্ড। বয়স হয়েছে তবু চিন্তামণির দিদিকে টানাটানি করে। সে কোন মতে ধর্ম রেখেছে।

রঘুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে গৌরাঙ্গ দেখে জীবন্ত কংকালের মানুষ ও গরু ছাগল। ঘোষেদের কেলোকুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা

আর কালা চাঁদ-এর শূন্য ভিটে খাঁ খাঁ করছে। চারদিকের প্রাণহীন নিস্তব্ধতায় গৌরের নিজেকে এবার সত্যিকার একা লাগে। অসহায় লাগে। চিন্তামণির অভাব বোধ করে এবার গৌর। আজ তিন চার মাস চিন্তামণির সঙ্গে সে দেখা করেনি। ধীরে ধীরে সব হারিয়ে তার মন অসহায় হয়ে উঠে। দুর্ভিক্ষের কালো থাবা কেড়ে নেয় তার জমি জমা, ঘরদোয়ার, বাসনপত্র। লেখকের ভাষায় "তারপর গেল পুঁটু ও গৌরের মা।" (চিন্তামণি, পৃ·১২৩)।

চিন্তামণির সাথে গৌর সাক্ষাৎ করে। চিন্তামণি প্রস্তাব দেয় 'এখানে থেকে কেন শুকিয়ে মরবে ? তার চাইতে চল বড়নিছিরপুরে দিদির কাছে যাই। মস্ত কারখানা হয়েছে, তুমি কাজ করবে, আমি কাজ করব, এক রকম করে চালিয়ে নেব দুজনে মিলে। সেখায় তো জানা চেনা কেউ নেই তোমার, এক সাথে থাকতে ভয় পাবে না তুমি।' গৌর বলল 'ভয় ? কিসের ভয় ? এখানেই এক সাথে থাকছি এসো না আজ থেকে।"(চিন্তামণি, পৃ·১২৩)।

এতদিন গৌরের ভয় ছিল। সমাজ ছিল, মা ছিল, পারিবারিক অবস্থান ছিল। ফলে সে দাসী চিন্তামণির সাথে প্রেম করেছে লুকিয়ে। আজ গৌরের কিছু নেই —
"আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ি নেই, জমি জমা নেই, পেটের ভাত নেই। কাকে তার ভয়, কিসের তার লজ্জা'। (চিন্তামণি, পৃ·১২৩)।

সবস্ব হারিয়ে চিন্তামণির সাথে গৌরের আর পার্থক্য থাকে না। দুজনে নেমে আসে একই সারিতে। মিলিত সংগ্রাম করে যদি এই আকালে বাঁচা যায় - এই হচ্ছে চিন্তামণির কাহিনী। অন্য দিকে চিন্তামণির মতো অর্থসংকটের ফলে তার দিদি হরমণিও দাসীতে পরিণত। বড়নিছিরপুরে ভূষণ বাবুর বাড়িতে সে অনেক কষ্টে যন্ত্রণা কাতর মন নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। চিন্তামণিকে চিঠিতে লিখে, সে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করছে, তার খাওয়া চলে না।

চিন্তামণির প্রতি তার অধিকার দাবী স্বার্থপরতার পর্যায়ে পৌঁছে। বার বার সে টাকা দাবী করে। তবু চিন্তামণির প্রতি তার মমতা অপরিসীম বলে সে চিঠিতে

ব্যক্ত করে। সে চিন্তামণিকে লিখে "এই দুর্দিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের ক্ষুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুঃখ আমারই অন্তরে জানে। আমি কি হুঁসে আছি তাহা ভগবানই জানে।"(চিন্তামণি, পৃ·১৫)।

চিন্তামণির দিদিও শ্বশুর বাড়িতে সুখে নেই। কারণ অভাব - অনটন দুর্ভিক্ষ মানুষকে স্বার্থপর করে তুলেছে। চিন্তামণির দিদির জমিটুকু ভাশুর জোর করে দখল করে নেয়। আপন দাদা আংটি চায়। আংটি আগেই বন্ধক রাখা হয়েছে। আংটি না পেয়ে দাদা রাগ করে। বাঁচার প্রতিযোগিতা। সবাই উগ্র স্বার্থ-বাদী হয়ে উঠে। অথচ দুর্ভিক্ষ না হলে এ চিত্র অন্যরকম হতো। নিজে না খেয়ে আপন জনদের খাওয়াত। পল গ্রীনো'র দুর্ভিক্ষতত্ত্ব, অন্নদাতাদের পোষ্যদের ত্যাগ এখানে ভেসে উঠেছে।

চিন্তামণি উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন কারণ খণ্ড খণ্ড ভাবে এসেছে। যুদ্ধ তার প্রধান কারণ, দুর্ভিক্ষের মূল কারণ নির্ণয়ে এখানে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ স্বচ্ছ। এছাড়া এসেছে অন্যান্য কারণের মধ্যে নোনা জলে বানে ফসলের ক্ষতি, চাষ ছাড়া অন্য পেশার প্রতি চাষীদের হীনমন্যতা ইত্যাদি। উপন্যাসে দেখা যায় অভাবের সাথে সাথে সামাজিক অবক্ষয়, সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভাঙন ইত্যাদি। হেমীর জামাই শ্বাশুড়ীকে যে পুরাণী শাড়িখানা দেয়, তা গামছার মতো। হেমীর কাকী চাঁপাবালা হেমীকে রাখতে অপারগতা জানায়। চাঁপাবালাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, সোনার গহনা ইত্যাদি চুরি করাতে।

চিন্তামণি'তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ চমৎকার। চিন্তামণি চরিত্রটি অনেকটা প্রবৃত্তি তাড়িত। জীবনকে সে বাস্তবতা দিয়ে উপভোগ করতে চায়। বলতে গেলে চিন্তামণি নিজের চেষ্টায় গৌরাঙ্গকে আপন করেছে। সে দুর্ভিক্ষের সময়ে, বাঁচার জন্য যেখানে সবাই সংগ্রাম করছে, চিন্তামণি সেখানেও তার প্রেমবোধটাকে জিয়ে রাখে। চিন্তামণির সাথে মানিকের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র অসাধারণ চরিত্র

কপিলার বেশ মিল রয়েছে। দুজনই হাসিখুশী। চঞ্চলা, বাগপটু প্রাণ চঞ্চলা। কুবেরের মতো গৌরকে পেয়ে মাথায় চিন্তামণি। এ দুটো চরিত্রের সমিল চরিত্র 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের কাপালীবৌ। মনুন্তর, অভাব যাদেরকে হার মানাতে পারে না। মনুন্তর এর উপন্যাসকে গভীরতা দান করেছে এ চরিত্রগুলি। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের সাথে 'চিন্তামণি' উপন্যাসের আর একটা মিল দুটো উপন্যাসের চরিত্রগুলিই শ্রম-নির্ভর ক্ষুধার্ত নর-নারীর কাহিনী। অর্থনৈতিক সংকটের শিকার মানুষের রোমাঞ্চ জীবন এবং এ দুয়ের টানাপোড়েন এ দুটি উপন্যাসের বিষয়। কুবের মাঝির দুঃসাহসিক জীবনের চিত্রের পাশে তেমনি সরব তার সংসারের দারিদ্র্যময় চিত্র। একই ভাবে দুর্ভিক্ষ কবলিত লন্ড-ভন্ড গৌরের সংসার থেকে প্রাণ গজায় চিন্তামণিকে নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন।

উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাসে মানিক একজন মানবতাবাদী লেখক। মানিকের প্রায় উপন্যাসকে ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসীয় তত্ত্বে আবদ্ধ উপন্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও মূলতঃ মানিকের মূল দুর্বলতা সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি। ক্ষুদ্র উপন্যাস 'চিন্তামণি'তেও তার বলিষ্ঠ উত্তরণ ঘটেছে। বিক্ষিপ্ত কিছু চরিত্র, কুচক্রী - মানুষের সৃষ্ট যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ক্রমানুয়ে বাঁচার জন্য দিক-বিদিক আশ্রয় খোঁজে। সে দুর্যোগে বেঁচে থাকার - আশাবাদ এ উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। এ উপন্যাসের দুর্বল দিক মজুতদার, দুর্ভিক্ষের হোতা, তাদের কর্মকলাপ এবং মৃত্যুর প্রকটতা নিপুণ চিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত নয়। চিন্তামণি, চিন্তামণির দিদি, গৌরাঙ্গ নীলকন্ঠ ঘোষাল, রঘু সামন্ত, চাঁপাবালা, হৈম প্রভৃতি চরিত্র এতো ক্ষুদ্র পরিসরে চিত্রিত যাতে তাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ধরা পড়ে না। এ উপন্যাসে দেখা যায়, মানিক জীবনের প্রথম দিকে ফ্রয়েডীয় এবং শেষের দিকে মার্কসীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, এখানে তাঁর এ দু'আদর্শের অনুরঞ্জন ঘটেছে। সমস্ত দুর্ভিক্ষকে মানিক অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে অন্যান্য ঔপন্যাসিকের সাথে মানিকের স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। মানিকের পরিচয় একজন সমাজ সচেতন লেখক। সমাজের সমস্ত অনিয়মকে মানিক কথার ছলে তীর্যক ভাবে উপস্থাপন করতে সিদ্ধ হস্ত।

চিন্তামনির দিদির চিঠির মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার আর্থিক ও নৈতিক সংকটের পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বাণী প্রণিধানযোগ্য -

> "যুদ্ধ বিধ্বস্ত শোষিত গ্রাম জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় লব্ধ অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলার জন্য গ্রামের মানুষের নানাবিধ সমস্যা বর্ণনায় লেখক মাঝে মাঝে যেন শ্লেষাত্মক ব্যাঙ্গে গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকেই ধিক্কার জানিয়েছেন।" [৪]

লোকে বলাবলি করে চিন্তামণির স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। সমালোচকের মন্তব্য -

> "সর্বহারা দুটি মানুষের মিলনেতো জাত কুলের ভেদ থাকতে পারে না। দুজনেই খেটে খায় আবার প্রয়োজনে দুজনেই এক সঙ্গে মিলিত হয়। শ্রমিক চেতনায় উত্তরণের মধ্যেই উপন্যাসের শেষ।" [৫]

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় চিন্তামণি বড় নিছিরপুরে কারখানায় কাজ করার জন্য রওনা হয়। গৌর আর সে দুজনে মিলে কারখানায় কাজ করবে। যুদ্ধের চাহিদা এবং দুর্ভিক্ষের বাজার পাল্টে দেয় তাদের বিত্ত। গোয়ালা-কৃষক গৌর এবং গৃহস্থা মেয়ে চিন্তামণি কারখানায় মজুরি করতে নিয়োজিত হয়। গৌরকে কেন্দ্র করে ঘর বাধার স্বপ্নে চিন্তামণি শেষ পর্যন্ত সফল হয়। 'চিন্তামণি' উপন্যাস হিসাবে কেন সার্থক তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন চিন্তামণি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি -

> "পৃথিবীজোড়া আর্থনৈতিক সংকট ও মহাযুদ্ধ কীভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনের মূল্যবোধ ও সম্পর্ককে বদলে দেয়, তার নির্মম কাহিনী এই ছোট উপন্যাসটি। সমাজের পরিবর্তন তার আর্থনীতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল : এই তত্ত্বটির শিল্প রূপায়ণ 'চিন্তামণি'। একারণেই 'চিন্তামণি' সার্থক উপন্যাস।" [৬]

একজন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিশ্লেষণ করেছেন মানিক। 'চিন্তামণি' তার উজ্জ্বল নিদর্শন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

"যে সর্বনাশা যুদ্ধ আমাদের সমূহ অশান্তি ও সর্বনাশ ঘটিয়েছিল, সমাজের ভিত্তিমূল ধ্বসিয়ে দিয়েছিল, মানুষকে করেছিল অমানুষ, তারই পটভূমিতে মানিক এখানে ব্যক্তি-জীবনের জটিলতাকে দেখিয়েছেন। লিবিডো নয়, আর্থনীতিক বৈষম্য ও বিপর্যয় আমাদের জীবনকে বিচলিত ও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, এই চেতনায় মানিক এখানে উদ্বুদ্ধ।" [৭]

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চিন্তামণি' শুরু থেকেই উপেক্ষিত হয়ে আসছে। কেন উপেক্ষিত তার স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া ভার।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'চিন্তামণি' প্রথম প্রকাশিত হয় বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা থেকে ১৯৪৬ সনে। গ্রন্থ প্রকাশ, কলকাতা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি উপন্যাস' নামে যে সংকলন প্রকাশ করে সেখানে 'চিন্তামণি' স্থান পায়। এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৯১ সনে। সে সংস্করণ থেকে এখানে উদ্ধৃতি নেয়া হল।

২। ড· বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্য লোক, কলকাতা, মাঘ ১৪০৩ পৃ·১৪৬।

৩। অরুণকুমার ভট্টাচার্য : 'আঞ্চলিকতা ও বাংলা উপন্যাস', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৪, পৃ·৬৬।

৪। নিতাই বসু : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা', দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ·১৬২।

৫। ডঃ সরোজমোহন মিত্র : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ·২৫৮।

৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল - ১৯৯১। বৈশাখ ১৩৯৮, পৃ·৮১।

৭। তদেব, পৃ·৮১।

কালো ঘোড়া

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২) 'কালোঘোড়া'(১৩৫২ বাংলা)[১] পঞ্চাশের মন্বন্তরের একমাত্র উপন্যাস যেখানে একজন কালো বাজারীকে উপন্যাসের নায়ক করা হয়েছে। মন্বন্তরের পরপরই (১৩৫২ সনের) পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে অন্ন সংকটের কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর গল্প 'আগুন'। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং চোরাবাজার মন্বন্তর সৃষ্টি করলে ধানের আকাশচুম্বী মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতায় বাইরে যায়, মন্বন্তর পীড়িত গ্রামের এ অবস্থা দেখানো হয়েছে 'আগুন' গল্পে। মন্বন্তরের বিভিন্ন চিত্র বর্ণনায় সরোজকুমার 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', 'আগুন', 'ছন্নছাড়া', 'ক্ষুধা' প্রভৃতি গল্পে যতটা সাবলীল গল্পকার, উপন্যাস 'কালো ঘোড়া'য় ততোটা সার্থক নন। তবে এ উপন্যাসটির মূল কাহিনী মন্বন্তর না হলেও প্রধান চরিত্র শ্রীমন্ত যে কোন প্রকারে ধনী হওয়ার যে সাধনায় নেমেছে, তার ভাগ্যে সহযোগী হয়ে কাজ করেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। এছাড়া মন্বন্তর-সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় এ উপন্যাস রচিত। যুদ্ধ, মন্বন্তর এবং ঋণাধপতিত জমিদার বসু পরিবারের ভাঙনকে বেয়ে একজন স্বার্থপরের অর্থ-নৈতিক উত্থান 'কালোঘোড়া' উপন্যাসের কাহিনী। পঁচিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসের দুটিনটি পরিচ্ছেদে মন্বন্তরের পরিবেশ বর্ণনা করা হয়। তবে সচেতন ভাবে লেখক এ দুটিনটি পরিচ্ছেদে মন্বন্তরের কারণ দেখাতে - যুদ্ধ, মজুতদারী, মানুষের অবৈধ অর্থ লিপ্সা এবং দুর্নীতিভরা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সচেতন লেখক বর্ণনা করেছেন ডিনায়েল পলিসি'র নৌকা পোড়ানো এবং সাইকেল আটক নীতির। সবচেয়ে চরম কথাটি বলেছেন লেখক, মন্বন্তরের বর্ণনার শুরুতে। "দুর্ভিক্ষ যে আসন্ন এ কথা গর্ভনমেণ্ট ছাড়া সবাই বুঝেছিল, নৌকা-সাইকেল তো গেছেই, চালও যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ... চালের দর হু হু করে বেড়ে চলে। গর্ভনমেণ্ট ভরসা দেন, ও কিছু নয়, ইনফ্লেশন। মানুষের টাকা সস্তা হয়েছে"(কালোঘোড়া, পৃ.৭২)। "চাল পাওয়া যায় না' গবর্ণমেণ্ট বললেন, চোরা বাজার। হুমকি দিলেন, তিন দিনের মধ্যে সব চোরাবাজারীকে সায়েস্তা করে দেওয়া যাবে। তাহলেই আর চালের অভাব থাকবে না। ফাঁকা ভরসায় পেট মানে না।" (কালোঘোড়া, পৃ.৭২-৭৩)।

মন্বন্তর কেন্দ্রিক একটি মহৎ উপন্যাস হওয়ার উপাদান 'কালো ঘোড়া,' উপন্যাসের ছিল, কিন্তু লেখকের অভীষ্ট তা না হওয়াতে উপন্যাসের কালপ্রবাহে গতানুগতিক কাহিনী হিসাবে মন্বন্তরটা এসেছে। তবু এটাকে মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাসের তালিকায় রাখার প্রসঙ্গে ড· বিনতা রায়চৌধুরী বলেছেন -

> "যদিও উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র সমূহ মন্বন্তর সর্বস্ব নয়,
> তথাপি উপন্যাসটিতে মন্বন্তর প্রসঙ্গের অস্তিত্ব হেতু মন্বন্তর
> আশ্রয়ী উপন্যাস তালিকায় এটি অর্ন্তভুক্তি হওয়ার দাবী রাখে।"[২]

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীমন্ত ধনী হওয়ার জন্য স্বার্থপর একটি লক্ষ্য সামনে রেখে এগুতে থাকে। কলকাতার শোভা বাজারের অভিজাত বসু পরিবারে আশ্রিত হয়ে বড় হয়েছে পরিচয়হীন শ্রীমন্ত। কখন এবং কেন 'যে কোন প্রকারে ধনী হওয়ার বদ্ধ কামনা' তার মনে গেঁথে বসেছে তা উপন্যাসে স্পষ্ট নয়, তবে তার জন্য সে যে কোন হীন কাজকে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করতে পারে তা উপন্যাসে চিত্রিত। বসু পরিবারের কর্তা বড় বাবু হিমাংশু বাবুর ছোট কন্যা রূপসী হৈমন্তী কেন জানি অনুরক্ত ছিল এই পালিত শ্রীমন্তর প্রতি। উদ্দেশ্যবাদী শ্রীমন্তর হৈমন্তীর সাথে যে সম্পর্ক রাখে তা বিয়ের উদ্দেশ্যে নয়। তাই হৈমন্তীর বিয়ের সময় সে নীরব থাকে। হৈমন্তী একদিন রাত দুপুরে অলঙ্কার সজ্জিত হয়ে শ্রীমন্তর আকর্ষণ কাড়তে ব্যর্থ হয়েছিল। বিয়ের আগে হৈমন্তী শেষ বুঝাপড়া করার জন্য শ্রীমন্তকে বলে, তোমার জিনিস অন্যে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এর জন্য কোন দুঃখ, কোন ক্ষোভ নেই তোমার ? শ্রীমন্তর তখন অনুভূতি শূন্য। এর পর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এরপর মন্বন্তর। এ সুযোগে বড় লোক হওয়ার সহজ কৌশলটি লাভ করে শ্রীমন্তর। বড় বাবুর বিশেষ লোক মহেন্দ্রের অনুগ্রহে তিন খানা কন্ট্রোলের দোকান বেনামীতে নিয়ে নেয় শ্রীমন্তর। সে কন্ট্রোলের দোকানে শুরু করে চোরা কারবার। ক্ষুধার্ত মানুষ চল্লিশ-পঞ্চাশ—ষাট টাকা মণ দিয়ে সেখান থেকে চাল কিনে নেয়। তার টাকা আয়, আয়ের কৌশল এবং উদ্দেশ্য আরো বীভৎস। লেখকের ভাষায় - 'হৃদয় বৃত্তির চর্চা করার সময় তার নেই। জীবনের গতি পথে কালোঘোড়ার মতো সে ছুটে চলেছে আপন লক্ষের দিকে। তার ভাগ্য দেবতাই জানে, সেখানে তার জন্যে কি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে - অভিশাপ না আশীর্বাদ। যা-ই থাক সে-ই তার একান্ত লক্ষ্য। এ পথে হৃদয়ের কোন স্থান নেই।

মানুষের মূল্য তার কাছে প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়"।(কালোঘোড়া, পৃ-৬৭)।
শ্রীমন্তরের কন্ট্রোলের দোকানে যা চাল আসে, তার অর্ধেক কখনো বা বার আনা চড়া দামে চলে যায় চোরাবাজারে। সেখান থেকে আরো চড়া দামে যায় ক্ষুধিত নাগরিকের রান্নাঘরে। বাকি সামান্য সারি বন্দী লোকদের বিক্রি করা হয়। মুষ্টিমেয় কিছু লোক পায়। বাকিরা ফিরে যায় হতাশ হয়ে। এভাবে "শ্রীমন্তের ব্যাংকের অঙ্ক দিন দিন স্ফীত হয়ে ওঠে।
আর সে কী চাল।
মাত্র দুর্ভিক্ষের দিনে বিচারবিহীন জঠরাগ্নিই সেই কদন্ন গ্রহণ করতে পারে।
দুটো বৎসর আগে যে চাল ভিক্ষুকে ভিক্ষা নিতেও সম্মত হত না, তাই কিনছে লোকে চতুর্গুণ মূল্য দিয়ে, ক্লেশ স্বীকার করে, না পেলে তার ক্ষোভের আর সীমা থাকে না। যেন কত পরম পদার্থ।" (কালোঘোড়া, পৃ-৭৪)।

প্রথমে দেখা যায় বাজারে চাল, চিনি, নুন, কয়লা সব দুর্লভ হয়ে উঠে। এর কিছুদিন পর মন্বন্তর ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পথে পথে পড়ে থাকে দুর্গতদের দেহ। প্রথম প্রথম পথচারীরা চমকে উঠতো। আস্তে আস্তে তা সয়ে এল। 'দেবধামের' বড় কর্তা হিমাংশু ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়। ঋণ যত বাড়ছে তার সাথে মদ্যপানও তত বাড়তে থাকে। দুর্ভিক্ষে যখন মানুষ মরছে পথে ঘাটে, তখন বড় বাবুর উপলব্ধি "দুর্ভিক্ষ কি তাহলে সত্যিই আরম্ভ হয়েছে ? আমি ভাবছিলাম খবরের কাগজের কারসাজি।" (কালোঘোড়া, পৃ-৮০) ।
এরপর হিমাংশ বাবুর জমিদারি নোয়াখালির মহালটা বিক্রি করতে হয়। নায়েব গোমস্তারা বড় বাবুর কনিষ্ঠ ছেলে শংকরকে বলে - বড় বাবু যেভাবে চলছেন, তাতে বিষয় সম্পত্তি উড়ে যেতে বেশী দিন লাগবে না। শংকরের বয়স অল্প, বোঝার বয়স তার হয়নি, তবু বোঝার চেষ্টা করে। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের নায়ক কানাইয়ের মতো সেও ভাবে এই বৃহৎ বাড়ি - এর পরিনাম কি ? অবশেষে বখাটে ছেলেদের সাথে আন্দোলনে নেমে পড়ে শংকর, ডাক বক্স জ্বালাতে গিয়ে পুলিশের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে। যে শংকর ঘর থেকে বেরই হতো না, সে এখন আর ঘরেই থাকে না। কোথায় কোথায় থাকে, কি করে, তার আচরণ নিয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ বড় কর্তা।

শংকরের দেশপ্রেম 'সংশপ্তক' উপন্যাসের জাহেদ, 'মনুন্তর' উপন্যাসের নেপী প্রভৃতি তরুণ বিদ্রোহী যুবকের কথা স্মরণ করায়। এরা দেশের এবং মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলনে নেমে নিজের সুখ সুপ্ত এবং পরিবারের কথা বিস্মৃত হয়। 'দেবধাম' অবশেষে বিক্রি হওয়ার দিকে যায়। শ্রীমন্তর কূট তৎপরতায় মদ্যাসক্ত হিমাংশুবাবু 'দেবধাম' শ্রীমন্তর কাছে বিক্রি করে দেয়। সুন্দরী হৈমন্তী প্রসব বেদনায় এবং মৃত বাচ্চা প্রসব করে অস্ত্রোপাচারে যখন মৃত্যুর সাথে লড়ছে তখন 'দেব ধাম' কিনতে এবং বেচতে ব্যস্ত শ্রীমন্তর এবং হিমাংশু বাবু। হৈমন্তীহীন 'দেবধাম' আত্মাহীন দেবধামের কথা স্মরণ করায় শ্রীমন্তের মনে। তার চেতনায় প্রথম উপলব্ধি হয় যে নেশা তাকে পেয়ে বসেছে তার শেষ কী ? 'দেবধামে'র প্রতি তার আকর্ষণের কারণ স্পষ্ট হয় এখানে। সমালোচকের ভাষায় -

> "শ্রীমন্ত চোরা বাজারের সহায়তায় নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে। 'দেবধাম' -এ লালিত পালিত হলেও তার মনের গভীরে এক ধরণের প্রতিহিংসা জাগরূক ছিল। অপরের অন্নে প্রতিপালিত হওয়ার মধ্যে এক ধরণের গ্লানি বোধ থাকে। সেই গ্লানিই তাকে 'দেবধাম' কিনে নিতে এবং 'দেবধাম' এর মালিক হতে প্ররোচিত করে। শেষ পর্যন্ত হিমাংশু পরিবারের দারিদ্রের সুযোগে শ্রীমন্ত হিমাংশু বাবুর কাছ থেকে 'দেবধাম' কিনে নেয়।" ৩

ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনভাবে সমালোচনা করেছেন সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের। যেগুলি মনুন্তর প্রতিষ্ঠা হতে সহায়তা করেছে। যেমন "বন্টন নীতি। বাংলায় তখন অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নৌকা পোড়ানো এবং সাইকেল আটক চলছে। ... শুধু যান-বাহন নয়, খাদ্যের সম্বন্ধেও সতর্কতার অন্ত নেই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব চাল'ও পূর্ব বাংলা থেকে সরানো হোল, ফলাফল চিন্তা না করে।"(কালোঘোড়া, পৃ.৪১)। কিংবা "পুলিশ হেঁসেলের কোণ থেকে রিভালবার বা'র করে, কলেজের ছেলের পকেট থেকে বা'র করে অননুমোদিত ইস্তাহার। কিন্তু হাজার হাজার বস্তা চাল কোন গুদামে লুকানো আছে কিছুতেই তার কিনারা করতে পারলে না।" (কালোঘোড়া, পৃ.৭৪)।

না পারার কারণও লেখক প্রকাশ করেছেন আবার শ্রীমন্তর মুখ দিয়েই' -
"দুর্নীতি কতদূর প্রবেশ করেছে বুঝতে পারছ ? সমাজের একেবারে মেরুদণ্ডে। এর পরে যুদ্ধ একদিন থামবে, ব্লাকমার্কেটও হয়তো বন্ধ হবে। কিন্তু এই যে দুর্নীতির যক্ষ্মা - এ সহজে সারছে না।"(কালোঘোড়া, পৃ•৭৮)। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ১৩৫২ সনের এ উক্তি• আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। এখানে লেখকের সমাজ সচেতনতা আমাদের দৃষ্টি কাড়ে।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'কালোঘোড়া' উপন্যাসটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৩৫২ সনের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৫৩ সনে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স থেকে। পরবর্তীকালে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬১ সনে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং কোঃ লিঃ থেকে। এ গবেষণা পত্রে উদ্ধৃত করা হল এ সংস্করণ থেকে।

২। ড· বিনতা রায়চৌধুরী : পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, মাঘ ১৪০৩, পৃ·১৪৪।

৩। তদেব, পৃ·১৪৬।

অশনি সংকেত

'অশনি সংকেত'(১৯৫৯)[১] উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে যখন গঙ্গাচরণ সপরিবারে বাসুদেবপুর থেকে নতুন গাঁ কাপালী পাড়ায় বসত বাড়ী গড়ে। বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৫০) তাঁর অন্য উপন্যাসগুলোর মত 'অশনি সংকেত'ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচনা করেন। মন্বন্তরের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'অশনি সংকেত' ব্যতিক্রম। অন্য উপন্যাসগুলির সাথে অশনি সংকেতের বড় একটা পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হচ্ছে — উপন্যাসটিতে গঙ্গাচরণ ও তার স্ত্রী অনঙ্গবৌ প্রধান চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক নায়িকা নয়, কারণ স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে নায়ক নায়িকা সুলভ সম্পর্ক নেই। তাদের মধ্যে নেই রোমান্স, নেই ঘাত প্রতিঘাত। যত সংঘাত সব খাদ্যকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গবৌয়ের কমেডি নেই, সংঘাত নেই, ট্র্যাজেডি নেই, শুধু আছে নির্মম বাস্তবতা। অনঙ্গবৌ-এর বাপের বাড়ী ছিল ছুতোর গ্রামে, আর গঙ্গাচরণের বাড়ী ছিল হরিহরপুরে। সেখানেই প্রথম সংসার পাতে তারা। জ্ঞাতিরা নানা রকম শত্রুতা করায় বাঁচার সন্ধানে তারা দেশত্যাগ করে। আসে ভাতছানা গ্রামে। আহার্যের আশায়। কিন্তু দুই বছর পরও ধানি-জমির কোন ব্যবস্থা হয়ে না উঠায় এক বেলা খাওয়া হয় তো অন্য বেলা খাওয়া হয় না। আহার্যের টানা হেঁচড়ায় তারা যায় বাসুদেবপুরে। সেখানে অনঙ্গবৌ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় আবার স্থান ত্যাগ। আসে নতুন গাঁয়ে। কাপালী পাড়ায়। গঙ্গাচরণ ছিল পন্ডিত এবং এ নতুন গাঁয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। অন্য সবাই কাপালী ও গোয়ালা। তাই এ গ্রামে গঙ্গাচরণের অনেক সম্মান। গঙ্গাচরণ গ্রামে নতুন পাঠশালা খোলে এবং প্রতিপত্তি গড়ে তোলে। যখন যা প্রয়োজন গাঁয়ে যার কাছে চায় তার কাছ থেকে পেয়ে যায়। তাই বলতে গেলে তাদের কোন অভাব নেই এই নতুন গাঁয়ে। অনঙ্গ বৌয়ের কথায় বোঝা যায়, অনঙ্গ বলে -

" - এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও আর যেও না।

যদ্দিন চলা চলতির সুবিধে থাকে থাকবো বৈকি।" (অশনি সংকেত, পৃ-১০)।

গঙ্গাচরণ শুধু পাঠশালায় ছেলে পড়ায় না, মাঝে মাঝে লোকের চিকিৎসা করে, পূজা-আর্চা করে। এত কিছু করলেও তার চাহিদা কিন্তু সামান্য। গাঁ বন্ধের

জন্য কি কি লাগবে তা জিজ্ঞাসা করলে গঙ্গাচরণ অনঙ্গবৌয়ের সাথে পরামর্শ করে জেনে নেয় তার কি কি প্রয়োজন। অনঙ্গ বৌ তার সচ্ছলতার জন্য বেশী কিছু চায় না, চায় খাদ্য ও তিন খানা শাড়ি। যার মূল্য ত্রিশ টাকা। লোকটা মনে করেছিল আরও বেশী চাইবে। কিন্তু গঙ্গাচরণের উচ্চাশার সীমা পৌঁছে গিয়েছে। ভাত ছালাতেও যাকে স্ত্রী পুত্র সহ দিনে রাত্রে একবার মাত্র আহার করতে হয়েছে, সে এর বেশী চাইতে পারে কি করে ? এ থেকে বুঝা যায় গঙ্গাচরণ তার পরিবারকে একটু ভাল আহার্য দিতে পারলেই সন্তুষ্ট। এর বেশী সে আশা করে না।

কামদেবপুরে গঙ্গাচরণ প্রথম শুনে চালের দাম মণে দুটাকা চড়া আশ্চর্য নয়। দেখতে দেখতে চালের দাম বেড়ে যায়। এর মধ্যে কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত একদিন এসে গঙ্গাচরণের বাড়ীতে উপস্থিত। দুর্গা পণ্ডিতকে ঘরে আট ন'টি লোকের দুবেলার আহার যোগাতে হয়। চালের দাম যদি মণ দশ টাকা হয়, তাহলে কি করে সে এই খরচ চালাবে, শুনছে চালের দাম নাকি আরো বাড়বে, তখন কি করবে ? এই পরামর্শ নিতে সে গঙ্গাচরণের কাছে এসেছে। গঙ্গাচরণও জানে না, দেশে কেন এই অবস্থা। সব জিনিসের দাম কেন দিন দিন এভাবে বেড়ে যাচ্ছে। গঙ্গাচরণ যুদ্ধের সম্পর্কে জানে না। শুধু জানে জাপানিরা সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্ম দেশ দখল করে নিয়েছে, যেখান থেকে রেঙ্গুন চাল আসে। গঙ্গাচরণ জানে না রেঙ্গুন বা ব্রহ্মদেশ, পূর্ব বা দক্ষিণ কোন জায়গায়। হীরু কাপালী বলে, এবার যে রকম দেখছি, নাখেয়ে লোক মরবে। কথাটি গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হয় না। "না খেয়ে আবার লোক মরে ? কখনো দেখা যায়নি না খেয়ে লোক মরেছে। জুটে যায়ই কোনো না কোনো উপায়ে, দেশে এত খাবার জিনিস, সে দেশের লোক না খেয়ে মরবে ?" (অশনি সংকেত, পৃ.৪৭)।

কিছুদিন পর গঙ্গাচরণ নরহরিপুরের হাটে গেল চালের সন্ধানে। গঙ্গাচরণ অবাক হয়ে দেখে এত বড় চালের হাটে মাত্র তিন কাঠা চাল আছে। দাম মণ চব্বিশ টাকা। সর্বনাশ। চারদিকে অন্ধকার দেখে গঙ্গাচরণ। মানুষ এবার কি সত্যিই না খেয়ে মরবে ? কিসের কুলক্ষণ এসব ? গঙ্গাচরণ এক সময় ভাবে আটা ময়দা খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করবে। কিন্তু হাটে গিয়ে দেখে আরও উপায় নেই, বস্তাপচা আটা আছে দু'এক দোকানে, তাও আবার বারো আনা সের। কে খাবে ? এর মধ্যে

যে তিন কাঠা চাল কিনল, তা নিয়ে আসার পথে সনাতন ঘোষের সাথে দেখা, সনাতন ঘোষ পঞ্চাচরণের হাতের পুটলিটা নিজের হাতে নিয়ে বলে, আমায় অর্ধেকটা চাল দিয়ে যান, দুই দিন না খেয়ে আছে সবাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক কাঠা চাল দিতে পঞ্চাচরণ রাজি হয়। সনাতন ঘোষের অবস্থা খারাপ নয়। বাড়ীতে অনেকগুলো গরু। দুধ থেকে ছানা কাটিয়ে নরহরিপুরের ময়রার দোকানে যোগান দেয়। আজ তার এই অবস্থা।

কাপালী পাড়ার সবচেয়ে সচ্ছল পরিবারটি হচ্ছে বিশ্বাস মশায়ের পরিবার। একমাত্র যার কাছে মজুত ধান চাল আছে। কাপালী পাড়ার লোকেরা একবার সবাই মিলে বিশ্বাস মশায়ের কাছে সাহায্যের জন্য যায়। কিন্তু বিশ্বাস মশায় তার আগেই গোলা খালি করে ধান চালগুলো লুকিয়ে রাখে এবং বলে তার কোন মজুত ধান চাল নেই। গ্রামের অনেক লোকই জানে, সে ধান চালগুলো লুকিয়ে রেখেছে। একদিন রাতে কাপালী পাড়ার দুজন লোক বিশ্বাস মশায়ের উপর হামলা করে। বিশ্বাস মশায় রাতের অন্ধকারে মজুত ধান চাল নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। বিশ্বাস মশায়ের চলে যাবার কথা শুনে অনঙ্গ বৌ বলে -

"এই বিপদের দিনে তবুও এই ভরসা ছিল। কোথাও চাল না পাওয়া যায় ওখানে তবু পাওয়া যেতো। এবার গাঁয়ের খুব দুর্দশা হবে, একদিন ধানচাল কারো ঘরে রইলনা আর'(অশনি সংকেত, পৃ-৬০)।

কিছুদিন পর অবস্থা আরো খারাপ হয়, অনঙ্গবৌ নদীর ধারে জল তুলতে গিয়ে দেখে ভূষণ ঘোষের বৌ কাদার উপর ঝুঁকে পড়ে শেঁড়ি গুগলি তুলছে। অনঙ্গ বৌ বলে, ও কে খাবে হাঁস আছে বুঝি ? ভূষণ ঘোষের বৌ বলে, হাঁস নয় ভাই আমরাই খাবো। দিন কতক পরে, চালের অনটন ঘরে ঘরে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী এসে চাল ধার চায়, কে কাকে দেবে ? এত দিন ছিল চালের অভাব, এখন দেখা দিল বিকল্প খাদ্যগুলিরও অভাব। এমনকি পথের ধারে কচুর শাক, পুঁই শাক, সেই সবও সবাই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

এর মধ্যে একদিন ভাতছালা থেকে মতিমুচিনী এসে হাজির হয়। তার কাছে অনঙ্গবৌ শুনে ভাতছালার আরও করুণ কাহিনী। সেখানে খেতে না পেয়ে সব লোক পালিয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে, ছোট ছেলে মেয়ের কান্না সহ্য করতে না পেরে ওদের মা কাঁচা গেড়ি গুগলি খেতে দিচ্ছে। কত মরে গেল এসব খেয়ে। মতি মুচিনীর অবস্থা অনঙ্গ বৌ-এর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল। যে মতিমুচিনী ও কালীগোয়ালিনি এক সময় ভাতছালায় অনঙ্গবৌকে সাহায্য করেছিল, সেই মতিমুচিনী আজ সাত দিন ভাত খায় নি।

এই অবস্থায় একদিন এসে জুটে দুর্গা পণ্ডিত। একা নয়, সপরিবারে। গঙ্গাচরণ মনে মনে বিরক্ত হলেও স্ত্রীর জন্য কিছু বলতে পারে না।

এই অনটনের মধ্যে জন্ম নেয় অনঙ্গবৌ-এর তৃতীয় সন্তান। গ্রামের হাট বাজারে চিনি সুজিও মিলেনা। চিনি ও সুজির জন্য গঙ্গাচরণ মহকুমায় যায়। সেখানে রেশন নিতে গিয়ে দেখে অনেক লোকের ভিড়। অনেক কষ্টে অফিসারের দেখা পায় এবং অনেক অনুনয় বিনয় করে, এক সের আটা, এক পোয়া সুজি এবং এক পোয়া মিছরির জন্য। গঙ্গাচরণের ধারণা ছিল, সাপ্লাই অফিসার ব্রাহ্মণ বলে খাতির করবে, কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হয়।

মতি মুচিনী পনের ষোল দিন ভাত খেতে পারেনি। বামুন দিদির বাড়িতে অর্থাৎ অনঙ্গবৌয়ের বাড়িতে দুটো ভাত খেতে আসে। মৃত্যুর আগে একবার খেয়ে যাওয়া।

এদিকে চালের জন্য ছোট বৌ তার সম্ভ্রম বিকিয়ে দেয়। দুর্গা পণ্ডিতকে ভিক্ষা করতে হয়। একদিন অনঙ্গদের বাড়ীর সামনের আম গাছ তলায় অনাহারে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় মতিকে। এ গ্রামে অনাহারে প্রথম মরণ। উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছিল চমৎকার একটি গাঁয়ে যেখানে ছিলনা কোন অভাব অনটন, কিন্তু আজ এই অবস্থার কারণ কি ? অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টায়। রাত্রির মধ্যে কাপালী পাড়া থেকে অর্ধেক চলে গিয়েছে শহরে। মিথ্যে মরীচিকা -
"সেখানে গেলে গোর মেণ্টো নাকি খেতে দিচ্ছে" (অশনি সংকেত, পৃ-১০৪)।
খেতে দিচ্ছে শোনা কথা। অনঙ্গ বৌ আতংকিত শহরের কথায়, কাপালী বৌকে সতর্ক করে — 'ছুটকি, তোর অল্প বয়স। নানা বিপদ পথে ঘেয়ে মানুষের। কথা দে যাবিনে - 'তুমি যখন বলছো দিদি, তোমার কথা ঠেলতে পারিনে - তাই হবে।' (অশনি সংকেত, পৃ-১০৪)।

ইট খোলায় অপেক্ষা করছে যদু পোড়া কাপালী বৌকে শহরে নেয়ার জন্য। কাপালী বৌ তাকে গিয়ে বললে - 'যাবো না'।

'যাবে না মানে' ?

'মানে, যাবো না।'

যদু পোড়া রাগের সুরে বললে - 'যাবে না তবে আমাকে এমন করে নাচালে কেন ?'

- বেশ করেছি।

কথা শেষ করেই কাপালী বৌ ফিরে চলে আসবার জন্য উদ্যত হয়েছে দেখে যদু পোড়া দাঁত খিচিয়ে বললে - 'না খেয়ে মরছিলে বলে ব্যবস্থা করেছিলাম। না যাও, মরো না খেয়ে।'

কাপালী বৌ কোনো উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।" (অশনি সংকেত, পৃ.১০৫)।

উপন্যাসের শেষে মতির মৃত্যুর অশনি সংকেতের আরেক পিঠে অনঙ্গবৌয়ের এ বিজয়। এ বিজয় ক্ষুধার কাছে কাপালী বৌয়ের আর মাথা নত না করা। মূল্যবোধ এবং সমাজের সমস্ত ভাঙনের সাথে এতোদিন প্রতিযোগিতা চলছিল। ক্ষুধার তীব্রতা যত বাড়ছিল, তত বিলুপ্ত হচ্ছিল মনুষ্যত্ব। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় মন্বন্তর এবং মূল্যবোধের প্রতিযোগিতায় হার মেনেছে মন্বন্তর। অনঙ্গ বৌয়ের ভালবাসা কাপালী বৌকে করেছে সাহসী। ক্ষুধার যন্ত্রণাকে সে প্রতিপক্ষে দাঁড় করিয়ে চ্যালেঞ্জ করছে মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখতে। বিভূতিভূষনের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়েছে এখানে। সমালোচক বলেছেন -

> "সমস্ত মন্বন্তর সাহিত্যে গ্রামের মানুষের শহরে যাওয়ার অনেক ধরণের কালো ছবি আঁকা হয়েছে, আর 'অশনি সংকেত' শেষ হয় শহরে যেতে গিয়েও ফিরে আসায়।" [২]

শহর বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বরাবরই উপেক্ষিত। বিভূতিভূষণের চারিত্র্যই মূলত গ্রাম কেন্দ্রিক। তথাপি এখানে তিনি যে একজন অসাধারণ প্রকৃতি সচেতন সুপ্রচারী ডাবুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শহরের প্রতি বিমুখতা দেখিয়েছেন তা নয়। দেখিয়েছেন মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে সেই শহরের প্রতি উৎকণ্ঠা, প্রচন্ড ঘৃণা আর উপেক্ষা। সমালোচকের ভাষায় 'যে শহরকে খাওয়ানোর জন্য গ্রামকে যারা

হয়েছিল।" [৩] যে শহরের ধনীদের চক্রান্তে, গ্রামের সহজ সরল নিঃসঙ্গ মানুষগুলি শিকার হয়েছে। একে একে ত্যাগ করেছে সমস্ত মূল্যবোধ। পল গ্রিনোর ভাষায় - "ভালোবাসা, দয়ামায়া, এমনকি পরিবারের পোষ্যদের প্রতি দায়িত্ব।" [৪] উপন্যাসের শেষ হয় যতি মুচিনীর মৃত্যু দিয়ে, যতির মৃতদেহ সৎকার করার জন্য এগিয়ে যায় দুর্গা পণ্ডিত। দুর্গা পণ্ডিতের এমন পরিবর্তন দেখে গঙ্গাচরণ অবাক না হয়ে পারে না। সংকট তীব্র, তাই দুর্গা পণ্ডিতের মত মানুষের মনে জেগে উঠেছে মানবতাবোধ। অপরদিকে কাপালী বৌ শহরে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে আর যায় না। মূল্যবোধের ভাঙন নয়, জয় হয় মূল্যবোধের, জয় হয় মানবতার।

বিভূতিভূষণের সমস্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে অশনি সংকেত অন্য স্বাদের। সম্পূর্ণ তথ্যধর্মী রীতিতে সৃষ্ট এ উপন্যাসটি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এমন আলোড়িত বিষয় নিয়ে সৃষ্ট এ উপন্যাস কেন লেখকের জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি তা এক রহস্য। পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ উপন্যাস মাঘ ১৩৫০ থেকে মাঘ ১৩৫২, আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। এমন একজন বিশ্ববিশ্রুত লেখকের, বিখ্যাত ঘটনা নিয়ে লেখা, উপন্যাসটি কেন এতদিন প্রকাশিত হয়নি সে এক প্রশ্নের অবকাশ রাখে। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার প্রশ্ন বাদ রেখেও বলা যায় বিভূতিভূষণ তখন শিল্প-সাফল্যের এমন এক শিখরে, যে কোন প্রকাশক তার পাণ্ডুলিপির জন্য উদগ্রীব হওয়ার কথা। কিন্তু কি অভিমান, কি উদ্দেশ্যে লেখক এ দলিল প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেননি ? মজার বিষয়, অশনি সংকেতকে বাঙালী গভীরভাবে উপলব্ধি করে চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন অশনি সংকেতকে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন। ছবিটি ২৩তম বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের সেরা পুরস্কার 'দি গোল্ডেন বিয়ার' নামক স্বর্ণপদক লাভ করে।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (লেখকের স্ত্রী) উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় (১৯৫৯) ভূমিকায় লিখেছেন -

> "অশনি সংকেতে ১৩৫০ এর মন্বন্তরের জ্বলন্ত দৃশ্য আঁকা রয়েছে। শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলের জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ও লাঞ্ছনার চিত্র যথাযথ বর্ণিত হয়েছে। সে সময়কার জীবন্ত দৃশ্য এই গ্রন্থটির মধ্যে পরিদৃশ্যমান।" [৫]

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ উক্তির সাথে সামান্য মতবিরোধ রেখে বলতে হয়, ১৩৫০ এর মন্বন্তরের যে জ্বলন্ত দৃশ্য বাংলার দ্বারে উপস্থিত এবং মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন, বিভূতিভূষণ একাধারে অনেক গুলি খণ্ডদৃশ্যের মাধ্যমে তার অশনি সংকেত দিয়ে নেপথ্যে অন্তর্নিহিত হলেন। এখানে লক্ষণীয়, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সমস্ত লক্ষণ যেখানে লঘু পায়ে উপস্থিত সে সময়ে বিভূতিভূষণ 'অশনি সংকেত' রচনা শুরু করেন। এর আগের অনেকগুলি উপন্যাসে বিভূতিভূষণ মানুষের জীবনে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার প্রভাব এবং তার প্রকটতা নিপুণ শৈল্পিক তুলিতে চিত্রিত করেছেন। যে শিল্পী মন্বন্তরের পূর্বে 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক'এর মতো উপন্যাস রচনা করে, ক্ষুধার সংকট, অভাবের তাড়না এবং দারিদ্র্যের কষাঘাত নিপুণ তুলিতে রূপায়ণ করেছেন, সেখানে মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'অশনি সংকেত'এ মৃত্যুর প্রত্যুল বর্ণনা আমাদের হতাশ করে। তবে উপন্যাসের নামের সাথে বিচার করলে এ মৃত্যু যথেষ্ট, কারণ নামের মধ্যে ইঙ্গিত আসন্ন বিপদের, পরবর্তী বিপর্যয় নয়। তাই একথা বলা যায় -

> "অশনি সংকেত' উপন্যাসের মধ্যে পঞ্চাশের মন্বন্তরের শুরু এবং বিস্তারের রূপটি বিভূতিভূষণ অত্যন্ত সুদক্ষ চিত্র শিল্পীর ন্যায় আঁকতে সমর্থ হয়েছেন। ধাপে ধাপে পঞ্চাশের মন্বন্তরের আবির্ভাব এবং করাল গ্রাসের ব্যাপারটি নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে 'অশনি সংকেতে'। দুর্ভিক্ষের পুরোচিত্র এখানে হয়তো নেই, তবে তার ভূমিকা এবং বিস্তারের লক্ষণ সমূহ সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত।" [৬]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পুরো চিত্র, নেপথ্যের কাহিনী, মৌলিক কারণ এবং ঘটনার নায়করা যে অশনি সংকেতে অনুপস্থিত তা একজন সতর্ক পাঠক মাত্রেই দেখতে পাবেন। সাহিত্যশিল্পীর কাছে এ সমস্ত বিষয় দাবী করা সমালোচকের দৃষ্টিতে অনধিকার। বরং এ প্রসঙ্গে ডঃ সৌরেন বিশ্বাস বলেছেন -

> "দুর্ভিক্ষের চিত্র বর্ণনায় অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন বিভূতিভূষণ এবং এখানেই নিহিত রয়েছে তাঁর অসাধারণত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা'।" [৭]

কিন্তু মন্বন্তর কেন্দ্রিক এ উপন্যাসে এ মহা শক্তিমান ঔপন্যাসিক পারতেন মন্বন্তরের মৌলিক কারণ, প্রকটতা এবং তার ট্র্যাজেডি'র নিখুঁত চিত্র আঁকতে। এ বিশ্বাস এ শিল্পীর উপর আমাদের জন্মেছে যে, তিনি পারতেন মানবতার উপর কষাঘাত করা আধুনিক সভ্য মানুষের চাবুকটাকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উন্মুক্ত করে, মানব দরদী পাঠককে বিষাদ সিন্ধুর মতো লজ্জার সাগরে অনন্তকাল ডুবিয়ে রাখতে। কিন্তু বিভূতিভূষণ এখানে ইতিহাস, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের অপ্রতুল প্রয়োগের পরিচয় দিয়েছেন। মূলত বিভূতিভূষণের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং সচেতনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> "শুধু মাত্র ইছামতি উপন্যাসে নীল চাষ এবং নীল সাহেবদের অত্যাচার এবং নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহের চিত্র দেখা যায়, কোথাও নীল কুঠি লুটের সংবাদ পাওয়া যায় এবং নীল কুঠির অকথ্য অত্যাচারের ফলে বিদ্রোহী জোটবদ্ধ নীল চাষীরা প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কুঠির দেওয়ান রাজারাম রায়কে খুন করে। কুঠির সাহেবরা এ ঘটনার পর পরিবার পরিজন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়। এবং কুঠির নিরাপত্তার জন্য অধিক পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে। ইছামতি ছাড়া অপরাজিত এবং দেবযানের মধ্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে একটুখানি ইঙ্গিত আছে মাত্র।" [৮]

যদিও গঙ্গাচরণ এবং অনঙ্গ বৌয়ের চোখ দিয়ে লেখক কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং উপন্যাসের এ দু'জন পাত্র-পাত্রী পৃথিবীর অনেক কিছুই জানেনা, তবু ইতিহাস এবং ইতিহাসের 'মন্বন্তর' নামক যে বাস্তব কাহিনীকে ধারণ করে এ উপন্যাস, সেখানে একজন প্রকৃতিচারী দার্শনিকের মতো ধাদ্যপুদ্ভাবের কয়েকটি চিত্র এবং একটি মৃত্যুর রূপদান করে উপন্যাসের সমাপ্তি পাঠকের আশাকে অতৃপ্ত রেখে দেয়। অবশ্য 'মাতৃভূমি' পত্রিকাটি তখন বন্ধ না হলে উপন্যাসটি হয়তো আরো বর্ধিত হতো। এ উপন্যাস প্রকাশের শেষ সময়ে অর্থাৎ ১৩৫২ সালে মন্বন্তরের ঘটনা যখন ঘটমান অতীত, তখন এ শিল্পী মন্বন্তরের অশনি সংকেত দিয়ে পাঠককে ভাবনার পথে নামিয়ে অন্তর্নিহিত হলেন। সত্যিকার অর্থে অশনি সংকেতের যেখানে শেষ, পঞ্চাশের মন্বন্তরের

সেখানে থেকে শুরু। কারণ এ প্রথম অনঙ্গবৌ অবাক হয়ে দেখল, খাদ্যের অভাবেও মানুষ মরে। মতির মৃত্যু পঞ্চাশের মন্বন্তরের পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর সংকেত মাত্র, যে মৃত্যু বিভূতিভূষণ তিক্ততা সহকারে একজন সচেতন নাগরিক হয়ে উপলব্ধি করেছেন। বিভূতিভূষণ, ১৯৪৩ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর রেডিওতে বক্তৃতা দেবার জন্য কলকাতায় যান। কলকাতায় গিয়ে তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক জঘন্যতম দৃশ্য দেখেন, "এ দৃশ্য দেখে তিনি অশনি সংকেত লেখার তাগিদ অনুভব করেন।" [১]

১৩৫২ সালে যেখানে বাংলা অসহায় লক্ষ লক্ষ মানুষ, দুর্ভিক্ষ, অনাহার এবং রোগে ভোগে মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপীড়িত, সেখানে সে সময়ে একজন শিল্পী একটি মৃত্যুর মাধ্যমে অশনি সংকেত দিচ্ছেন, বিষয়টা লক্ষণীয়। লক্ষণীয় এ মহাশিল্পীর ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি নির্লিপ্ততা, অসাধারণ সংযম এবং নিরাবেগতা।

> "এ ছাড়া 'যদিও তার (বিভূতিভূষণের) জীবদ্দশায় এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন তুঙ্গস্পর্শী হয়েছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারত বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করা বা পরোক্ষভাবে জানার সৌভাগ্য হয়েছে বিভূতিভূষণের। কিন্তু কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের ছাপ বিভূতিভূষণের কোন উপন্যাসে পড়েনি।" [১০]

রাজা বাদশাদের কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনা, সমাজের উচ্চ রাজন্যবর্গ, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বরাবরই উপেক্ষিত। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। শুধু ঘটনা কিংবা নায়ক নায়িকা নয়, এমনকি উপন্যাসের দৃশ্যপটে যা যা আয়োজিত সবই তুচ্ছ জিনিষ। জোতদার-মজুতদার অর্থের পাহাড় বানিয়ে সুস্বাদু মোগলাই খাবার কিংবা বিলাতী মদ গলাধকরণ করছে, তার চিত্র অশনি সংকেতে অনুপস্থিত। এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু সেই তুচ্ছ জিনিসগুলিই বিভূতিভূষণের শিল্পশৈলীতে অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। যুধার রাজ্যের এ শ্রেষ্ঠ গদ্যকার সাধারণ আহার সামগ্রীকে এমন লোভনীয় করেছেন তা মূল্যবান দুর্লভ বস্তুর মতো ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণ মুগের ডাল, আলু ভাতে, পেঁপের ডালনা, বড়িভাজা, মোচার ঘন্ট আর সুক্তনি, ঢেঁড়শ ভাজা, ডগঁলে মানকচু, শাকের ডাটা চচ্চড়ি, মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত, সজনে শাক সেদ্ধ, সুষনি শাক ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীকে বাংলার লোক এতোদিন জেনেছে নিম্নশ্রেণীর এবং দরিদ্র লোকদের প্রাণ বাঁচানোর

উপকরণ বলে। কিন্তু মন্বন্তরের এ উপন্যাসে গদ্যকারের অসাধারণ বর্ণনা শৈলীতে এ সমস্ত সামগ্রী পুষ্পধনের মতো লোভনীয় হয়ে উঠেছে। তাইতো মতি মুচিনী আর কাপালি বৌয়ের সাথে ব্রাহ্মণ গৃহিণী মেটে আলুর সন্ধানে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে, কিন্তু অন্য সময় দামী হীরক কোহিনুরের সন্ধানে হলেও ব্রাহ্মণ গৃহিনী অনঙ্গবৌ এমন অভিযানে বের হতো'না। কিন্তু এখন যে বাঁচার তাগিদ, ছেলে স্বামী এবং আশ্রিত অতিথিকে খাবার জোগাবার তাগিদ। ক্ষুধার রাজ্যের এই গদ্যকার তার সমস্ত কথা-সাহিত্যে প্রকৃতি এবং খাদ্যবস্তুকে এমন লোভনীয় ভাবে উপস্থাপন করেছেন, পাঠক বার বার চমকে উঠেছে। ভাবতে হয়েছে - এ কি ! প্রকৃতি তো দিন রাত দেখছি, কিন্তু কখনোতো এমন করে দেখিনি,কিংবা জন্ম থেকেই তো খাবার খেয়ে আসছি, কিন্তু কখনো এমন উপলব্ধি পাইনি। বিভূতিভূষণ 'অশনি সংকেত', 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' প্রভৃতি উপন্যাস দিয়ে খাদ্যের অজস্তার আবিস্কার করে দিলেন। নতুন ভাবে ধরা পড়ল গ্রামের পুষ্পধন। বিভূতিভূষণের এই বিষয় নির্বাচন এবং শিল্পশৈলী সমালোচকের কাছে হয়ে উঠেছে অনুপম আদরণীয়। এমন কি তার কুশীলবদের হাসির সময়ে কান্না কিংবা কান্নার সময়ে হাসি অসংগত না হয়ে ব্যতিক্রমী নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। সুতপা ভট্টাচার্য বলেছেন -

> "বিভূতিভূষণের সমগ্র কথাশিল্প জুড়েই আহার আর আহার্যর কথা যে ভাবে ঘুরে ঘুরেই এসেছে, তাতে মন্বন্তরের কাহিনীতে অনাহারের কাহিনীতে তথ্যজ্ঞাপনের এই দিকটির গুরুত্ব থাকাইতো স্বাভাবিক। ... তার অনাহারের বিবরণ অই দেশ বিদেশের কথকদের মতো করুণ গল্পে 'অশ্রু সজল নয়' কেবল। কান্নার পাশাপাশি হাসিও থাকে। একরাশ সুষনি শাক দেখে অনঙ্গবৌ এর মুখে হাসি আর ধরে না। মেটে আলু তুলতে গিয়ে ভয়ংকর বিপদ থেকে মুক্তি পাবার পর কাপালী বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ে। খিদে সইতে না পেরে ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরও তার হাসি কমেনা। 'এমন অবস্থায় আবার লোকের মুখে হাসি বেরোয় ?' তাকে দেখে ময়নার মা ভাবে। তবু এই হাসির মধ্য দিয়েই রঙ্গিনী একটি বালিকা আমাদের কাছে খুব সত্যি হয়ে ওঠে। আর এই কাপালী বৌটিই শুধু নয়, সকলেরই পেটে টান ধরেছে যখন

তখনও ঢেঁকি শালায় ধান ভানতে এসে হাস্য পরিহাসে মেয়ে মজলিস জমিয়ে তুলতে পারে গ্রামের সব মেয়েরাই। ভাতের প্রত্যাশী মতি মুচিনীকে মিঠে কুমড়ো সিদ্ধ দিয়ে অনঙ্গবৌ যখন জিজ্ঞেস করে আর কি নিবি মতি ? তখনও মতি হেসে বলে 'মাছ দাও, মুগের ডাল দাও, বড়ি চচ্চড়ি দাও' হাসতে গেলে মতির শীর্ণ মুখের সব দাঁতগুলো বেরিয়ে হাসির মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। তবু মতি হাসে এমনই রঙ্গে ভরা এই বঙ্গদেশ। এতটাই পৃথক অশনি সংকেত, না থেকে না এ বিস্তৃত মন্বন্তর সাহিত্যের মধ্যে।" [১১]

তাই মনে হয় দারিদ্র্য থেকে দারিদ্রের যে চিত্র বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে তা তুলনাহীন। লক্ষণীয় সমস্ত উপন্যাসে রোমান্সের কোন স্থান নেই। গঙ্গাচরণ স্ত্রীকে যথার্থ ভালোবাসে। কিন্তু সে ভালোবাসার প্রকাশ কোন রোমান্সের মধ্য দিয়ে নয়, বাস্তবতা দিয়ে। চাল আনতে গিয়ে নিবারণ ঘোষের বাড়িতে সে নিমন্ত্রিত হয়। গঙ্গাচরণ খেতে প্রথমে রাজি হয় না। স্ত্রী পুত্র দুদিন ভাত খায়নি তাদের ফেলে সে একা ভাত খেতে পারেনা। কিন্তু নিবারণ ঘোষ নাছোড়বান্দা, চাল দিতে রাজি নয়, কিন্তু এক বেলা খেয়ে যাবার আবদার করে। কথায় কথায় হাত জোড় করে। গঙ্গাচরণ রাজী হয়। খেতে খেতে ভাবতে থাকে -

'এমন ঘন দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সে এখানে খাচ্ছে, ওখানে অনঙ্গবৌ হয়তো উঠোনের কাটানটের শাকের বনে চুবড়ি নিয়ে ঘুরছে, অখাদ্য কাঁটানটে শাক তুলবার জন্যে" । (অশনি সংকেত, পৃ-৮৩)।

উপন্যাসে দেখা যায় গঙ্গাচরণ এবং অনঙ্গবৌয়ের প্রেমের সম্পর্ক বেশ গভীর। তবে প্রেমিক প্রেমিকার অনুকরণে নয়, দায়িত্বশীল স্বামী স্ত্রীর মতো। অনঙ্গবৌ একটি আদর্শায়িত চরিত্র। চরম দুর্দিনে মনুষ্যত্ব যেখানে বিলীন, মানব সমুদ্রে বাঁচার জন্য নিজের সুন্দরতম পুঁজি খড়কুড়ো মানুষ আগলে রাখছে যেখানে, সেখানে দুটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং প্রাণপ্রিয় স্বামীকে উপেক্ষা করে অনঙ্গবৌ বিলিয়ে দিচ্ছে কষ্টে উপার্জিত আহার। মনুষ্যত্বের আকালে অনঙ্গবৌ একটি ব্যতিক্রম। স্বার্থবাজদের বিস্তীর্ণ গোবরে সে একটি দুর্লভ পদ্মফুল। এ চরিত্রটির আত্মত্যাগ অবিশ্বাস্য। এটাকে যদি দুর্ভিক্ষের

উপন্যাস বলা হয়, তা হলে অনঙ্গবৌ এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সমালোচকের দৃষ্টিতে - "মন্বন্তর নায়ক একটি দুর্বিসহ 'সময়ই' এ উপন্যাসের নায়ক কিংবা খলনায়ক।"[১২] কথাটি অস্বীকার করা যায় না। তবে এ খল সময়ের কাছে পারিপার্শ্বিক সমাজ, সভ্যতা এবং প্রায় সমস্ত মানুষ যখন আত্মরক্ষার্থে আপোষ করছে, এমনকি গঙ্গাচরণও, তখন ব্যতিক্রমী হয়ে রুখে দাঁড়ালেন অনঙ্গবৌ। মন্বন্তরে অনঙ্গবৌ দুঃসাহসী দাতা, যে কাঙালের সমুদ্রে কাঙাল হয়েও দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। যার কোন খাদ্য মজুত নেই, সংস্থানের নির্দিষ্ট উৎস নেই। তবুও সে অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী। দুর্গা পণ্ডিত, কাপালী বৌ, মতি মুচিনী সবার সর্ব শেষ আশ্রয়, যার শরণাপন্ন হলেই একটা বিহিত হয়ে যাবে বলে সবার বিশ্বাস। কারণ, সমালোচকের ভাষায় -

> "দুর্ভিক্ষের এই বাস্তব যন্ত্রণার মাঝখানে বিভূতিভূষণের নারীত্বের আদর্শলোক থেকে অনঙ্গবৌয়ের এবং শান্তমণির মত সেবাময়ীদের অনুচিত আগমন। এরা দুর্ভিক্ষের মাঝখানে থাকলেও দুর্ভিক্ষ এদের মনকে স্পর্শ করে না।"[১৩]

অনঙ্গবৌ সম্পর্কে সুতপা ভট্টাচার্য বলেছেন -

> "মানবতার অবক্ষয় নয় - মানবতার উজ্জ্বলতম এক পরিচয় ফুটে উঠেছে অনঙ্গ বৌ চরিত্রে। নিজে না খেয়ে সে অন্যকে খাওয়ায়, সপরিবারে দুর্গাপণ্ডিত তার কাছে আশ্রয় পেয়ে যায়, কাপালী বৌ প্রয়োজন হলে তার কাছে থেকে চাল নেয়, মতি ভাত পায়। — অনঙ্গ বৌ তো কাপালী বৌকে শহরে যেতে দেয় না, বলে আমার ছোট বোনের মত থাকবি। যদি না খেয়ে মরি দুজনেই মরব।"[১৪]

অশনি সংকেতে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি নেই, যেন ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। বাস্তব এবং লোভের এমন এক জগত মানুষ সৃষ্টি করেছে রোমাঞ্চ আজ বেমানান। তবু অনঙ্গ বৌ এবং গঙ্গাচরণের মাঝে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা চমৎকার। গঙ্গাচরণ সমাজটাকে আগলে রেখেছে, কিন্তু অনঙ্গবৌয়ের ভয়ে দুর্গা পণ্ডিতকে কিছু বলতে পারে না।

পণ্ডিত পরিবারসহ তার ঘাড়ে চাপলে, সে মনের রাগ মনেই দমিয়ে রাখে। বস্তুত অনঙ্গ বৌয়ের অসাধারণ চরিত্রের কাছে গঙ্গাচরণের বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না। গঙ্গাচরণ ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত বা শিক্ষক হলেও অসাধারণ কোন মানুষ নয়, আর দশ জনের মতো সাদামাটা একজন মানুষ। যে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বিভিন্ন ছলনা করে। তার এ সমস্ত ঠকবাজি, ছলনা তাকে কিন্তু কোন খল চরিত্রে উপনীত করে না, কারণ তার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা উচ্চ লোভ নেই। দুটি ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সে দুটো খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। সচ্ছলতা থাকলে সেও দান করতে পারে। কামদেবপুর গ্রামকে গাঁ বন্ধ করে ফিরবার সময় দীনু ভট্টাচার্য তার কাছে কিছু চাইলে গঙ্গাচরণ তাকে সহানুভূতি সহকারে কিছু চাল ডাল দিয়ে দেয়। দুর্গা পণ্ডিতের খাওয়ার বহর দেখে গঙ্গাচরণ মনে মনে ভাবে, এ দুর্মূল্যের এবং দুর্ভিক্ষের বাজারে বেচারী নিশ্চয়ই আধপেটা খেয়ে থাকে। সামর্থ থাকলে গঙ্গাচরণ এদের জন্য কিছু করতে রাজী - কিন্তু গঙ্গাচরণ তো একজন সামান্য পাঠশালার শিক্ষক। নিজেই অসচ্ছল। সে বেড়াচ্ছে প্রতিষ্ঠার জন্য। একটু সচ্ছলতার জন্য। অশনি সংকেত উপন্যাসে গঙ্গাচরণ নায়ক মহানায়ক কিছু নয়, একজন সাধারণ মানুষ। বিভূতিভূষণের সৃষ্ট বেশির ভাগ চরিত্রের মতো সেও গরীবদের একজন। স্নেহবৎসল পিতা, দায়িত্ববান স্বামী এবং একজন পাঠশালার পণ্ডিত। তার পুরোহিতগিরি, পণ্ডিতগিরি এবং ভাগ্য অন্বেষণে তৎপরতা বা সর্বোপরি প্রচেষ্টার পর প্রতিষ্ঠা বা সচ্ছলতা নাড়ে এ সংকট, তাকে এ বিশ্বাসে উপনীত করে, এ সমাজে বাঁচতে হলে ছলে বলে নিজের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। একজন পাঠশালার পণ্ডিতের বেতন বা রোজগার দিয়ে খেয়ে পরে বাঁচার অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ হয়ে শুধু পুরোতগিরি করে তার চলে যাবার কথা। কিন্তু ঔপনিবেশিক এসমাজে অনুৎপাদক পেশাজীবী এ মানুষগুলি চোখে অন্ধকার দেখে, ফলে বাঁচার তাগিদে শুরু হয় নৈতিকতা বিসর্জন, জাত পাতের ভাঙন। গঙ্গাচরণ জানে সে ভুয়ো শাস্ত্র জ্ঞান দিয়ে লোক ঠকিয়ে চলছে। সে কৃষিকাজ করার কথা ভাবে, বৈশ্যের কাজ করতে মনস্থ করে। সে ভিতরে ভিতরে আস্তিকতা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্বন্ধে সে তেমন কিছু জানে না। কেন খাদ্যের মূল্য বাড়ছে, কেন খাদ্যের সংকট। যেখান থেকে চাল আসে সে ব্রহ্মদেশ জাপানীরা দখল করে নিয়েছে এ পর্যন্ত তার বিদ্যে।

সে আত্মদোষ খুঁজে, "যার জমি নেই এ বাজারে তাকে উপোষ করতেই হবে। জমি না চষে পরের খেয়ে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙল ধরে চাষ করে, আমরা তার উপরে বসে খাই। এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা।" (অশনি সংকেত, পৃ.২৭)।

কিন্তু গঙ্গাচরণের এ উপলব্ধিও কি সত্যি ? যদি তাই হয়, তবে চাষাদের দুরবস্থা হবে কেন ? কাপালী বৌ যাদের ক্ষেতে ধান ছিল, সে কেন চাল জোগাড় করার জন্য 'শ্মশানের পোড়া কয়লা'র মত যদু পোড়ার কাছে শরীরটা বিকিয়ে দেবে ? গঙ্গাচরণ এতদিন সমাজের অন্য দশজন থেকে একটু উঁচুস্তরের জীবন যাপন করে আসছিল। সব খানে তার আলাদা একটা খাতির ছিল। কারণ পুরো কাপালীদের সমাজে সে একমাত্র ব্রাহ্মণ, এবং পণ্ডিত লোক। তার এতোদিন একটা জাত্যাভিমান ছিল। ছেলেকে বাঁশ কঞ্চি নিয়ে ক্ষেতে বেড়া দিতে দেখলে সে বাধা দিয়ে বলে, ব্রাহ্মণের ছেলে কেন এসব করবে। কিন্তু এবার মন্বন্তর তাকেও নামিয়ে দেয় সাধারণের সারিতে। ব্রাহ্মণ হয়ে তাকে ভাবতে হচ্ছে, কাপালীদের মতো হাল চাষের কথা। অনঙ্গ বৌ, ব্রাহ্মণ গৃহিনী হয়ে নীচু জাতের ধান ভেনে চাল সংগ্রহ করছে জেনেও সে বাধা দিতে পারে না। (যদিও আগে গঙ্গাচরণ শূদ্র যাজকদের পূজারী ব্রাহ্মণ হয়েছিল। তার মনে ভরসা ছিল এ পাড়া গাঁয়ে কে দেখতে আসেছে) শুধু তাই নয় সে মিথ্যা মন্ত্র পূজোর মাধ্যমে গাঁ বন্ধ করে তার ব্রাহ্মণের কুলবৃত্তিকে সততার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে। ধর্মীয় সংস্কার এবং বিশ্বাসের বদলে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের উপর তার আস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনঙ্গ বৌ যখন বললে -"তুমি গাঁ বন্ধ করতে পারবে তো ? এত লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা। গঙ্গাচরণ হেসে বললে - আমি পাঠশালার ছেলেদের 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' বই পড়াই, তাতে আছে মহামারীর সময় কি কি করা উচিৎ অনুচিত, আসলে তাতেই গাঁ বন্ধ হবে। মন্ত্র পড়ে গাঁ বন্ধ করতে হবে না।"(অশনি সংকেত, পৃ.২৪)।

আলোচনায় দেখা যায় অশনি সংকেতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুর্গাপণ্ডিত। জাতিতে ব্রাহ্মণ কামদেবপুর পাঠশালার সেকেন্ড পণ্ডিত দুর্গা এতোদিন পাঁচ টাকা বেতন পেয়ে নিজের সংসারটাকে চালিয়ে আসছিল। কিন্তু চালের দাম যখন ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে তখন দুর্গা বিচলিত হয়ে ওঠে। দুর্গা পণ্ডিত যখন দেখল টাকা দিলেও

চাল পাওয়া যায় না, তখন সে এসে উপস্থিত হয় গঙ্গাচরণের আশ্রয়ে। সে গঙ্গাচরণকে সবিনয়ে জানায় এখানে কি চাল পাওয়া যাবে ? তাদের গ্রামে টাকা দিলেও পাওয়া যায় না। গঙ্গাচরণ বিশ্বাস মশায়ের উপর ভরসা করে চাল কেনার কথা ভাবে। কিন্তু দুর্গাপণ্ডিতের কাছে টাকা নেই। গঙ্গাচরণ মুগ্ধ হয়। টাকা নেই তবে চাল কেনার কথা বলছে কেন ? দুর্গাপণ্ডিতের এই একটা মাত্র আচরণ দিয়ে তার চরিত্রের অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম থেকে উপন্যাস শেষ হওয়ার একটু আগে পর্যন্ত দুর্গাপণ্ডিত এমন কপটতা মূলক আচরণ করে। ডিফে করতে গিয়ে বলে, তার গোলাভরা ধান ছিল, বিক্রি করে দিয়েছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় দুর্গাপণ্ডিত মতি মুচিনীর মৃতদেহের সৎকার করতে এগিয়ে যায়। জাত, জাত্যাভিমান ইত্যাদি দিয়ে এতদিন সে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে সমাজ থেকে, কিন্তু এবার সে মহৎ লোকের কাজ করে। নিচু জাতের মড়াদেহের সৎকার করতে এগিয়ে যায়। গঙ্গাচরণ অবাক না হয়ে পারে না।

উপন্যাসের শেষে দুর্গা পণ্ডিতের উপর আমাদের শ্রদ্ধা আসে। এতদিন পরাশ্রিত হয়ে, পরের কাছে চেয়ে সে জীবন যাপন করেছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল ? মন্বন্তরের সময় তার চাকরি চলে যায়। সে পরিবার নিয়ে কোথাও যাবার মতো জায়গা না পেয়ে গঙ্গাচরণের বাড়িতে এসে ওঠে। এর মধ্যে সে দেখে অনঙ্গ বৌয়ের সংসারেও মন্বন্তরের গ্রাস, ফলে সে কৌশল করে আসে পাশে ডিফে করতে শুরু করে। আত্মসম্মান বোধ বিসর্জন দেয়। অনঙ্গ বৌ যখন বাধা দিয়ে বলে -

"আপনি আমাদের বাড়ী এসেছেন, আর বেরুতে হবে না লোকের বাড়ি চাইতে, যা জোটে তাই খাবো।" তখন সে বলে -

"কি জানি মা, ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হোল ভিক্ষা, এতে লজ্জা নেই কিছু। আমার নেই আমি ভিক্ষা করবো। লড়াই বেধেছে বলে পেট মানবে ?" (অশনি সংকেত, পৃ০২৬)। বিশাল সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টার মতো পণ্ডিত অনঙ্গ বৌকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু কদিন ? মতি মুচিনীর পরে দুর্গা পণ্ডিতদের কি গতি হলো লেখক উপন্যাসকে সেখানে না টানলেও আমাদের অনুমান করতে কষ্ট হয় না এবার দুর্গা পণ্ডিতদের পালা, কারণ মতি মুচিনীর মৃত্যু দিয়ে তো পঞ্চাশের মন্বন্তরের সূচনা।

অশনি সংকেতের সব চেয়ে ট্র্যাজিক চরিত্র মতি মুচিনী। অন্ন কষ্টে যখন অনঙ্গবৌ এবং গঙ্গাচরণ ভাতছালা গ্রাম ত্যাগ করছিল তখন মতি মুচিনী অনুরোধ করেছিল গ্রাম না ছাড়তে। তারা যে কোন প্রকারে তাদের বামুন দিদিকে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিবে। কিন্তু মনন্তরের ফলে মতি মুচিনী সাত দিনের অনাহারের পর নিজে এসে অনঙ্গবৌ এর কাছে হাজির। অনঙ্গবৌ বললে -

"-কি রে মতি ? আয় আয় - মতি গলায় আঁচল দিয়ে দূর থেকে প্রণাম করে বললে -

- গড় করি দিদি ঠাকরুণ।
- কি রকম আছিস ? এ রকম বিশ্রি কেন ?
- ভালো না দিদি ঠাকুরণ। না খেয়ে খেয়ে এমনি দশা।
- তোদের ওখানেও মন্বন্তর ?
- বলেন কি দিদি ঠাকুরণ, অতবড় মুচিপাড়ার মধ্যে লোক নেই, সব পালিয়েছে।
- কোথায় ?
- যে দিকি দুচোখ যায়। দিদি-ঠাকুরণ, সাতদিন ভাত খাইনি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর - গেঁড়ি গুড়ালি, তাও এদানিং মেলে না।" (অশনি সংকেত, পৃ.৩৪)।

মতি এসে দেখে এখানেও মন্বন্তর, তারপর ও অনঙ্গ বৌ তাকে থাকতে বলে। মতি মুচিনীর সাথে অনঙ্গবৌয়ের ছিল হৃদয়ের সম্পর্ক। যখন অনঙ্গ বৌ ভাতছালা গ্রামে থাকত তখন মতি নানান ভাবে তাদের সাহায্য করেছিল। অনঙ্গ আর মতি একে অন্যকে সুখ দু:খের কথা বলতো। যে সরল প্রাণ, মতি মুচিনী অনঙ্গ বৌকে আহারের আশ্বাস দিয়ে ভাতছালায় রাখতে চেয়েছিল, সে মতি মুচিনীই প্রথম এতগুলি মানুষের মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর শিকার হলো। মতি অনঙ্গ বৌয়ের প্রিয়ভাজন হলেও মন্বন্তরের ফলে অনঙ্গ বৌয়ের কাছে অতিথি হিসেবে আশ্রিতা হতে পারেনি, যা পেরেছে দুর্গা পণ্ডিত। মতির মৃত্যু সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। লেখকের ভাষায় "গ্রামে থাকা খুব মুশকিল হয়ে পড়লো মতি মুচিনীর মৃত্যু হওয়ার পরে। অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম, এর আগে কেউ জানত না বা বিশ্বাসও করে নি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে। এত ফল থাকতে গাছে গাছে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে। তখন মানুষ কখনো না খেয়ে মরে ? কেউ না

কেউ খেতে দেবেই। না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না।' কিন্তু যতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে, না খেয়ে মানুষে তাহলে তো মরতে পারে"। (অশনি সংকেত, পৃ-১০২)।

কাপালী বৌ একটি চমৎকার চরিত্র। কাপালী বৌ তার ছলাকলা সম্পর্কে যে অচেতন তা নয়। সে ইচ্ছে করে যদু পোড়ার সংগ্রহে যায়। বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। চরিত্র হিসাবে সে জটিল নয়। প্রবৃত্তি পরায়ন। খাদ্যের টানা পোড়েন তাকে টেনে নিয়ে ছিল অধঃপতনে। সে চঞ্চলা, কখনো বালিকা সুলভ আচরণ করে। সে অনঙ্গবৌকে বলেছিল, 'নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতে পাই,' এই যার লিপসা মন্বন্তরের সময় যদু পোড়ার কাছে আশ্রয় নেয়া তার পক্ষে আর অবাস্তব কি ?

প্রথম দিকে মনে হয় সে একটি বিতর্কিত চরিত্র, উপন্যাসের শেষে তার একটা পরিবর্তন ঘটে। এ উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে হলেও কাপালী বৌ বেশ জীবন্ত চরিত্র। তার প্রাণময়তা, মন্বন্তরকে ম্লান করে দেয়। তাকে কোন বিষয়েই গভীর হতে দেখা যায় না। কেবল উপন্যাসের শেষে সে শহরে যেতে গিয়েও যখন যায় না তখন মনে হয় সে বস্তুতান্ত্রিক হয়ে যদু পোড়ার সাথে অসামাজিক কাজে নেমেছে। জীবনকে হালকাভাবে দেখার একটা বিশেষ দৃষ্টি কাপালী বৌয়ের ছিল। এমনকি মেঠো আলু তুলতে গিয়ে অনঙ্গ বৌয়ের জনৈক লোকের কুদৃষ্টির শিকার হওয়ার ব্যাপারটাও তার কাছে কৌতুক-পূর্ণ মনে হয়েছে। নারীত্ব এবং সামাজিক নীতি-চরিত্র সম্পর্কে তার কোন গভীরতা ছিল না। তাই মনে হয় বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কাপালী বৌ রোমাঞ্চ-হীন উপন্যাসে একমাত্র রোমাঞ্চ। অশনি সংকেতের অন্যান্য চরিত্র সমূহ হচ্ছে, বিশ্বাস মশায়, দীনু ভট্টাচার্য, নিবারণ ঘোষ। মুষ্টিমেয় কয়েকটি চরিত্র দিয়ে 'অশনি সংকেত' সৃষ্ট।

অশনি সংকেত রোমান্টিক উপন্যাস নয়। তবু মনে হয় খাদ্য এবং দারিদ্রতা নিয়ে যে রোমান্টিক প্রহসনতা বাংলায় বিস্তৃত, কিন্তু সাহিত্যে অনুপস্থিত, বিভূতি-ভূষণ তা অশনি সংকেতে অসাধারণ ভাবে উপস্থাপন করেছেন। দারিদ্রতার উপর বাংলা সাহিত্যে এটা একটা দুর্লভ সংযোজন। বলা হয়েছে -

"বিভূতি রচনায় দারিদ্রের চিত্র জ্বলন্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, পরবর্তী জীবনে বিভূতির আর্থিক অবস্থা ভালোই হইয়াছিল, কিন্তু বিভূতি তাহার বাল্য সঙ্গী দারিদ্রকে ত্যাগ করেন নাই, তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত দারিদ্রের মতই জীবন যাপন করিয়াছিলেন।" [১৫]

বিভূতি সমালোচকরা 'অশনি সংকেত' উপন্যাসকে বড় একটা মূল্যায়ন করেন না। এর কারণ দেখাতে গিয়ে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলেছেন -

"এ যাবৎ বিভূতিভূষণ নিয়ে যারা লিখেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই গলা অবধি ডুবে আছেন এক ভাববাদী সাহিত্যতত্ত্বের পাঁকে। তাঁদের প্রিয় লেখককে তাঁরা যে রূপে দেখতে চান তার পথে মূর্তিমান বাধা 'অশনি সংকেত'।" [১৬]

অশনি সংকেত নিয়ে রসাত্মক ভঙ্গিতে ন্যায্য কথাটি বলেছেন এ সমালোচক। তিনি বলেছেন -

"আঙ্গিকবাদী সমালোচকরা উপন্যাস বলতে একটাই টাইপ বোঝেন। সেই ফিতে দিয়েই সব উপন্যাসের মাপ জোক করেন। কাজের সুবিধের জন্য আমরা তাকে 'উধোর ফিতে' বলতে পারি। সে ফিতের আর সব অঙ্ক মুছে গেছে, কেবল '২৬'টা পড়া যায়। এই আজব ফিতে দিয়ে মেপে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত রায় দিয়েছেন, 'অশনি সংকেত'এ 'দুর্ভিক্ষের কথা সার্থক উপন্যাসে পরিণত হয় নাই' দুর্ভিক্ষের কাহিনী যে অন্য ফিতে দাবি করতে পারে - এমন চিন্তাই বোধ হয় তাঁর মাথায় আসেনি। অথচ সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, বিষয়বস্তু এখানে এতই আলাদা যে উপন্যাসের বিচার ও অন্য রকম হতে বাধ্য।

কতক ঘটনা আছে যার সামনে সব জ্ঞান বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে যায়। যেমন নাৎসী বন্দীশিবিরের বীভৎসতা। আউসভিৎস, বুখেনভাল্ড। সেই গণহত্যাশালার বিবরণ দেওয়ার সময়ে করুণ রস সঞ্চারের বাড়তি চেষ্টা করতে হয় না। ... ঘটনার বিবরণ কতখানি সত্য হয়ে উঠেছে, কত কম পরিসরে তার তীব্রতা ফুটিয়ে তোলা গেছে - সেটাই মুখ্য বিচার্য। পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কেও একই কথা। জার্মানি, পূর্ব ইউরোপ, জাপানের মতো বাংলা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গণহত্যার আরেক ফ্রন্ট।" [১৭]

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি মাঘ ১৩৫০ থেকে মাঘ ১৩৫২ পর্যন্ত 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এসময় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে 'অশনি সংকেত' সেখানে বন্ধ হয়ে থাকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে বিভূতি প্রকাশন থেকে। বৈশাখ ১৩৯৮ সালে 'মিত্র ও ঘোষ' ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ গবেষণা পত্রে সে সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি নেয়া হল।

২। সুতপা ভট্টাচার্য : 'কথা সাহিত্যের একক পথিক', পুস্তক বিপণি, কলকাতা জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃ.৮৪।

৩। তদেব, পৃ.৮৬।

৪। Paul R.Greenough : 'Prosperity and misery in Modern Bengal', The Famine of 1943-1944,Oxford Uni.Press,1982, P-271

৫। রমা বন্দ্যোপাধ্যায় :'অশনি সংকেত' উপন্যাসের গ্রন্থ সংলগ্ন ভূমিকা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৯৮ বাংলা।

৬। সৌরেন বিশ্বাস : 'বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯৭, পৃ.৬৭।

৭। তদেব, পৃ.১।

৮। তদেব, পৃ.১৩০।

৯। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'বিভূতি স্মারক গ্রন্থ' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, মাঘ ১৪০১, পৃ.৩৭৬।

১০। সৌরেন বিশ্বাস : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৩০।

১১। সুতপা ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৮২-৮৩।

১২। তদেব, পৃ.৭৮।

১৩। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য', সাহিত্যায়ন, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ.২৪৬-২৪৭।

১৪। সুতপা ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৮৪।

১৫। কবি শেখর কালিদাস রায় : ভূমিকা, 'বিভূতি বীথিকা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য, কলকাতা, বৈশাখ - ১৩৮৫, পৃ.১।

১৬। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : 'মন্বন্তরের উপন্যাস : 'অশনি সংকেত', অনুষ্টুপ, বর্ষা ১৩৯৬, পৃ.৭০।

১৭। তদেব, পৃ.৭০-৭১।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী'

পঞ্চাশের মন্বন্তর কেন্দ্রিক না হলেও এ মন্বন্তরকে ঘিরে মন্বন্তর পরবর্তী পটভূমিকায় রচিত আবু ইসহাকের(১৯২৬-) পূর্ব বাংলার সুবিখ্যাত উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫)।[১] সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে আমরা সরাসরি পঞ্চাশের মন্বন্তরকে পাই না। তবে এ উপন্যাসের পটভূমিকার নেপথ্য ইতিহাস পঞ্চাশের মন্বন্তর। পঞ্চাশের মন্বন্তর যে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে দীর্ঘদিন প্রভাব রেখে দিয়েছিল - তার দলিল হয়ে কাজ করে এ উপন্যাস। এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা এ উপন্যাসটিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যান্য উপন্যাসের সাথে দলভুক্ত করেছি। গ্রামীণ কুসংস্কারের তথাকথিত অশুভ-অলক্ষুনে বলে চিহ্নিত একটি সূর্য-দীঘল বাড়ী, এবং তার আশ্রিত পরিবারকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের কাহিনী রচনাকরেছেন তরুণ লেখক আবু ইসহাক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের নিষ্ঠুর শিকার জয়গুন নামক একজন অসহায় জননীর দারিদ্র্য এবং ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার সংগ্রামী জীবন আলেখ্য এ উপন্যাস।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক নির্মম ছবি দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাস শুরু করেছেন। চারিদিকে আকাল। গরীব মানুষের হাহাকার। গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলি ভাতের আশায় ঢাকা শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের ধারনা সেখানে অন্তত দু'মুঠো ভাতের অভাব হবে না। কিন্তু শহরে পৌঁছে গ্রামের সে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের আশা ভেঙ্গে যায়। খাদ্যের প্রাচুর্য, সৌখিন পথচারীর পোষাকের চমক এবং গুজুতদারদের গুদামে চালের প্রাচুর্য আছে বটে, তবে তা হাতাতে মানুষদেরকে আশান্বিত না করে আশাহত করে। বড় লোকের দরজার উপর মাথা ঠুকে ঠুকে হতাশ হয়ে নেতিয়ে পড়ে অসহায় মানুষগুলি। এমনো কুকুরের সাথে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। তারপর ভাত নয়, একটু ফ্যানের জন্য শুরু হয় আহাজারি। কিন্তু সে মানুষগুলির আহাহারি, বড় লোকদের সহানুভূতির উদ্রেক ঘটাতে পারে না। আবার তারা কঙ্কালসার দেহ নিয়ে গ্রামের পথে পা বাড়ায়। অনেক আশা নিয়ে তারা শহরের পথে পা বাড়িয়েছিল।

মন্বন্তরের এই দৃশ্যগুলি মন্বন্তরের প্রায় উপন্যাসে পাওয়া যায়। তবে পশ্চিম বাংলার উপন্যাসগুলিতে গ্রামে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব বাংলার উপন্যাসে দেখা যায় মন্বন্তর পীড়িত মানুষগুলির শহরের প্রতি বিমুখ হয়ে আবার গ্রামে ফিরে আসতে। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা', কিংবা শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসে ও উপন্যাসের কুশীলবদের শেষ পর্যন্ত গ্রামমুখী হতে দেখা যায়। সূর্য-দীঘল বাড়ী যেহেতু আগে রচিত, সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি, পশ্চিম বাংলার ধারা থেকে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য এই ধারা আবু ইসহাক থেকে জন্ম লাভ।

এক সময় বলা হতো প্রণয়ই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান সুর। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ বিভাগ এসবের পর উপন্যাসের সংজ্ঞা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে সমালোচকদের। কারণ প্রণয় ছাড়াও দুই বাংলার সমাজ জীবনে এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে, যার রস, যার আবেদন পাঠকের কাছে অনেক জোরালো। ফলে উপন্যাস বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উপন্যাস রোমান্স বা কল্পনা কথা থেকে নেমে এসে মানুষের জীবন কথায় আশ্রয় খোঁজে। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত', কমলকুমারের 'খেলার প্রতিভা' কিংবা আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' প্রচলিত প্রণয় এড়িয়েও উপন্যাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। এ সব উপন্যাসের মূল প্রাণ সমাজ-বাস্তবতা। বাস্তব এড়াতে গেলে শিল্পীর মনে দ্বন্দ্ব জাগে, তাঁর বিশ্বাসবোধ কল্পনা-বাস্তবের সংমিশ্রণ দ্বারা আক্রান্ত হলেও, তাকে ভাবতে হয়, ঘটনা কিংবা চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। আবু ইসহাক ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে সাজিয়ে সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের কাহিনী তৈরী করেন। জয়গুন নায়িকা প্রধান এ উপন্যাসের মূল চরিত্র। বেচে থাকার সংগ্রামে শহরের প্রতি আশাহত হয়ে জয়গুনও ছেলে মেয়েদের নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। একই সাথে আসে শফী ও শফীর মা। শফী জয়গুনের ভাইপো। কিন্তু গ্রামে আশ্রয় নেবে কোথায় ? পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তারা পেটের জ্বালায় ভিটা-বাড়ী বিক্রি করে দিয়েছে। আছে এক সূর্য-দীঘল বাড়ী। পূর্ব-পশ্চিম সূর্যের

উদয়াস্তের দিকে। তাই এই পূর্ব-পশ্চিম মুখী বাড়ির নাম সূর্য-দীঘল বাড়ী। জয়গুনের প্রপিতামহ কোন এক আকালের সময় সস্তায় এ বাড়িটা কিনে ছিলেন। কিন্তু এ যে সূর্য-দীঘল বাড়ী। লোকের বিশ্বাস এ বাড়িতে যে বাস করে তার বংশ নির্মূল হয়ে যায়। সূর্য-দীঘল বাড়ীর অনেক ঘটনা জয়গুন ও শফীর মা জানে। এ বাড়ীতে বসবাস করার কথায়, গা শিহরে উঠে তাদের। অবশেষে তার একটা ব্যবস্থা করে। জোবেদালী নামে এক ফকির তাবিজ তুমার দিয়ে বাড়ীটাকে অশুভ শক্তিমুক্ত করে দেয়। ফকিরের আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তারা এ বাড়িতে বসবাস শুরু করে। এরপর চলে জীবন সংগ্রাম। জয়গুন পাঁচ টাকা মূলধন নিয়ে ময়মনসিংহ হতে সস্তায় চাল কিনে এনে গ্রামে বিক্রয় করে। ছেলে হাসু নারায়ণগঞ্জে রেল ও স্টিমার ঘাটে বোঝা পত্র বহন করে কিছু রোজগার করে। এভাবে মা-ছেলের আয় দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। শফীর মার একমাত্র আয় ভিক্ষা। কাজ করার বয়স তার নাই। জয়গুনের দুটি হাঁস ডিম দিয়েছে। প্রথম দুই দিনের ডিম সে জুম্মা ঘরে মানত করে। হাসু ডিম নিয়ে মসজিদে যায়। মৌলভী সাহেব ডিম ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কারণ জয়গুনের মত বেপর্দা আওরতের দেয়া জিনিস খেয়ে সে 'হারামী' হতে রাজী নয়, জয়গুন ভাবে, বেপর্দা না হলে কে তার মুখে খাবার তুলে দেবে ? সে চুরি করছে না। সে উত্তরে যাচ্ছে চাল কিনে এখানে বিক্রি করার জন্য। সে খেটে খাচ্ছে। মৌলবীর উপর হাসুর রাগ ধরে। সে ডিমগুলি জয়গুনকে না জানিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেয়। সেই পয়সা দিয়ে মায়মুনের জন্য চুড়ি এবং কাসুর জন্য চরকি ও কদমা কিনে। কাসু তার আপন মায়ের পেটের ভাই। তবে বাপ ভিন্ন। প্রথম স্বামী জব্বার মৃধার মৃত্যুর পর জয়গুন বিয়ে করে করিম বক্সকে। এই করিম বক্সের ঔরসে কাসুর জন্ম। মন্বন্তরের বছর বিনা দোষে সে জয়গুনকে তালাক দেয়। ছেলে কাসুকে করিম বক্স নিজের কাছে রেখে দেয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যান্য উপন্যাসে কিছু অসহায় 'অন্নদাতা কর্তৃক পোষ্যদের ত্যাগ' করার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সাথে এখানে একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। করিম বকশ জয়গুনকে ত্যাগ করলেও ছেলে কাসুকে রেখে দেয়। মানবিক অবক্ষয়ের এই চিত্র জয়গুনের জীবন ট্র্যাজেডিকে বাড়িয়ে দেয়। কারণ জয়গুন জীবন সংগ্রামে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে, সংগ্রামী সৈনিকের মত তার দৃঢ়

মনোবল তাকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু কাসু যেন মন্বন্তরের বোমায় ছিন্ন হয়ে যাওয়া তার শরীরের একটি অঙ্গ। এই অঙ্গের প্রতি তার আকর্ষণ পরবর্তী জীবনে কখনো কমেনি। হাসু জুম্মা ঘরের মৌলবীর কেরত দেয়া ডিম বিক্রি করে মায়মুনের জন্য চুড়ি কিনার কথা শুনে জয়গুন বাঘিনীর মতো উত্তেজিত হলেও যখন শুনে কাসুর জন্য 'কদমা' ও চরকি কিনেছে, তখন বাঘিনী দপ করে রাগহীন হয়ে যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের এই পরিণতি সামাজিক সমস্যা বাড়িয়ে দেয়, মন্বন্তর নেমে না এলে করিম বক্শ জয়গুনকে ত্যাগ করত না। কারণ, উপন্যাসে দেখা যায়, জয়গুন এবং করিম বক্শ পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ছিল, যার ফলে করিম বক্শ জয়গুনকে একবার ত্যাগ করলেও পুনরায় বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে, আবার করিম বক্শের মৃত্যুর পর জয়গুনের চোখের অশ্রু প্রকাশ হয়ে পড়ে। জয়গুন ছেলে-মেয়েদের জন্য লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে বেপর্দা নারী হয়ে যায়। নিজের জীবনের চেয়ে এই ছেলেমেয়েদের বাঁচাবার যে মাতৃত্ব তার বুকে সেখানে বেপর্দা অনেক তুচ্ছ। আমরা মন্বন্তরের কিছু উপন্যাসে দারিদ্র্যের এ রকম অনাহার পর্যায়ের সংকট মুহূর্তে মেয়ের সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে অর্থ উপার্জনের পথ গ্রহণ করতে দেখি।

গাড়িতে জয়গুন দেশ স্বাধীন হওয়ার কথা শুনে। দেশ স্বাধীন হলে চাল সস্তা হবে - মানুষ না খেয়ে মরবে না। একথাও সে শুনে। ফলে স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ মনে সে অপেক্ষা করে। দেশ স্বাধীন হলে খেয়ে পরে বাঁচা যাবে এ জন্য সে স্বাধীনতা চায়। ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল। দেশ স্বাধীন হয়। হাসু পতাকা বানিয়ে আম গাছে উড়ায়। ঈদের চাঁদ ওঠে। চারিদিকে ঈদের আনন্দ। এ বারের চাঁদ সোজাসুজি উঠেছে দেখে সকলে ভরসা পায়। কারণ পঞ্চাশ সনে দক্ষিণমুখী চাঁদ উঠেছিল বলেই তো দেশে আকাল দেখা দিয়েছিল। ঈদের জন্য রেশনের চিনি আসে। ফুড কমিটির সেক্রেটারি খুরশীদ মোল্লা গ্রামের সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রেশনের চিনি 'ব্ল্যাকে' বিক্রয় করে। নারীলিপ্সু গদু প্রধানের দৃষ্টি জয়গুনের উপরও পড়ে। শফীর মাকে সে তার দায়িত্ব দেয়। একদিন গদু প্রধানের হয়ে শফীর মা জয়গুন

নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেয়। জয়গুন বিরক্ত হয়। শফীর মার প্রস্তাব ঘৃণা করে প্রত্যাখান করে। দ্বিগুন বয়সী ওসমানের সঙ্গে মায়মুনের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় সুযোগ পেয়ে গদু প্রধান চাপ সৃষ্টি করে জয়গুনকে তওবা করায়। জয়গুন তওবা করে সে আর ঘর থেকে বের হবে না। মায়মুনের বিয়ের জন্য জয়গুন বাধ্য হয়ে এ তওবা মেনে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পরে মায়মুনকে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফেরত আসতে হয়, কারণ শাশুড়ির বউ পছন্দ হয়নি। মায়মুনের কোন দোষ নেই। তবে "দুই ঠ্যাং লইয়া ঢেঁকির উপরে উঠলে কথা হোনব না ঢেঁকি। দুই সের চাউলের ভাতের আঁড়ি উড়াইতে গেলে ফেলাইয়া দিব।"(সূর্য-দীঘল বাড়ী, পৃ·৭৮)। এটাই হচ্ছে শ্বাশুড়ির অভিমত। মায়মুনকে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে আসতে দেখে জয়গুন প্রথমে রাগে ফেটে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে ধমক দিয়ে, কি দোষ সে করেছে। এ সময় শফীরমাও আসে। শফীর মা বলে, শ্বশুর বাড়ীতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। মায়মুনের মুখ থেকে সমস্ত কিছু শুনে জয়গুন শুনে পেট ভরে খেতে না দেবার কাহিনীও। হাসুকে দিয়ে পুনরায় মায়মুনকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবছিল জয়গুন। কিন্তু "মায়মুনের চোখের দিকে চেয়ে দেখে জয়গুন। অসহায় চোখ দুটো টল্‌টল্ করছে, করুণা ভিক্ষা করছে তার কাছে।" (সূর্য-দীঘল বাড়ী, পৃ·৮১)। এত গুলি মুখে খাবার দেবে কে ? এরই মধ্যে কাসুও তার কাছে এসেছে। এত গুলি মুখের খাবার জোগাবে কে ? দুশ্চিন্তায় জয়গুনের ঘুম হয় না। তওবার কথা জয়গুন ভুলে যায়। সে ফড়্নার ধান কলে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। ভোর সকালে সে পথে নেমে পড়ে। ক্ষেতে কাজ করতে আসা চাষীরা তার দিকে তাকায়। গদু প্রধান ক্ষেত তদারক করছিল, সে জয়গুনকে দেখে, আপন মনে বলে, তোমাকে আমি শাসন করতে পারব না ? নিজের ক্ষমতার আত্মবিশ্বাস আপন মনে প্রকাশ করে, আমার নাম গদু প্রধান।

রাত্রে জয়গুনের ঘরে ঢিল পড়া শুরু করে। হাসু, কাসু, মায়মুন চিৎকার করে উঠে। পরে গলা দিয়ে চিৎকারও বের হয় না। ও-দিকে শফীর মারও চিৎকার শোনা যায়। পরের রাত্রেও ঢিল পড়ে। গ্রামে হৈ চৈ পড়ে যায়। ফলে "সূর্য-দীঘল বাড়ীর কাছ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

গ্রামের বুড়ো সোনাই কাজী বলে -"সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত ক্ষেপেছে, আর উপায় নাই। সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ উজাইতে পারে না, বুড়া-বুড়ীর কাছে হুনছি।

সূর্য-দীঘল হাটের উন্নতি হয় না।"(সূর্য দীঘল বাড়ী, পৃ-১৮)। জয়গুন ছেলে মেয়েদের নিয়ে রাত্রে শফীর মার ঘরে আশ্রয় নেয়। আর আল্লা, আল্লা করে। জোবেদালী ফকির তার কেরামতি সাফল্যে উৎফুল্ল হয়। কারণ এর পূর্বে ফকির বছর বছর পাহারা বদলাবার কথা বলেছিল। ফকির করিম বক্শকে জানায় যে এবার দেখুক মজা খান। করিম বক্শ একটা পিতলের কলসী দিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে ফকিরের রাগ মাটি করে। ফকির পুনরায় পাহারা বসাবার জন্য রাজী হয়, কিন্তু অমাবস্যার রাত দুপুরে তাবিজ পুঁততে হবে একা করিম বক্শকে। করিম বক্শের ভয় করে। সে ভয়ের কথা ফকিরকে বললে - ফকির মন্ত্র পড়ে করিম বক্শের বুকে ও চোখে সাতবার ফুঁ দিয়ে বলে ডরের কিছু নাই।এবার ফকিরের কথামত ঈষাণ ও বায়ু কোণে দুটি গজাল পুঁতে করিম বক্শ পশ্চিম দিকে যায়। ঘন অন্ধকার, তবুতার দৃষ্টি চলে। হঠাৎ করিম বক্শ দেখে তিনটি ছায়া-মূর্তি। করিম বক্শ একটা শব্দহীন চিৎকার দিয়ে উঠে। বার কয়েক টিপ টিপ করে তার হৃদযন্ত্রটা বন্ধ হয়ে যায়। একটা মূর্তি করিম বক্শের আরো কাছে সরে আসে। এবার করিম বক্শ ছায়ামূর্তিটাকে চিনতে পারে। হঠাৎ ঘাম দিয়ে তার ভয় কেটে যায়। সে ঝপ করে ছায়ামূর্তির হাত চেপে ধরে বলে, গদু পরধান। তোমার এই কাম !!

সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছের তলায় করিম বক্শের মৃত দেহ পড়ে থাকে। মৃতের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। আশ পাশ গ্রাম থেকে যারা দেখতে আসে, সবারই ধারণা সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত গলা টিপে মেরেছে। এরপর ঔপন্যাসিকের ভাষায় - "যে হিম্মত বুকে বেঁধে জয়গুন এতদিন সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ছিল, তা আজ খান খান হয়ে যায় এ ঘটনার পরে।

আজ বার বার করিম বক্শের কথাই মনে পড়ে জয়গুনের। বেদনায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দরদর ধারায় পানি ঝরে গাল বেয়ে। আহা বেচারা জীবনে কাউকে ভালোবাসেনি। কারো ভালোবাসা পায়ও নি সে।" (সূর্য-দীঘল বাড়ী, পৃ-১০০)।

শফীর মা গাঁটরি বোচকা বাঁধে। জয়গুন জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাবে। শফীর

নিয়ে জয়গুনও বেড়িয়ে পড়ে। চলতে চলতে জয়গুন পিছনে ফিরে তাকায়, দেখে সূর্য-দীঘল বাড়ী, দুখানা ঝুপড়ি। উঁচু তালগাছ - অনেক কালের অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী। আরো বহুদূর হাঁটার পর বিশ্রাম নেয়ার জন্য এক গাছ তলায় বসে, উঁচু তাল গাছটা দেখা যায়। এতো দূর থেকেও যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আবার তারা এগিয়ে চলে ...।

আবু ইসহাকের জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয় নারায়ণগঞ্জে।

"১৯৪৪ সালে তিনি সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকুরি নিয়ে কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জ যান। চাকুরিগত কারণে, নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রায় তাঁকে ঢাকা যেতে হতো। ঐ সময়ে ট্রেনে জয়গুনদের মতো অসংখ্য দুঃস্থ রমনীকে তিনি দেখেছেন, যারা ট্রেনে করে ময়মনসিংহ যেত। আবার সস্তায় চাল কিনে ময়মনসিংহ থেকে ফিরে আসত/... এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে এবং রেল স্টেশনে হাসুর মত অনেক নসুরবিহীন কিশোর শ্রমিকও তিনি দেখেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন প্রতিযোগিতা করে তাদের নদী সাঁতার স্টিমারে উঠে যোট বইতে। লেখক গ্রাম বাংলার ওঝা-ফকিরের ঝাড়ফুঁক ও অসহায় রমণীদের দুঃসহ জীবন সংগ্রামও দেখেছেন। লেখকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তাঁর মামাবাড়ির পাশে একটি ছাড়া ভিটে ছিল। সেই ভিটের নাম 'সূর্য দীঘল বাড়ী। সে বাড়ীতে মানুষজন স্থায়ীভাবে বাস করতে পারত না। যারা করেছে তারা সবংশে নির্মূল হয়েছে। এ রকম একটি কিংবদন্তি তিনি তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন।

ষাঠ প্রান্তরে তাঁর কিশোর জীবনের অভিজ্ঞতাও পরিণত বয়সে নারায়ণগঞ্জের রেল স্টেশনে, স্টিমার ঘাটে তাঁর সে বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতা তারই সঙ্গে ছেলেবেলায় শোনা কিংবদন্তি এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাস।"[২]

সূর্য-দীঘল বাড়ী আবু ইসহাকের প্রথম উপন্যাস হলেও 'পরিচ্ছন্ন' একটি কাহিনীর সাথে দক্ষ তাঁর চরিত্র নির্মাণ - আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। প্রায় সমালোচক অন্তত কয়েকটি চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তার মধ্যে, জয়গুন, হাসু, করিম বক্স,

জোবেদালী ফকির, গদু প্রধান উল্লেখযোগ্য।

জয়গুনের চরিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব বাংলার উপন্যাসের ইতিহাসে জয়গুনের মতো শক্তিশালী নারী চরিত্র খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে। জয়গুন একাধারে সংগ্রামী, সরল আন্তরিক। স্নেহ বৎসল, ধর্মবোধ এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তার হৃদয়ে কোমলতা কাঠিন্য, ধর্মভয় এবং ধর্ম উপেক্ষা, সমাজের ভয় এবং সমাজকে উপেক্ষা প্রভৃতি বিপরীত চরিত্রের সংমিশ্রিত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি রয়েছে।

হাসু চরিত্রাঙ্কনেও লেখকের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। মা জয়গুনের সহযোগী হয়ে তাকেও জীবন সংগ্রাম করতে হয়। অল্প বয়সেও তার মাঝে প্রাপ্ত বয়স্কের মত সচেতনতা রয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের জোহা, ভবানী ভট্টাচার্যের 'সো মেনি হাঙ্গারস' উপন্যাসের অনু কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কিশোর অপুর সাথে এ চরিত্রটির বেশ মিল রয়েছে। তবে এ চরিত্রগুলির মধ্যে হাসু জীবনের সাথে অনেক বেশী সাবলীল। পথের পাঁচালী'র অপুর জন্মও অভাবগ্রস্থ পরিবারে হলেও কিশোর অপুকে উপার্জনের জন্য জীবন সংগ্রামে নামতে হয় না। অপর দিকে 'ক্ষুধা ও আশা'র জোহা সংগ্রাম করলেও দারিদ্রকে সে খুব একটা তোয়াক্কা করে না, কিন্তু হাসু মায়ের সাথে জীবন সংগ্রাম নামক যুদ্ধের সহযোগী সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করে, প্রতি মুহূর্তে যেখানে পরাজয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

হাসু ও জোহার অল্প বয়সে শ্রম বিক্রি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে। বিশেষ করে যখন সে অল্প বয়সী কিশোরদের দেখি সমাজে শ্রম বিক্রি করতে গিয়েও নির্যাতন বা ভদ্র বেশী মানুষের রূপধারী অমানুষদের থেকে অমানবিক আচরণ পেতে। রমজান হাসুকে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা বললে টাকার কথা ভেবে সে রাজী হয় না। 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের 'জোহা' হলে সে রাজী হয়ে যেত। এখানেই জোহার সাথে তার পার্থক্য। মায়ের বেপর্দার জন্য সমাজের বিভিন্ন লোকদের মন্তব্য তাকে কষ্ট দেয়। কিশোর হয়েও সমাজটাকে সে পুরোপুরি উপলব্ধি করে।

করিম বক্‌শের চরিত্রাঙ্কণেও সাবলীলতা লক্ষ্য করি, স্ত্রীনির্যাতনকারী হওয়া সত্ত্বেও করিম বক্‌শ কিন্তু খল চরিত্রের আওতাভুক্ত হয় না। কারণ সে বদমেজাজী হলেও স্বার্থপর নয়। যদিও মন্বন্তরের সময় সে জয়গুনকে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেয়। পরে সে তার জন্য অনুতপ্ত হয়। কারণ জয়গুনের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু কমে না। যে কোনভাবে সে আবার জয়গুনকে বিয়ে করতে চায়। জয়গুনের জন্যই তার জীবন বিসর্জন দিতে হয়।

গদু প্রধান একটি শক্তিশালী খল চরিত্র। সে গ্রামের মাতব্বর। তৎকালীন গ্রাম সমাজের কিছু মাতব্বর দাপট দেখিয়ে গ্রামের সহায় সম্বলহীন মানুষদের উপর শাসনের নামে অত্যাচার চালাতো, গদু তাদের প্রতিনিধি। গ্রামে লোকে তাকে ভয় করে। ফুড কমিটির সেক্রেটারী তার হাতের লোক। গ্রামের মোল্লা মৌলবীরাও তার কথায় চলে। সে বহু নারীলিপ্সু। ঘরে তার তিন স্ত্রী বর্তমান, তবুও সে জয়গুনকে বিয়ে করতে চায়। জয়গুনকে বশ্যতা স্বীকারে ব্যর্থ হলে সে তার চরম প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ে। এ চরিত্রটির কাছাকাছি আদর্শের আর একটি চরিত্র জোবেদালী ফকির। গদু প্রধানের মতো সেও নারী-লিপ্সু। তবে গদু প্রধান যেখানে দাপট ব্যবহার করে, জোবেদালী ফকির সেখানে কৌশল অবলম্বন করে। গদু প্রধান জয়গুনকে বিয়ে করতে চায়, আর জোবেদালী ফকির জয়গুনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ভোগ করতে চায়। গদু সরকার প্রদত্ত জিনিস হস্তগত করে, সমাজের সাধারণ মানুষদের বঞ্চিতা করে, ফকির মিথ্যা ঝাড়-ফুঁক দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে চলে। ফকিরের হাতিয়ার ধর্ম, গদুর হাতিয়ার ক্ষমতা। দুটি চরিত্র সমান গুরুত্ব পাওয়াতে কোনটাই একক পরিপূর্ণ ভিলেন চরিত্র হিসাবে স্থান দখল করতে পারে না। এ ছাড়া এ দুই শক্তি অর্থাৎ ধর্মীয় শক্তি ও সামন্ত শক্তির দ্বন্দ্ব না থাকাতে উপন্যাসের এদিকটার উজ্জ্বলতা ফুটে উঠে না। জোবেদালী ফকির চরিত্রে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্‌র 'লাল সালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের অস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

রশীদ কন্ট্রাকটরও গদু প্রধানদের দলভুক্ত চরিত্র। তবে সে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ করে না বটে, যা করে তা আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার শোষকদের পদ্ধতি।

তবে উপন্যাসে তার পশুসুলভ আচরণকে আরোপিত বলে মনে হয়। হাসু ঘোট বহনের মজুরী পাঁচ আনা দাবী করলে সে যে আচরণ করে তা অবাস্তব বা 'মাত্রা-

নাটকের' স্টাইল মনে হয়। তবে সে যখন নতুন পাকিস্থানের সোয়রস পান করা সম্ভব হবে না বলে আক্ষেপ করে, তখন আমাদেরই আক্ষেপ হয়, ঔপন্যাসিক তার চরিত্রের এই দিকটার গভীরে গেলেন না কেন। শফীর মা জয়গুনের সুখ দুখের সাথী। জয়গুন চরিত্রের পরিপূর্ণতার জন্য এ সহযোগী চরিত্রটি সৃষ্টি।

দিদার বক্শ টাইপ চরিত্র। আঞ্জুমন, জরিনা বিবি প্রভৃতি চরিত্র স্বল্প পরিসরে হলেও স্পষ্ট।

এ ছাড়া কাসু, মায়মুন প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনেও ঔপন্যাসিকের দক্ষতা দেখা যায়।

জীবনে মাত্র একটি রচনা দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন ঔপন্যাসিক শিল্প সফলতা লাভ করেছেন আবু ইসহাক তাদের অন্যতম আর রচনাটি হচ্ছে 'সূর্য দীঘল বাড়ী'। উপন্যাসটি সামাজিক উপন্যাস হিসাবে অনন্য। ১৯৬২-৬৩ সালে আবু ইসহাক বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন এ উপন্যাসটির জন্যই। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন -

> "লেখক জয়গুন পরিবারের দুঃখ বেদনাকে এমন সকরুণ মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে চিত্রিত করেছেন যে পাঠক মনে তা ছাপ রেখে যায়। যদি অনুভূতি আবেগের আন্তরিকতা সাহিত্য-বিচারের মানদন্ড হয়, তবে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' সার্থক উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।" [৩]

এ উপন্যাস পঞ্চাশের মন্বন্তরকে আশ্রিত করে তার পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে। মন্বন্তরের জের টেনে টেনে মানুষ ক্লান্ত।ঔপন্যাসিকের বর্ণনাভঙ্গি এবং উদাহরণ প্রদান তুলনাহীন। ঔপন্যাসিক বলছেন - "নাবিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাঙলা তেরোশ পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষ তেরোশ পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামেনি ঘাড় বদল করেই চলেছে এক ভাবে। এ উপন্যাসের কাহিনী সুবিস্তৃত, পরিচ্ছন্ন। কোথাও জটিলতা দানা বেধে উঠেনি, লেখকের পরিমিত শিল্পবোধ প্রশংসনীয়। একটি

নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ রেখেছেন তাঁর শিল্পকে। এই পরিমিত বোধ রক্ষিত হয়নি বলেই মন্বন্তর আশ্রয়ী অনেক উপন্যাস সার্থক শিল্প হয়ে উঠেনি। পঞ্চাশের মন্বন্তর ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ অনেক বিষয়ই এ উপন্যাসে এসেছে, তবে কোথাও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়নি কোন বিষয়।

শিরীণ হক বলেছেন -

> "উপন্যাসে দু একটি ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। শচীর মার মুখে নানা গল্প কথা উপন্যাসের জন্য অপরিহার্য ছিল না। রমেশ ডাক্তারকে কেন্দ্র করে যে উপকাহিনী গড়ে উঠেছে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বলা যায়, তা অপ্রয়োজনীয় ভাবে কিছুটা দীর্ঘ ও শিথিল বিন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু এ সব শিথিলতা সত্ত্বেও বলা চলে, সূর্য দীঘল বাড়ী উপন্যাসের কাহিনী মোটামুটি ভাবে একমুখীন ও সুসংহত।" [৪]

এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আবু ইসহাক দেখিয়ে দেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের জের সেখানেই শেষ নয়, তার অভিশাপ মানুষকে বহন করতে হয়েছে আরো চার-পাঁচ বছর। হয়ত বা তাতোধিক।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। সূর্য-দীঘল বাড়ী. উপন্যাসটি মাসিক 'নওবাহার' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়. ১৯৫০-৫১ সালে। এর পর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নবযুগ প্রকাশনী কলকাতা থেকে ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়ে ঢাকা থেকে। বাংলাদেশে চতুর্দশ মুদ্রণ হয় জুলাই ১৯৯৫ সালে নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা থেকে। এ গবেষণা পত্রে উদ্ধৃতি নেয়া হল সে মুদ্রণ থেকে।

২। শিরীণ আকতার : 'বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক'. বাংলা একাডেমী ঢাকা, আষাঢ় ১৪০০, জুন ১৯৯৩, পৃ.২৬৬-৬৭।

৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি' শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.৮৫।

৪। শিরীণ হক : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.২৬৬।

ক্ষুধা ও আশা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২) রচিত 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪)[১], পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের এক সুবিস্তৃত সাহিত্যিক রূপায়ণ। এই উপন্যাসে পাই বর্তমান পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা আর তার কাছাকাছি এলাকা নরসিংদী অঞ্চলের মুসলমান কৃষক সমাজের একটি বাস্তব চিত্র। উপন্যাসটি ঘটনা ঘটে যাবার বিশ বছর পরে লেখা (১৯৬২-৬৪), যখন লেখক সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের দুঃখ ও ঘটনাবলী তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। এ সমস্তই কিশোর আজাদের চোখের সামনে ঘটেছিল।"[২]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের গ্রাসে পড়ে একটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দিচ্ছে, সে পরিবারের গ্রাম ত্যাগের বর্ণনা দিয়ে ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের শুরু।

ক্ষুধা ও আশা আলাউদ্দিন আল আজাদের একটি বর্ণনাধর্মী উপন্যাস। গ্রামে মৃত্যুর মিছিল। লেখকের ভাষায়, মৃত্যুর এমন দ্রুততার সঙ্গে গণিতের পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়। উপন্যাসের কাহিনী শুরু হচ্ছে ঘরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর ছোট বাচ্চা-টাকে পুঁতে আসার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছে গ্রামের কৃষক হানিফ। সাথে স্ত্রী ফাতেমা। তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে জহু এবং তার পিঠোপিঠি ছেলে জোহা। হানিফ প্রথমে গৃহস্থ ছিল, পরে সব খুয়ে হল কাঙলা। একদিন সোবান পণ্ডিত হানিফের স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'ছেলেটাকে একটু দেখিস্। কারণ ছেলেটার মাথা ভালো। জহুর মা ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। ছেলের জন্য প্রাণপাত খাটে। দুপয়সা বাড়তি আয়ের জন্য শরীরকে ফরসুৎ দেয়নি কিন্তু মন্বন্তরের ফলে সব আশা আজ বিলীন। ক্ষুধা স্মৃতিমাখা গ্রাম থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। পথে এক লঙ্গরখানায় অখাদ্য সরবত খায় সকলে। তারপর বিনা টিকেটে সপরিবারে ট্রেনে চড়ে সেই কাঙ্খিত স্বপ্নপুরী ঢাকা শহরে পৌঁছে। আশ্রয় নেয় ভাঙা দেয়ালের পাশে বাঁশের বেড়ার তৈরী একটি ডেরায়। তাও জবর দখল। দেখা পায় সহজীবনযোদ্ধা উসকো চুলের এক বউয়ের। শহরে এসে প্রথম ধ্বনি শুনতে পায়, শহর বহুত খারাপ জায়গা। এ কথা আগে না জানলেও এখন জানে। ফাতেমা উত্তর দেয়, কিন্তু উপায় কি, গ্রামে তো দানা পানি শেষ, গাছের পাতাও শেষ। উসকো চুলের সে কোটির অনুযোগ, ঘাস

খাই থাকলা না কেন ? ? ঘাস না পেলে ঘাটি ?

আসলে গ্রামে থাকলে ভাল থাকত, যে স্বপ্ন নিয়ে তারা পাড়ি জমিয়েছে এ অজানায় তার বাস্তবতা হচ্ছে কাজ এবং ভিক্ষা কোনটাই সুলভ নয়। বেশীর ভাগ বাসারই দরজা বন্ধ ভিক্ষুকের উৎপাতে। বাইরে কপাট খোলা দেখলে ভীড় জমায় ভিখারীরা। অনেকে ভাত চায় না সেটা অনধিকার চর্চা। চায় ফ্যান, কিন্তু গৃহস্তের কাছে তাও বিরক্তি-কর।

কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরে বার-তের বছরের কিশোর জোহা। এদিকে ফাতেমা যায় ভিক্ষা করতে আশে পাশের দু'এক বাড়িতে। এখনো পথঘাট চেনেনা তাই দূরে হারিয়ে যাবার ভয়। কিন্তু ভিক্ষের বদলে মেলে তাড়া, বকুনি। বাদশা নামের এক লোক দয়াপরবশত হয়ে তাদের তেল নুন চাল ডাল দেয়। ইচ্ছে করলে ক'দিন থাকতে বলে। তারা যখন চলে আসছে তখন লোকটি জহুকে বলে, ওপরে যাবে তুই ? টাহা দিমু। লোকটার দুরভিসন্ধি বুঝতে পারে ফাতেমা। জহুকে তখনি ডাক দেয়। সব খানে ওৎ পেতে আছে বিপদ। অবশেষে ফাতেমা একটা কাজ জোগাড় করে নেয়। ঘরে আয়াশিরি: কোন রকমে দিন কাটছে। জোহাও মুটেগিরি করে কিছু কিছু আনছে। কাজ খুঁজতে গিয়ে একদিন পথ হারিয়ে বসে হানিফ,পায় না কোন কাজ বা আশ্রয়, তার স্থলে সভ্য শহর থেকে অবাঞ্ছিত ভিক্ষুক তাড়ানোর গাড়িতে আরেকটি অজানা স্থানে স্থানান্তর মিউনিসিপ্যালটির গাড়িতে বেওয়ারিশ কুকুরের মতো। হানিফ হারিয়ে গেলে ফাতেমা বুনো ঘোষের মতো উত্তেজিত হয়ে ইচ্ছেমত মারে জহুকে। দোষ কি জহুর ? দোষ সে বাপকে বারণ করেনি পথে বেরুতে। অভিমানে ঝড় বৃষ্টির রাতে জহু গিয়ে হাজির হয় সে লোকটার ঘরে যে আগে দয়া দেখিয়েছিল, এবার অনাকাঙ্খিত লোভে অস্থির লোকটা নতুন লালশাড়ি আর মাংস পরটা খেতে দেয়। তারপর হিংস্র চোখের দৃষ্টিতে আতংকিত জহু পালিয়ে আসতে চাইলে জাপটে ধরে তার দুরভিসন্ধিটা এতদিনে সফল করে। কিশোরী জহুর শরীরটা একটা বাবার বয়সী লোকের কামনার নিষ্পেষণে বিষিয়েউঠে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাদশা তাকে চালান দেয় সীমানা শহর চাটগাঁয় দেহব্যবসার আস্তানায়। ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে গিয়ে অপরিণত বয়সের

একটি কিশোরী নির্মমভাবে শিকার হয় মানুষরূপী পশুদের দেহের ক্ষুধার। অপর দিকে হানিফ শহরের আবর্জনার মতো উচ্ছিষ্ট হয়ে শহর থেকে বিতাড়িত হলেও শেষ পর্যন্ত আবার শহরের যান্ত্রিক দানব ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়। গ্রামে এ পরিবারের সবাই ছিল সুখ দুঃখের ভাগীদার। কিন্তু শহরে এসে বাস্তুত্যাগের মতো তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে। হানিফকে হারানোর বেদনায় অস্থির ফাতেমা। তার বিশ্বাসই হয় না হানিফ মারা গেছে। অপরদিকে জহুকে খুঁজে পাবার জন্য জোহা সব প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। ফাতেমা হানিফের শেষচিহ্ন পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে গ্রামে নতুন করে জীবন আঁকড়ে ধরার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু জোহা জহুকে ছাড়া ফিরতে নারাজ। ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের হানিফ পরিবারের কাহিনী এটাই। উপন্যাসের অন্য কাহিনী হচ্ছে যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ এ সময়ের অমানবিক পরিস্থিতিতে সম্বল সভ্য এবং যান্ত্রিক কিছু মানুষের সামসাময়িক ত্রিন্যাকলাপ। উপন্যাসের এ অংশের চরিত্র সমূহ হচ্ছে, মর্তুজা চৌধুরীর মেয়ে লিনা, দেশকর্মী আলী, সুজাতা, সুজাতার বাবা অঘোর বাবু, আর ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে যাদের আলোচনায় আনা হয়েছে তারা হলেন, সোহারাওয়ার্দী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, নেতাজি সুভাষ বসু, তোজো, হিটলার। বাস্তব ইতিহাসের এ চরিত্রগুলিকে লেখক ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করে উপস্থাপন করেছেন, উপন্যাসে এদের সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য পত্রপত্রিকা থেকে সংকলিত। তবে আলোচনার সাথে উপন্যাসের ঘটনা সম্পৃক্ত হলেও চরিত্রের গতিবিধি এবং বিকাশের সাথে যথাযথ ভাবে সংযোজিত নয়। অনেকটা আরোপিত সংযোজনের মতো। ফলে চরিত্রগুলি সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য -

> "আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে মধ্যবিত্তের কোন আশার চিত্র উপস্থাপিত করেননি। অঘোর চ্যাটার্জি, লিনার বাবা আলী মর্তুজা চৌধুরীদের মতো প্রবীণরা যেমন, তেমনি নবীনরাও কেউ যথাযোগ্য ভাবে আশা ও সম্ভাবনার কোন ছবি তুলে ধরতে পারে নি। এর একটি বড় কারণ তাদের কোন নিষ্ঠা প্রত্যয় নেই। তাহাদের জীবনে দুঃসহ যন্ত্রণা নেমে এসেছে। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি কোন পথে আসবে তার কোন উল্লেখ নেই। জোহার মনে একটা ভাব-

> বাদী কল্পনাকে আশ্রয় করে তাকে লেখক আগামী দিনের আশার চিত্র বলে অভিহিত করেছেন।' জীবন্ত মাংসের গন্ধেই বুঝি শৃগালের ডাকে হিংস্র উল্লাসে ঝরে, কিন্তু আশ্চর্য কোন অজানা রহস্যে জানে না। সে এখন যেন বাঘের চেয়েও সাহসী, জননীর গায়ে গা চেপে এবং শিশুটিকে পরম যত্নে আগলে দারুণ শীতে অন্ধকারে বসে থাকে। ভোরের প্রতীক্ষায়' (ক্ষুধা ও আশা, পৃ-২৪১)। অমন সাহস জোহা কেমন করে পেল, কেন পেল, আর কতক্ষণইবা তার ঐ সাহস বজায় থাকবে তার বিশ্লেষণ নেই। সাহিত্যে সাংকেতিক ব্যঞ্জনা অবশ্যই একটি গুণ, কিন্তু সাংকেতিকতা চরিত্রের মাধ্যমে আনলে তার সার্থকতা কোথায় ?" [৩]

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের পটভূমি সম্পূর্ণভাবে মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে। ইতিহাস এবং নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে মন্বন্তর নামক একটি নির্দিষ্ট বিষয় যে বার বার ঘুরে ফিরে কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশের বা শেষের দিকে সুজাতা, আলী এবং লিনার ত্রিমুখী প্রেমের কাহিনী এবং যে পরিণতি এসেছে তা সিনেমাটিক। তরুণ দেশকর্মী মোহাম্মদ আলী মুসলমান হয়ে অনুরক্ত হয় হিন্দু বন্ধু অরুণের ভগ্নী সুজাতার প্রতি। সুজাতার বাবা মা আলী ভালোছেলে হিসাবে মেয়ের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়েছেন। মেয়ে যখন আলীর প্রতি প্রচন্ড দুর্বল তখন বাবা অঘোরবাবু সমাজ, ধর্ম, কুল এবং দেশগত পার্থক্য হচ্ছে এ বিষয় বড়ো করে দেখে মেয়েকে ত্যাগ করার জন্য আলীর কাছে অনুরোধ করলেন। স্নেহপ্রবণ বন্ধু পিতার এই আবেদন আলী মহত্বতা দেখিয়ে গ্রহণ করে। অপরদিকে সুজাতার প্রেমে অন্ধ আলী লিনাকে অবজ্ঞা করে আসে। লিনার বাবা এক ধনকুবের রাজনৈতিক নেতার ছেলের সাথে লিনার বিয়ে দিলেও লিনা আলীর ভালোবাসা হারানোর বেদনায় দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারে না। আলীর উপর অভিমান করে লিনা কাশেমের সাথে বিয়েতে রাজী হলেও বিয়ের পর পরই আত্মহত্যা করে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সুজাতা বাবার আদেশ অবজ্ঞা করে শেষ বারের মতো আলীর কাছে ফিরতে চাইলেও আলী অসম্মতি জানায়। এক শোচনীয় পরিণতি দিয়ে শেষ হয় এ ত্রিমুখী প্রেমকাহিনী।

লিনা আত্মহত্যা করে, সুজাতা ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকে আর দেশ প্রেমিক আলী ডুখাযিছিল সংগঠিত করার জন্য পথসভার সময় গ্রেপ্তার হয়। রাজনৈতিক কারণে আলীর এই গ্রেপ্তার অনেকটা শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক'এর নায়ক জাহেদের গ্রেপ্তার হওয়ার মতো হলেও একটা বড় পার্থক্য এখানে রয়েছে। জাহেদ রাজনৈতিক দলের নিষিদ্ধ কর্মী হয়ে যে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিল 'ক্ষুধা ও আশা'র আলীর তা ছিল না। তার রাজনৈতিক ভূমিকা জাহেদের তুলনায় অনেক ম্লান। পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় জাহেদ রুমাল উড়িয়ে বলে 'আমি আসব। আমি আবার ফিরে আসব।' জাহেদের এই ফিরে আসার প্রতীকী ইঙ্গিত রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রতীক। কিন্তু 'ক্ষুধা ও আশা'র আলী তার গ্রেপ্তার হবার কথা অরুণকে' বলে যায় লিনার মাকে জানাতে। চরিত্রটির এখানে নায়কোচিত গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 'ক্ষুধা ও আশা'র শৈল্পিক ত্রুটির চেয়ে বিষয়গত ত্রুটি হচ্ছে এ উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্রগুলি দুটি পর্বে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। হানিফ পরিবারের কাহিনী দিয়ে যে ভাবে উপন্যাসটি শুরু হয়েছিল সেভাবে হানিফ পরিবারের কাহিনী এবং তার সম্পৃক্ত চরিত্রসমূহ দিয়ে এ উপন্যাস শেষ হলে উপন্যাসটির আকর্ষণীয় একটি 'পরিচ্ছন্নতা' থাকতো। কিন্তু মন্বন্তরের স্বেচ্ছাসেবক আলীর ত্রিমুখী প্রেম এবং নগর ঢাকায় মন্বন্তরকালীন চিত্র অন্য একটি পরিপূর্ণ উপন্যাসের মত ঠেকে। যেন মন্বন্তর চিত্রের দুটো উপন্যাস সংযোজনের মাধ্যমে এক করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেখা যায় এ উপন্যাসে আলী চরিত্রের চেয়ে জোহা চরিত্র অনেক বেশী উজ্জ্বল। যদিও বেশী পরিপক্ক তার ইংরেজী জ্ঞান, অতি ডানপিটে স্বভাব, দূরদর্শনা, ট্রেনের কামরায় গোরা সৈন্যের সাথে আচরণ, বোনকে খোঁজা, এসব কিছুটা অবাস্তবতার দোষে আক্রান্ত। একইভাবে ইন্জিনল চরিত্রেরও উদাহরণ দেয়া যায়। সে দিক থেকে হানিফ, জহু এবং ফাতেমা চরিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত। ভাগ্য এবং পরিস্থিতির নির্মম শিকার এসব চরিত্র ইতিহাসের ঘটনার সাথে গা এলিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি।

'ক্ষুধা ও আশা'র চরিত্র চিত্রণ সম্পর্কে বলা যায় ঔপন্যাসিক বেশ কিছু সার্থক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। সংশপ্তকের মতো এখানেও প্রায় চরিত্র তাদের

পারিপার্শ্বের প্রতিনিধিমূলক। জোহা, জহু, হানিফ, ফাতেমা, আলী মর্তুজা চৌধুরী, লিনা, আলী – কাসেম প্রত্যেকে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে তাদের শ্রেণী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রথমে আলোচনা করা যায় জোহা চরিত্রটি নিয়ে। জোহা একটি গ্রাম্য বালক। সোবান পণ্ডিত একদিন বলেছিল, ছেলেটির মাথা ভালো। হয়তো একদিন জিনিয়াস কিছু হবে এ স্বপ্নে বিভোর মা ছেলের জন্য প্রাণপণ খেটে চলে। একদিন ছেলে হয়তো তাদের দারিদ্র, যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু মন্বন্তর সব আশা মিটিয়ে দেয়। মুখের অন্ন জোগাড় যেখানে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে ছেলেকে স্কুলে দেয়াটা উচ্চাশা। জোহাকে শুরু থেকে দেখি প্রখর বুদ্ধিমান, বয়সের তুলনায় অনেক বেশী পরিপক্ক, দূরন্তর। সে গ্রাম থেকে শহরে এসে অনায়াসে নিজের একটা অবস্থান পাকাপোক্ত করে নেয়। সীমান্ত শহর চাঁটগা পর্যন্ত যায় বোনকে খুঁজতে। জহুর জন্য তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। মায়ের ভালোবাসার চেয়েও বেশী। ফাতেমা পেটের ছেলেটি এবং জোহাকে নিয়ে গ্রামে পুনরায় পুর্নবাসিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করলে জোহা গ্রামে না ফিরে বোনের খোঁজ নেয়াটাকে প্রধান দায়িত্ব মনে করে। অবশেষে সে চাঁটগাঁ যায়। সেখানে সে লাভ করে এক অভিজ্ঞতা। যুদ্ধ সীমান্ত চাটগাঁতে তখন গিজগিজ করছে সৈন্য। রাত নিস্প্রদীপ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলতে হয় পথ। জানে অবস্থার খপ্পরে পড়ে বোন ও তার আজ অন্ধকারের যাত্রী। এখানে ওখানে অনেক ছাউনী। এসব ছাউনীতে প্রতীক্ষারত সৈনিকদের জন্য চাই খাদ্য, দৈহিক খাদ্য। এক জাতের কন্টাকটর সে খাদ্য সরবরাহ করে দিনের বেলা। রাতের বেলা সরবরাহ করে অন্য জাতের কন্টাকটর, উভয়ে রাতারাতি লাল। নতুন কড়কড়ে নোটের তাড়ায় উভয়ের পকেট তখন ফুলে কোলা ব্যাঙ। এসব জোহার শোনা ছিল, তাই বোনের তালাসে সে এসেছে এ নিস্প্রদীপ শহরে, যেখানে মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে পদে পদে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অন্ধকার পথে জোহা শুনতে পায় নারী কণ্ঠের আকুল আবেদন - আমারে লইয়া যাও, হাসপাতালে লইয়া যাও। জোহা মেয়েটির দিকে সাহসে হাত বাড়ায়। হাত লাগে ছেড়া কাপড়ে আংশিক আবৃত পেটের উপর। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে মেয়েটি গর্ভবতী। প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। অবশেষে আবুল মজলের ভাষায় -

"এ ভাবে লাঞ্ছিত যুগের এক লাঞ্ছিতা জননীর গর্ভ বিদীর্ণ করে জন্ম
নিলো এক মানব শিশু- যে মানব শিশুকে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে
আশরাফুল মাখলুকাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। অভিহিত করা হয়েছে
'অমৃতস্য' পুত্র বলে। হয়তো এ সত্য, হয়তো জীবন সবচেয়ে
পবিত্র, হয়তো এও এক সূর্য,লাঞ্ছনা আর গ্লানির তিমির গর্ভে
যার জন্ম। দীর্ঘ দশ মাস ধরে যে ঘৃণা আর লাঞ্ছনা গ্লানির
বিষ বীজ সে নিজের দেহাভ্যন্তরে বহন করে ফিরেছে আজ
তার হাত থেকে পরিত্রাণ মুহূর্তে ধর্ষিতা জননী বিড়বিড় করে
শুধু শুধালো : কুত্তার বাচ্চা অইচে ? ... এতো একটা জননীর
নয় উপন্যাস বর্ণিত যুগটারই প্রতিধ্বনি, মর্মভেদী ঘৃণার এক
অতুলনীয় অভিব্যক্তি।" [৪]

বস্তুত সমগ্র উপন্যাসে জোহার সকল কাজে দায়িত্ববোধ একজন পরিপক্ব পুরুষের মত তের চৌদ্দ বছরের একজন বুদ্ধিমান সচেতন মেধাবী ছেলে যা করতে পারে জোহা তার চেয়েও বেশী করেছে। তাই চরিত্রটিকে অনেক সময় মনে হয় অতিচিত্রণ।

হানিফ অর্থনৈতিক গ্রামীণ সভ্যতার সহজ সরল কৃষকের প্রতিনিধি। যে সব কাজ করতে পারে বলে দৃঢ় সংকল্প রাখে, কিন্তু চুরির কথায় পিছপা হয়। হানিফ গ্রাম থেকে এমন এক সভ্যতার পরিবেশে আগন্তুক যেখানকার জটিলতার সাথে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না। গ্রামের মেলে আসা পৌঢ়দের সে আর পাচ্ছেনা সান্নিধ্য। তাই বস্তির পোলাপানের সাথে সে মিশেছে তাদের হয়ে। বস্তির লালু তাকে নিয়ে রসিকতা করলে সেও তাকে আদিম রসিকতা নিয়ে বলে, তোর মতো কত পোলা আমার গামছা ধুগাইছে। কিংবা বিড়ি চায় তাদের কাছে। বস্তির ইচড়ে পাকা ছোকরা লালু তার মেয়ে জহুকে নিয়ে কুমন্তব্য করলে সে রুদ্র প্রতিবাদের পরিবর্তে কিশোর-সুলভ ছলে এর প্রত্যুত্তর দেয়। সে অনায়াসে অনুভব করেছে পারিপার্শ্বিকতা।এটা তার সে গ্রাম সমাজ নয়, যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠদের আলাদা সম্মান রয়েছে। বৃদ্ধ পিতার এখানে মেয়েকে অসহায়ের মতো আগলে রাখা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এর আগে দিও হানিফ জহুকে বেশ্যা বানাবার জন্য মেয়ে ব্যবসায়ীর হাতে বিক্রি করতে চেয়েছে, তখন তার কোন উপায়ান্তর না দেখে। সেখানে তার স্বার্থের চেয়ে মেয়ের স্বার্থটা বড়ো। মেয়ে

দুটো খেয়ে পরে বাঁচবে, তার জন্য যদি দেহ ব্যবসায়ীর হাতে যায় তবু মন্দ কি ? মন্বন্তরের বিক্ষিপ্ত ঘটনা হানিফকে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ করে তুলে। সে চাকরির জন্য চেষ্টা করে। পথ হারিয়ে শহর থেকে মিউনিসিপ্যালটি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হলেও সে আবার ফিরে আসে। নিজের মাঝে হানিফের অন্তর্দ্বন্দ্ব, হতাশা, অন্তর্মুখীনতা, অভাবিত ঘটনা-বলী তাকে বেতুল মোহবিষ্ট চৈতন্যহীন করে তুলে, বেঁচে থাকার জন্য সে পালিয়ে এসেছিল শহরে। তার পরিণতি ঘটেছে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে।

জহু এক নিষ্পাপ কিশোরী। গ্রামের মাটির সাথে যার ছিল গাঢ় সম্পর্ক। কৃষক পিতা কিংবা দুঃখিনী মার সে খুব কমই অবাধ্য হয়েছে। হানিফ ঘর থেকে নিখোঁজ হলে ফাতেমা জহুকে ইচ্ছে মত মারে। কিন্তু জহু যখন এতে নিজের কোন দোষ খুঁজে পায়না, তখন যে অভিমান করে দয়াবান বাদশার কাছে আশ্রয় নিতে যায়। সে তার বুদ্ধি এবং বিশ্বাস দিয়ে মনে করে বাবার বয়সী এই লোকটা কি আর করবে ? বড়জোর হাত ধরে একটু সোহাগ। কিন্তু আপাত দয়ালু এই লোকটার আড়ালে যে এতো নিষ্ঠুর ক্রূরতা লুকিয়েছিলো সে কী জহু জানতো ? লোকটি শুধু তাকে বলাৎকার করেনি, তাকে তুলে দিয়েছে সীমান্তের সৈন্যদের ক্ষুধা মিটাতে। জহু বাবা, মা, ভাইকে হারিয়েছে, হারিয়েছে তার বস্তির সমাজ এবং নিষ্পেষিত হয়েছে দানবের মতো মানুষের উদ্যত ছোবলের। তার এ ট্রাজেডির মূল হোতা বাদশা। অপাপবিদ্ধ জোহা পরিস্থিতির শিকার হয়ে সৃষ্ট বারবনিতায় পরিণত হয়। তার এই পরিবর্তন তার মানসিক উত্তরণ ঘটায়।

'ক্ষুধা ও আশা'র নায়ক আলী একটি অস্পষ্ট চরিত্র। আদর্শবাদী নায়ক হিসাবে ঔপন্যাসিক তাকে যতটুকু উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন মূলত চরিত্রটি ততটুকু বিকাশ লাভ করেনি। এক ত্রিমুখী প্রেমের জালে আবদ্ধ নায়ক জাল ছিঁড়ে বেরুতে গিয়ে নিজেকে করেছে ক্ষত বিক্ষত। কোন পরিণতিই তাকে সত্যিকার নায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারেনি। লিনার চেয়ে সুজাতার প্রতি তার দুর্বলতা বেশী হলেও সুজাতার বাবার কথায় সে সুজাতাকে তার প্রেম থেকে মুক্তি দেয়, প্রেমিক হিসাবে তার আচরণ নায়কোচিত গুণে সমৃদ্ধ নয় । অপরদিকে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেও তাকে শক্তিশালী কোন চরিত্র হিসাবে মনে হয় না। উপন্যাসের শেষে তার গ্রেপ্তার হওয়া নিছক একটা

সাদামাটা ঘটনার মত। দুর্ভিক্ষের ভুখাদের সংগঠিত কাজের জন্য তার সক্রিয়তা তাকে মানবতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করলেও যে উদ্দেশ্যমুখীনতা নিয়ে ঔপন্যাসিক তাকে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যমুখিনতা আমাদের যতটুকু চোখে পড়ে তার আদর্শ ততটুকু চোখে পড়ে না। মূলত ঔপন্যাসিক কিশোর নায়ক জোহা এবং আলী এ দুটি চরিত্রের কোনটিকে একক কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে দৃষ্টিক্ষেপ করাতে ব্যর্থ হওয়াতে উপন্যাসটির প্রাণময়তা কমেছে। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ এবং এ দুয়ের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও যে মানুষের আশা তাকে প্রাধান্য দিয়ে যেমন উপন্যাসের নামকরণ করেছেন, তেমনি দেখা যায়, উপন্যাসটি যতটুকু বক্তব্য এবং ঘটনাধর্মী ততটুকু চরিত্রধর্মী নয়। আলাউদ্দিন আল আজাদ বিষয়ের প্রয়োজনে যে অসংখ্য চরিত্রের জোয়ার এনেছেন তার কোনটাই উপন্যাসের একক নায়ক হিসাবে আমাদের দৃষ্টি কাড়তে পারেনি। সমাজের অভিজাত শ্রেণীর যে সমস্ত চরিত্র এ উপন্যাসে এসেছে তার কোনটাই পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ করেনি।

লিনা এ উপন্যাসের নায়িকা। এক তথাকথিত অভিজাত বংশে তার জন্ম হলেও সে ছিল সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদের বলি। শুধুমাত্র অর্থ এবং ক্ষমতার লোভে তার পিতা তাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে তার প্রেমকে নিষ্পেষণ করেছে। লিনা ধনাঢ্য স্বামীর কাছে চেষ্টা করেও সুখী হতে পারেনি। এ চরিত্রটির প্রসঙ্গে 'সংশপ্তক' উপন্যাসের বাবু চরিত্রের কথা মনে পড়ে। বাবুর বাবা তের চৌদ্দ বছরের বাবুকে তুলে দিয়েছিল তার পীর, প্রৌঢ়, তিন স্ত্রীর খসম, মোজাদ্দেদী সাহেবের কাছে। বাবুর বাবা ছিল ধর্মীয় মোহাচ্ছন্ন। তার পীর মোজাদ্দেদী সাহেবের প্রতি তার নেতৃত্ব-রক্তভার কাছে মেয়ের স্বপ্নের কোন মূল্যই রইল না। এমনিভাবে 'ক্ষুধা ও আশা'তেও আলী মুর্তজা চৌধুরীর রাজনৈতিক পীর ছিল হাসেম সাহেব। হাসেম সাহেব লিনার বাবার বন্ধু বলে রেজা একদিন লিনাকে বলেছিল, কিন্তু বাস্তবিক সম্পর্ক ছিল রাজনৈতিক পীর মুরিদের। লিনাকে এক রকম বাধ্য হয়ে হাসেম সাহেবের ছেলে কাসেমের মতো অযোগ্য আলালের ঘরের দুলালের জীবনসঙ্গী হতে হয়। কাসেমের মতো ধনকুবের পাত্রের চেয়ে আলীর মত সুপাত্রের প্রতি লিনার আকর্ষণ অনেক বেশী ছিল বলে লিনা

সাংসারিক জীবনে অতৃপ্ত হয়। এবং আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সে তার জীবনের চাওয়া পাওয়ার সমাধান করে। কিন্তু লিনার জীবনের ট্রাজেডিকে কখনো এমন পর্যায়ে মনে হয় না আত্মহত্যা যেখানে জরুরী। মূলত মৃত্যুর প্রতি লিনার যৌন একটা আকর্ষণ সব সময় ছিল। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলার' নায়িকা কপালকুণ্ডলার মত তার অস্থিরতা, অতৃপ্ততা তাকে পৃথিবী এবং জীবনের প্রতি আকর্ষণহীন করেছে। লিনা রেজাকে বলে, " তুমি মিনিস্টার না হলে হবে কে ? তখন গাড়ী দাও বা না দাও এক জোড়া শাড়ি নিশ্চয় দেবে। কিন্তু তদ্দিন আমি থাকবো কি ?"

'কেন অমন কথা বলচিস্ ?'

'কি জানি আমার মনে হয় আমি খুব বেশিদিন বাঁচবো না'(ক্ষুধা ও আশা, পৃ-১৪৩)।

ফাতেমা হানিফের স্ত্রী। জোহা-জহুর মা। ছেলে জোহার প্রতি তার ভালবাসা লক্ষণীয়। জোহাকে শিক্ষিত করার জন্য সে প্রাণপণ খেটে যায়। বাড়তি কিছু রোজগারের জন্য অনেক প্রচেষ্টা করে। গ্রামের এই কিষাণী বধূ শহরে এসে ঠিক তেমনি খেটে চলে। ফাতেমার উপার্জনেই বলতে গেলে হানিফ পরিবারটি শহরে প্রথম বাঁচার অবলম্বন পায়। গ্রামের চিরন্তনী নারীমূর্তি ফাতেমা। সে পরিবারের জন্য গৃহকর্ত্রীর কাছে থেকে খাবার চেয়ে আনে, যদিও এর জন্য সে প্রতিনিয়ত বকুনি খায়। স্বামীর ভালোবাসা তাকে একজন শক্তিশালী জীবন সংগ্রামী নারীতে পরিণত করেছে। মেয়ে জহুর প্রতি তার ভালোবাসা একটু কম হলেও ছেলে জোহা এবং স্বামী হানিফের জন্য তার সব সময় উৎকণ্ঠা উদগ্রীব এবং চিন্তিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। হানিফ হারিয়ে গেলে ফাতেমা উন্মাদের মতো হয়ে উঠে। জহুকে ইচ্ছে মত মারে। একবার জোহা ঘরে না ফিরলে সে জোহাকে খুঁজতে বের হয়। তার জন্যও সে হন্যে হয়ে উঠে সমস্ত পরিবারটাকে আগলে রাখার সকল দায়িত্ব যেন তার। হানিফের প্রতি তার আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ লক্ষণীয়। যেমন - "অনেক বেলা হল, ইতিমধ্যে মানুষটা নিশ্চয়ই খুঁজতে শুরু করেছে। যেন তারই সব দায়। অদ্ভুত দাবী, অদ্ভুত অভিমান, সব জোগাড় করা আবার রাত্রে সঙ্গে শোয়া। একটু এদিক ওদিক হওয়ার জো নেই। নিমেষে তেজিয়ান হয়ে ওঠে। যেন নবাব বাদশা, কত দাপট। তবু ঘরেই যে মাকড়শার মতো

বসে থাকে এ মন্দের ভালো। কারণ একবার বাইরে বেরুলে পথ চিনে ফিরে আসতে পারবেনা।" (ক্ষুধা ও আশা, পৃ.৮৩-৮৪)।

আলী মুর্তজা চৌধুরীর ছেলে রেজা এ উপন্যাসে একটি শক্তি-শালী পার্শ্বচরিত্র। আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িকভাবে সে সচেতন। সারা দেশ জুড়ে যখন ভাঙন চলছে তখন সে স্বপ্ন দেখছে মন্ত্রী হবার। যদিও মন্ত্রী হবার ক্ষীণ আশা বা যোগসূত্র তার রয়েছে। আলী মুর্তজা চৌধুরীর মতো সমাজের মূল্যবোধহীন লোকের আদর্শে লালিত রেজা পারিবারিক গন্ডির শেকল ছিঁড়ে বের হতে পারেনি, তাই বোনের অযোগ্য পাত্র কাসেমের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তার পূর্ণ সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। আবার উচ্চা-কাঙ্খী রেজা বোনকে বলে, "দেখিস আমি মি-মিনিস্টার হব। তখন তোকে ভালো গাড়ি প্রেজেন্ট করব। গা-গাড়িতে চড়ে হাই স্পীডে তোর বে-বেড়াবার শখ আমি-মি-মিটাবই।"(ক্ষুধা ও আশা, পৃ.১৪৩)।

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক নিয়েও তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিচ্ছন্ন। তাই তাকে বলতে শুনি "আসলে ইন্ডিয়ার সংকট ইন্ডিয়া ও বি-ব্রিটিশের মধ্যে ততটা নয় - যতটা আছে হি-হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে। পাকিস্তান -সু-স্বাধিকার করে না লওয়া পর্যন্ত কোন নি-নিষ্পত্তি হতে পারে না। হ-হবেও না। একটি না শাসনতন্ত্র -র-রচনার দুটি পরিষদ চাই - একটি পরিষদ হি-হিন্দুস্থানের কনষ্টিটিউশন প্রনয়ণ ও গ্রহণ করবে - আর একটি পরিষদ রচনা করবে পা-পাকিস্তানের কনষ্টিটিউশন -দ-দশ মিনিটে আমরা ই-ইন্ডিয়ার প্রোবলেম সলভ করে -ফে-ফেলতি পারি যদি -গা-গান্ধী বলতে পারেন পা-পাকিস্তান হবে। এই কথা আমি -মে-মেনে নিচ্ছি।" (ক্ষুধা ও আশা, পৃ.১৪২)।রেজাকে এখানে কট্টর সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থবোধে আবদ্ধ বলা যায় না। কারণ তাকে এর ব্যাখ্যা দিতে শোনা যায় - "আমাদের বাচতে হবে। -অ-অনেক দিন বাঁচতে হবে। কেন বুঝতে পারছিস ? -আ-আমরা একটা নতুন দেশ নতুন রাষ্ট্র, -গ-গড়তে যাচ্ছি। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ইন্ডিয়ার যুগ যুগ ধরে নি-নিপীড়িত শো-শোষিত, অবদমিত জাতি উপজাতিদের নিকট অপরিসীম। একে -আ-আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য দ-দরকার হলে সর্বস্ব বি-বিসর্জন দিতে হবে। বু-বুঝলি ?" (ক্ষুধা ও আশা, পৃ.১৪৩)।

ক্ষুধা ও আশা'র একটি বিশেষ চরিত্র দরবেশ চাচা। দরবেশ চাচা লোককে শুনিয়েছে মরমী গীতি, মারফতী, বাউল বিচ্ছেদ। দরবেশ চাচা গ্রাম্য লোকজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মন্বন্তরের গ্রাসে পড়ে দরবেশ চাচার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে গ্রামের ক্ষীণ সংস্কৃতিরও মৃত্যু ঘটে।

যখন মৃত্যু আর অভাবের ঘা খেয়ে খেয়ে মানুষ আজ হৃদয়হীন পাষাণে পরিণত যখন বাপ মরলেও কেউ কাঁদে না।সেসময় দরবেশ চাচার মৃত্যুতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল। গ্রামবাসী যেন জমিয়ে রেখেছিল কিছু কান্না তার জন্য।

সুজাতা ত্রিমুখী প্রেম কাহিনীর একটি পরিপূরক চরিত্র। সে ধর্ম, সমাজ, দেশগত প্রভেদ না মেনে আলীর প্রতি মোহগ্রস্থ হয়। তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আলী লিনাকে বাদ দিয়ে তাকে বিয়ে করার কথা ভাবে। সুজাতা প্রেমে সাহসী একটা ভূমিকা রাখে, পিতার অবাধ্য হয়ে সে আলীকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু আলী তাতে রাজী হয় না।

ভূগোল আপা বাংলা সাহিত্যের চিরন্তনী সেই নারী চরিত্র যে মহিমাময় নারীরা নিজেদের জ্বালিয়ে আলোকিত করেছে তার প্রিয়জনদের, ভূগোল আপা পরিবারের জন্যে আত্মত্যাগের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার আত্মহননের প্রতি পাঠকের চরম সহানুভূতি আসে।

পাগলা মাস্টার একটি প্রতীকী চরিত্র। সব জ্বালা যন্ত্রণার পাগলা মাস্টার দার্শনিক সুলভ একটি সান্ত্বনা দেয়। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য চরিত্রসমূহ হচ্ছে মুন্সি, কাশেম মিয়া, বাদশা, হাসেম সাহেব ইত্যাদি আর শিশু চরিত্র হচ্ছে ইস্কিল, মিঠু। অন্যান্য চরিত্র হচ্ছে অঘোর বাবু, হোসেন ইত্যাদি। এই চরিত্রগুলি স্বল্প পরিসরে হলেও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

"যুদ্ধ,দুর্ভিক্ষ, মুষ্টিমেয় মানুষের রাজনৈতিক সুবিধা, স্বল্পসংখ্যকের
স্বাধীনতার স্বপ্ন, প্রাক্ পাকিস্তান যুগে গোটা বাংলাদেশের এ
এক অদ্ভুত আর অভূতপূর্ব পটভূমি। এ পটভূমিতে মানুষ নেমে

> গিয়েছিল অমানুষের ভূমিকায়। নিঃসন্দেহে সচেতন বিষয়বস্তু। বিশেষ করে ঔপন্যাসিকের পক্ষে। অনেকে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার যে করে নি তা নয়। তবে কালগত নৈকট্যের জন্য কোন কোন শক্তিমান লেখকের পক্ষেও নির্লিপ্ত শিল্পী দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর হয়নি। ফলে তখনকার অনেক লেখাই সাংবাদিকতার পর্যায়ে নেমে গেছে পরিমিত বোধের অভাবে। অসাধারণ লিপি কুশলতা সত্ত্বেও কোন কোন রচনা হয়ে পড়েছে প্রচার ধর্মী আর তার বক্তব্য অকারণে উচ্চ রোল ?" [৫]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কোন কোন উপন্যাস প্রসঙ্গে আবুল ফজলের এ উক্তিটা প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু 'ক্ষুধা ও আশা' এদিক থেকে সম্পূর্ণ শিল্পকুশল রচনা। আমরা শিল্পীকে এখানে দেখি নির্লোভ, নির্লিপ্ত।

> "যুদ্ধের নির্মম থাবায় মানুষের শোচনীয় অধঃপতন, সমাজের সার্বিক ভাঙন, আর নৈতিক বোধের চরম দুর্গতি, মনে হয় নিখুঁত করে তিনি এঁকে রেখেছিলেন তার মনের পটে। দীর্ঘকাল পরে, সমস্ত ঘটনাপঞ্জীকে আত্মস্থ করে গ্রহণ বর্জনের শৈল্পিক চেতনা দিয়ে পরে পড়ে তুলেছেন এ উপন্যাসের উপকরণ আর কাঠামো।" [৬]

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার উপন্যাসের ধারায় আলাউদ্দিন আল আজাদের ক্ষুধা ও আশা বিশিষ্ট আঙ্গিক এবং পটভূমিকার দাবিদার। এই পটভূমিকা গ্রাম এবং নগরের মূলে বিস্তৃত। একদিকে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত হানিফ পরিবারের মর্মন্তুদ কাহিনী গীতি-কবিতার মত ব্যক্তি-মন-ত্রণা হয়ে শতরূপে প্রকাশ পেয়েছে। অপর দিকে যুদ্ধের বাজারে নতুন গজিয়ে উঠা বিত্তবানদের সভ্যতার বুটের তলায় দুমড়ে যায় সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আশা। অর্থলোভী মানুষের লিপ্সার শিকার হয়ে ধুঁকে ধুঁকে নিঃস্ব হচ্ছে তারা। যেন এক মহাকাব্যিক কাহিনী ক্ষুধা ও আশা । ক্ষুধা ও আশার অন্যতম বিশিষ্টতা তার ভাষার। বাক্যগঠন এবং পরিবেশ বৈচিত্র্যে এ উপন্যাসকে সুকীয়তা দান করেছে। আঞ্চলিক বুলির এবং বিদেশী শব্দের প্রয়োগ এ উপন্যাসকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। তবে আঞ্চলিক ভাষার অতিরিক্ত প্রয়োগ ভাষাকে অনেক সময় দুর্বোধ্য

করে তোলে। 'ক্ষুধা ও আশা' সম্পর্কেও অভিযোগ রয়েছে ,সমালোচকের ভাষায় -

"... আমাদের অনেক উপন্যাসেই আঞ্চলিক শব্দ আর বাগভঙ্গি ব্যবহারের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। অসংখ্য আঞ্চলিক কথ্য ভাষার দেশ পূর্ব পাকিস্তানের পাঠককুল তার ফলে রীতিমতো বিভ্রান্ত আর বিপন্ন। 'সত্য মিথ্যা' 'সংশপ্তক' 'হাজার বছর ধরে', 'অনেক সূর্যের আশা' এবং 'ক্ষুধা ও আশা'র লেখকরা ভুলে গেছেন যে, তাদের রচনায় আঞ্চলিক শব্দের মুহুর্মুহু প্রয়োগ অপরিহার্য ছিল না এবং সে শব্দের প্রয়োগ তাদের সাফল্য যেমনি হোক না কেন, অসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পাঠকজনের কাছে তা রস গ্রহণের পথে অকারণ বাধা"।[৭]

কিন্তু আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেন -

"লোক চরিত্রের মুখে লোক ভাষার ব্যবহার কালিদাসের আমল থেকেই প্রচলিত। আধুনিক কালে এর জের চলছে, যেজন্য 'নীল দর্পণ' কি 'পটল ডাঙার পাঁচালী', 'পদ্মা নদীর মাঝি' কি 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় আমরা প্রকৃত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। এবং মনে হয় চরিত্রকে অধিকতর 'স্বাভাবিক' করার তাগিদ থেকেই এই রীতির জন্ম। ... চরিত্রকে 'স্বাভাবিক' করার চেষ্টায় আমি ... আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করি নি। চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন, তেমনি ভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি মাত্র। ... সকল পাঠককে এই সংলাপের প্রতিটি কথা বুঝতে হবে এমন কোন কথা নেই : এর আবহটুকুন অধিকাংশের মনে এলেই যথেষ্ট।"[৮]

স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার যে কয়টি উপন্যাস লেখা হয়েছে ক্ষুধা ও আশা নিঃসন্দেহে তাতে এক বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে। পরিধি, গঠনকৌশল আর ভাষা প্রয়োগের দিক থেকে এর জুড়ি নেই। তবে ক্ষুধা ও আশা র প্রতিটি চরিত্র যে কাহিনীর সাথে

সম্পর্কিত হয়ে সমান্তরাল ভাবে ফুটে উঠেনি তা পাঠক মাত্রেই অনুভব করবেন। যতীন্দ্রনাথ সরকারের ভাষায় -

> "যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত জোহা পরিবারের মর্মান্তুদ পরিণামের কাহিনী এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। এ উপন্যাসে সব কটি চরিত্র চিত্রনে লেখক সমান দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি, তবু এ উপন্যাসে সে জীবন বোধের এমন একটি ব্যপ্তি আমরা লক্ষ করি যাতে সমস্ত মূল্যবোধের ভাঙনের মধ্য দিয়েও সংগ্রামী মানবতার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠে।" [১]

নাজমা জেসমিন এ উপন্যাসের অসামঞ্জস্যতাকে সমালোচনা করে বলেন -

> "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে দুঃসহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা তিনি চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তিনি 'উদ্ঘোটিত করেন নি' সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা জোহার মত দরিদ্র কিশোরের দৃষ্টিতে মধ্যবিত্তকে দেখেও কোন শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা তিনি বলেননি। এমন কোন কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অভাবে গ্রন্থটি সার্থক হয়নি। ক্ষুধা ও আশার মধ্যবর্তী স্তরের নাম হচ্ছে সংগ্রাম। ক্ষুধা থেকে উত্তরণের পথটা সংগ্রামে। খোলাখুলি ভাবে বললে শ্রেণী সংগ্রামের - ... এমন কথা —
>
> —তার মধ্যবিত্ত নায়ক মোহাম্মদ আলী ইঙ্গিতে বললেও অমন বিচ্ছিন্ন কথাতে উপন্যাসের মূল বক্তব্য অর্থাৎ আশার কথা নয়। 'যদিও সাম্যতবাদী মানসিকতা সম্পন্ন নন, তথাপি তিনি ভাবেন এই স্বার্থে যে তার আশার চিত্রটা ভাববাদীদের আশার মতই যতটা অবাস্তব ঠিক ততটাই কল্পনানির্ভর। লিনার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে একটা ভাবাবেগ এমন না হলে তিনি সৃষ্ট করতেন না। 'প্রেমমূলক উপন্যাস 'ক্ষুধা ও আশা' নয়। সে জন্য লিনার প্রেমের পাশে মোহাম্মদ আলীর সুগভোক্তি আর জোহার ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে

তা কান পেতে শোনা সবচাইতে অবান্তর বলে মনে
হয়।" [১০]

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসে যে সমস্যা উপজীব্য সে সমস্যা নিছক পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও মূলত তা সর্বকালের। একই চিত্র আমাদেরকে আবার দেখতে হয়েছে উনিশশ একাত্তরে বাংলাদেশে। জীবনের এবং সমাজের অধঃপতিত যে চিত্র আমরা লক্ষ্য করি তার গ্রাসে নিপীড়িত সারা বাংলা। আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসের রচনাশৈলীর বড় গুণ কাব্যধর্মিতা। ক্ষুধা ও আশা সে গুণে গুণান্বিতা। উপন্যাস নয়, যেন এক বিস্তৃত কাব্য। গদ্য যে এত কাব্যময় হতে পারে তা অবিশ্বাস্য বৈ কি । যেমন -

"অনেক ওয়াগান। ইঞ্জিন থামে না, আস্তে আস্তে চলে। এক দুই তিন, জোহা, একটি একটি করে গুণতে থাকে একশটা ওয়াগন।
সে তন্ময় ছিল। হঠাৎ শুনতে পায় পাগলা মাস্টার চেঁচিয়ে বলছেন, সব চাল। বাইরে চালান দেব। ওরা ছিল নিমগাছের তলায়। লোকজন জটলা পাকাচ্ছে, দেখে, কাছে গেল। এক ভদ্রলোক বলল, চাল না বোমা। জাপানীরা এসে পড়েছে। সব মানুষ শহর ছেড়ে ভাগছে। কলকাতা তো বিরান, বোমা সব বোমা।
বোমা না অন্ডকোষ। মাস্টার ক্রুদ্ধ বললেন, দ্যাখেন গিয়ে সমস্ত চালের বস্তা। আমরা মরি, তাতে লাল চামড়ার কি ? তার লড়াই, তার রাজ্য রাখতে হবে। এক কামে দুই কাম - সেলামালি মাথা খাউজান।" (ক্ষুধা ও আশা, পৃ.১২)।

মন্বন্তরের কিছু উপন্যাসের মত ক্ষুধা ও আশা'য়ও দেখা যায় সর্বহারা চরিত্রগুলিকে লুণ্ঠনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। তবে যতটুকু না হলে প্রাণ বাঁচে না ততটুকু -

"এক বুড়ো জবাব দিল: কি করুম কও। আমরা মরুম আর তোমরা বাঁচবা, এতো অইত পারে না। মরি তো সব এক লগেই মরি।
... কাশেম মিঞা নিজের হাতে বড় ডুলিটা ঠেলা দিয়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, লইয়া যাও, লইয়া যাও। সব লইয়া যাও। তোমরা বাঁচ, তোমরাই বাঁচ গা।

কিন্তু সব নিল না ওরা। বিবেক বা চক্ষু, যে কারণেই হোক, প্রথম যা পেয়েছে তাই নিয়েই একে একে বেরিয়ে গেলা "(ক্ষুধা ও আশা, পৃ-২৬-২৭)।

সমাজের অবস্থাপন্নদেরকে দেখি সমাজের নিম্নবিত্তদের সামান্যপ্রাপ্যটুকু থেকে বঞ্চিত করতে। যেমন -

"প্রেসিডেন্টের বাড়িতে রিলিফের মাষ এসেছিল। আগে আরো এসেছে দুতিনবার কিন্তু পেয়েছে কেবল তিন পাড়ার একুশজন। তাও কত হাত পা'য়ে ধরা, কত কাকুতি মিনতির পর। অর্ধেকের বেশিই নাকি চোরাবাজারে পাচার হয়ে থাকে।" (ক্ষুধা ও আশা, ২৬-২৭)।

ক্ষুধা ও আশা র বৈশিষ্ট্য তার সত্যের উপর। তারাশংকরের 'মন্বন্তরের' মতো 'ক্ষুধা ও আশা'র ভাষা সাংবাদিকের ভাষা না হয়েও বইটি এত বেশি তথ্য-ভিত্তিক যে মন্বন্তরের সময়ের পত্রপত্রিকা গুলি দেখলে বুঝা যায়। আপন মেয়েকে বিক্রি কিংবা দেহ ব্যবসায় বাধ্য করানোর এই চিত্র 'মন্বন্তর এবং 'ক্ষুধা ও আশা'য় অনেকটা একই 'থীমে' চিত্রিত। অভাবের তাড়না মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, কখন মানুষ স্বেচ্ছায় মেয়েকে দেহ ব্যবসায়ীর হাতে উঠিয়ে দেয় এই চিত্র মন্বন্তর কত প্রকট তার একটা দলিল হিসাবে কাজ করে। মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি এবং সংকট নেমে না এলে এ চিত্র দুর্লভ। বিশেষ করে ধর্ম অনুশাসিত গ্রামীণ জীবনে। সভ্যতা, সংস্কার, পাপবোধ, সমাজচেতনা, কিছুই আর দমাতে পারছে না মানুষকে। ক্ষুধা নামক এমন এক মহামারি মানুষকে গ্রাস করেছে যেখানে মানুষের অন্য চেতনাগুলি পরাজিত হয়ে রাজপথ দিয়ে পালিয়েছে। বাবা কি সহজ ভাবে বলছে মেয়েকে দেহ ব্যবসায় নামাবার কথা । লেখকের বর্ণনা এ রকম -

"কই, গলাখাকারি দেয় হানিফ, বলল, রাইতে একজন দালাল আইয়ে -

আবার থেমে গেলে ফাতেমা অধৈর্য, ঠেলা দিয়ে বলল, কি? গলাৎ ব্যাও ঠেকছে।

মেয়েলোক কিনার দালাল। কিছু যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে আগের কথার জের টেনে বলতে থাকে হানিফ, জিনিশ বুইঝা দাম। দশ পনের বিশ তিরিশ দুইশ তিনশ পাঁচশ পর্যন্ত। জহুরে বেচবা ?

কাতেমা সত্যিকার নিরীহের মতোই জিগ্গেস করল, মাইয়া নিয়া কি করে ? কি করে বুঝতো পার না ? হানিফ তিতা গলায় বলল, নড়ি বানায় নড়ি। বহুৎ পয়সার কারবার।" (ক্ষুধা ও আশা, পৃ-২৮-২৯)।

কয়েকজন সমালোচক ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের শিল্প সার্থকতা নিয়ে প্রশংসা করলেও কোন কোন সমালোচকের শিল্প বিচারে ক্ষুধা ও আশার শৈল্পিক ত্রুটি কম নয়। হাসান আজিজুল হক বলেন -

> "... মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক আন্দোলন - সবই এই উপন্যাসে তিনি হাজির করেছেন। পঞ্চাশের ধারার সমাজ বাস্তবতাকে নিখুঁত ধরবার চেষ্টা তাঁর। জীবনের জ্যান্ত মাংসপেশী, দেখাতে চান তিনি - মানুষের সবগুলি রিপু। কিন্তু বলতেই হয় ক্ষুধা ও আশার সাফল্য মাঝারি। কোন স্থায়ী প্রভাব সে মনের উপর রাখে না। ক্ষুধা ও আশায় আছে এক ধরণের এক ঘেয়ে যান্ত্রিকতা - কাগজে বিবৃতির মতো, চরিত্রগুলি কলের পুতুলের মতো, কখনো জীবন্ত সত্তা হয়ে ওঠে না। তাদের বৃদ্ধি নেই, তারা কখনো চলিষ্ণু নয়।" [১১]

এসব অভিযোগের পরেও বলতে হয় যে কুশলতায় মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের জাল বুনেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। আধুনিক জগতের সুবিধাবাদ এবং শোষণের অনন্য পদ্ধতির উৎসটিকেই তিনি শুধু চিত্রিত করেননি, মনন মম-বেদনার সঙ্গে দেখিয়েছেন তিনি তার বিস্ময়য় কাঠামো। এ ছাড়া ঔপন্যাসিক কিছু কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের শোষক শ্রেণীর প্রতি প্রকাশ করেছেন ঘৃণা এবং প্রতিবাদ। এবং তা করেছেন খুব স্পষ্ট ভাবেই।

কিছু কিছু সংকট অন্য সঙ্কটগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আমাদের পঞ্চাশের মন্বন্তরের ক্ষুধার সংকট তেমনি একটি সংকট যা অতিক্রম করে গেছে মানুষের সকল সংকটকে, সকল বাস্তবতাকে। ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসে আমরা লেখকের এসব বিষয়কে ছোঁয়ার এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করি। আমরা 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে দেখি শাসক-শোষক মজুতদারদের ব্যবহার পশুর স্তরে অবনতি। মানুষের লোভ একের পর

এক গ্রাস করেছে আমাদের গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে দেশ। কলঙ্কিত করেছে দেশ থেকে মানব সভ্যতার ইতিহাস। আধুনিক যুগের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বসমর এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর সভ্যতার চূড়ান্ত কলংক—তাই চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে সচেতনভাবে।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'ক্ষুধা ও আশা', পাকিস্থান লেখক সংঘ, পূর্বাঞ্চল শাখা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় আশ্বিণ ১৩৭১ সনে। এ গবেষণা পত্রে উদ্ধৃত হল সেখান থেকে।

২। আলাউদ্দিন আল আজাদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি নিজে বলেন।

৩। নাজমা জেসমিন চৌধুরী : বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৮০, পৃ.২৮৩-২৮৪।

৪। আবুল ফজল : ('ক্ষুধা ও আশা'র গ্রন্থ সমালোচনা) 'পরিক্রম', নভেম্বর ১৯৬৫, পাকিস্থান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা, ঢাকা, পৃ.৩২৯।

৫। তদেব, পৃ.৩৫২।

৬। তদেব, পৃ.৯।

৭। আতোয়ার রহমান : 'পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস। (গ্রন্থের নাম-'আমাদের সাহিত্য', সম্পাদনা সরদার ফজলুল করিম) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩১৬। পৃ.১৭১।

৮। আলাউদ্দিন আল আজাদ : 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের ভূমিকা, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২ ঢাকা, শাকিল প্রকাশনী সংস্করণ।

৯। যতীন্দ্রনাথ সরকার : 'পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা', বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৪, ঢাকা, পৃ.৬১।

১০। নাজমা জেসমিন চৌধুরী : 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি,' বাংলা একাডেমি, ঢাকা জুন ১৯৮০, পৃ.২৮৩-২৮৪।

১১। হাসান আজিজুল হক : 'কথা সাহিত্যের কথকতা', একুশে সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৮৯, মাঘ ১৩৯৫ (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, ঢাকা থেকে) পৃ.২২।

সংশপ্তক

পঞ্চাশের মন্বন্তরের এবং মন্বন্তর সৃষ্টিকারী মুনাফাখোরদের ধূর্ত অভিসন্ধির সার্থক রূপায়ণ হয়েছে শহীদুল্লাহ কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) 'সংশপ্তক' (১৯৬৫)[১] উপন্যাসে। বিস্তৃত পটভূমিকার এ উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককাল এ উপন্যাসে চিত্রিত। নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু এ উপন্যাসের একটি বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। ঘটনার বিন্যাসের প্রথমেই আভাষ পাওয়া যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এবং বিশ্বযুদ্ধের সাথে সমান্তরাল হয়ে যা এগিয়ে চলেছে তা হচ্ছে খাদ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি উদ্যোগ এবং পরবর্তীকালে মন্বন্তরের ভয়াবহ পরিণতি। যতই দিন গড়াচ্ছে ততই দুর্ভিক্ষের আকার প্রকট হচ্ছে। নীতিজ্ঞানহীন, নির্মম, অর্থলোলুপ এক শক্তিশালী চরিত্র রমজান। সাম্রাজ্যবাদ এবং মুনাফাখোরের প্রতিভূ রমজান ফেলু মিয়াকে বলছে - "আর যা অবস্থা তাতে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধ একটা লাগবেই। তাহলে তো কথাই নেই, ধান চাল মানেই কাঁচা সোনা।" ('সংশপ্তক', পৃ.৫২)। দূরদর্শী রমজান আরো নিশ্চয়তা দিয়ে বলছে "যুদ্ধ কি লাগবে না ভাবছেন ? নির্ঘাত লাগবে। তাহলে ? তাহলে দু'টাকার ধান হবে তিরিশ টাকা। এর একটা কথাও যদি মিথ্যে হয় তবে বলছি স্যার, আপনার এই না কাবেন গোলাম রমজানের কানটা কেটে রেখে দেবেন আপনি।" (সংশপ্তক, পৃ.৫৮)। কত নিশ্চিত হওয়া গেলে মণিবকে এ রকম আশ্বাস দেয়া যায়। রমজানের কথাটা ফলে যায়। যুদ্ধ লেগে যায়। খাদ্যের অবৈধ পাচার, সংকট সৃষ্টি, নারী পাচার এবং বিভিন্ন অমানবিক উপায়ে টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলে রমজান। জাপানী বোমার মতো প্রকাশ্যে নয়, তলে তলে খাদ্যের বাজারের উপর বোমা বর্ষণ করে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করে দিয়েছে রমজান, রামদয়াল এবং অন্যান্য মজুতদাররা। ভেঙে দিয়েছে মানুষের সভ্যতাবোধ। ক্ষুধার জ্বালায় কৃষক বধূরাও বেরিয়ে পড়ে রাজপথে। নিরাশ্রয় কিষাণী কুমারী রমজানের পুঁজির কড়ি। দুর্ভিক্ষ তখন চরমে। গ্রামের ছেলে, বুড়ো, মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে পড়েছে পথে। চলেছে পঙ্গপালের মত; যেতে যেতে ওরা থালা বাড়িয়ে দেয় একটি পয়সার জন্যে, কখনো রাতের

বেলায় ভাত মেগে বেড়ায়। ভাতের অভাবে ফ্যান চায়, একটা দুটো দল নয়, পিঁপড়ের মিছিলের মতো, মুখগুলো দেখেই বোঝা যায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় পেট ওদের পুড়ছে। এ বুঝি চরম সুযোগ সর্বহারা পঙ্গপালের শেষসম্বল লুণ্ঠনের। মানুষ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে সম্ভবতঃ অরাজকতার জন্যে, নারীকে সহজ পণ্য করার জন্য। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার জন্য। চরম সংকট মেঘে না এলে এ সুযোগ কি করে আসে ? চরম দুর্দিন মেয়ে গুলোর। লেখকের বর্ণনাটা এ রকম - "মেয়েগুলোর মাথায় ঘোমটা। জড়সড় ক্লান্ত পা ওদের। কোনদিন বুঝি এমন করে পথে নামেনি ওরা। আজ এই প্রথম পথ ভাঙতে গিয়ে কেবলই হোঁচট খাচ্ছে। কোথায় চলেছে ওরা ? শহরে ? কিন্তু সেখানেও তো নাকি শুধু ক্ষুধার হাহাকার।" (সংশপ্তক, পৃ.২১৮)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশবিভাগ, সমস্ত ঘটনা সংশপ্তকে স্থান পেয়েছে।

সংশপ্তকের কাহিনী হচ্ছে - পূর্ব বাংলার নোয়াখালী জেলায় বাকুলিয়া আর তালতলী পাশাপাশি দুটি গ্রাম। গ্রামে দুই মুসলিম পরিবার। এক ছৈয়দ বংশ, অন্যটা মিঞা বংশ। ছৈয়দ বংশের আগমন নিয়ে দুই কিংবদন্তী আছে। এক, প্রায় একশ বছর আগে এখন যে মিঞা বাড়ী সে বাড়ীতে ছিল বিত্তশালী এক হিন্দু পরিবার। বর্তমান ছৈয়দদের পূর্বপুরুষ এক গৌরবর্ণ তরুণ সেদিন ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন, ধর্ম প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে বাড়ির কর্তা তরুণ সাধককে ডেকে এনেছিলেন বৈঠক খানায়। গোটা পরিবার ইসলাম ধর্ম কবুল করেছিলেন। তারপর এক সময় বাড়ির কর্তা আপন কন্যাকে বধূ হিসাবে তুলে দেয় সে তরুণ পীরের হাতে। গ্রামের অপর প্রান্তে পত্তন হয় ছৈয়দ বাড়ির। অন্য আরেক কাহিনী - একদা বাকুলিয়া তালতলী ছিল বিরানা। বসতি ছিল অনেক দূরে উত্তরে। উঁচু জাতের ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে অস্থির হয়ে উত্তরের নমঃশূদ্র কুয়াররা একদিন বসতি ছেড়ে মুসলমান হয়ে চলে এসেছিল এই বিরানা জঙ্গলে। পত্তন করেছিল বাকুলিয়ার। এ বল্লাল সেনেরও আগের কথা। এক সময় বাকুলিয়ার ভাগ্য আবর্তিত হত মিঞা আর ছৈয়দ বাড়িকে কেন্দ্র করে। আজ মিঞারা কোমর ভাঙা সিংহ। বাকুলিয়ার সমাজে গুরুত্ব আছে তাদের, কিন্তু শক্তি নেই। রোয়াব নেই। আছে খানদানীর

খেদ আর ক্রোধ। মিঞারা এক সময় জমিদার ছিল। বাকুলিয়া তালতলী নয়, চাটখীল, সুলতানপুর, এসব গ্রামও ছিল মিঞাদের জমিদারীর অংশ। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের - চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কেমন করে যে জমিদারীটা বেহাত হয়ে যায় - সে ইতিবৃত্ত উদ্ধার করতে পারে না মিঞা বংশের শেষ মিঞা ফেলু মিঞা। ফেলু মিঞার বাবা, বড় মিঞা একাধারে দশ বছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগিরি করে গেছেন, কিন্তু ছেলেদের তালুক পত্তনিতে জড়াতে চাননি। বলতেন, ছেলেরা মানুষ হোক। একটার পর একটা তালুক বিক্রি করেছিলেন ছেলেদের শহুরে জীবন ধারার চাহিদা মিটাতে। গ্রামে রয়ে গেলেন ফেলু মিঞা। ফেলু মিঞার বড় তিন ভাই শহরে থাকে। বাকুলিয়ার পন্চাশ ঘর সৈয়দ অথবা মিঞাদের প্রজা। বাকি ত্রিশ ঘরের খাজনা পাওয়ার মালিক রামদয়াল। রামদয়ালের উপর ফেলু মিঞা ক্ষুব্ধ। তার ভাষায় - আব্বাজান বড় মিঞার শেষ বয়েসে ভীমরতি ধরেছিল। তিনি মালাউনদের পাল্লায় পড়ে যোগ দিতে গেলেন স্বদেশীতে, জেল খাটলেন দুই বছর। জেলে ভাঙ্গলো শরীরটা, সে ফাঁকে সুদখোর রামদয়াল বেহাত করে নিল মোটা মোটা সম্পত্তি গুলো, বড় মিঞার অপরিণামদর্শিতার ফলটা ভুগতে হচ্ছে ফেলু মিঞাকে। সৈয়দ বংশের বর্তমান দুই সৈয়দের একজন ছোট সৈয়দ রাবুর বাবা বুজুর্গ এলেমদার পুরুষ। সবাই ডাকে দরবেশ। ইংরেজী আরবী ফারসী সব বিষয়ে বিদ্বান। সেই মানুষ হঠাৎ বউ আর তিন মাসের বাচ্চাটিকে ছেড়ে চলে গেল ঘর থেকে তের চৌদ্দ বছর আগে। ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনো বেরিলীতে, কখনো বোগদাদে, কখনো কারবালায়, মাঝে দুএকবার বাড়ি এসে ছিল বড় জোর একদিনের জন্য হয়তো বা কয়েক ঘন্টার জন্য। এক মাত্র মেয়ে রাবু সৈয়দ বাড়ীতে থাকে চাচীর ছেলেমেয়েদের সাথে। মালু ঐ বাড়ির আশ্রিত। মালুর গান শোনা ও গান গাওয়ার ঝোঁক। জাহেদের বাবা বড় সৈয়দ ইংরেজের অফিসের কর্মকর্তা। দ্বীনে আর দুনিয়ায়, আখেরাত আর বাস্তবের পৃথিবী এ দুয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ সমন্বয় সৈয়দ বাড়ী। বড় সৈয়দ দুবার হজ্ব করেছেন। দাড়ি, লম্বা কোর্তা ও গোল টুপি এবং নিজের ইংরেজি ডিগ্রী ও ইংরেজের অফিসে চাকরি সহজ ভাবে তিনি মানিয়ে নিয়েছেন। কলেজের ছাত্র পুত্র জাহেদ রাজনীতি করে। কলকাতা থাকে।

কালেভদ্রে গ্রামে আসে। বড় সৈয়দ ছেলে জাহেদের আজাদী আন্দোলন নিয়ে অতিষ্ট, কারণ ছেলে জাহেদের স্বদেশী তৎপরতা আটকে দিচ্ছে তার প্রমোশন। অপর দিকে বড় ছেলে রাশেদ মুখে পাইপ আর বগলে মেম নিয়ে ফিরে এসেছেন বিলেত থেকে। বড় ছেলের সাথে সৈয়দ সাহেবের মনোমালিন্য নেই, মনোমালিন্য মেজো ছেলে জাহেদের সাথে। সৈয়দ সাহেবের কথা, আমার বাড়ীতে থেকে আমার খেয়ে ওসব ভূতের বেগার খাটা চলবে না। ভূতের বেগার খাটা মানে জাহেদের আজাদী আন্দোলন। এর মধ্যে একদিন দরবেশ তার প্রৌঢ় পীরের সঙ্গে রাবুর বিয়ে দেন জোর করে। পরদিন সকালে জাহেদ বাড়ি ফিরে এই বিয়ের কথা শুনে লেকু ও তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে পীর ও তার সঙ্গীদের গ্রাম ছাড়া করে। এতে রাবু জাহেদের উপর অসন্তুষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে বড় সৈয়দ পরিবার নিয়ে কলকাতা চলে আসে। তাদের সাথে রাবুও আসে। এ সময় যুদ্ধ এবং এরপর মন্বন্তর শুরু হয়। এ দুর্যোগে ফেলু মিঞার বিবি বাপের বাড়ি চলে যায়। কুমিল্লা স্টেশনে ট্রেনে হুরমতির সাথে মালুর দেখা, হুরমতি তখন বারবণিতা, ইংরেজ সৈনিকের সঙ্গিনী। মালুও কলকাতায় চলে আসে। পরে রাবু এবং জাহেদের সাথে মিলিত হয়। সৈয়দ পরিবারে আসে মালু থাকার জন্য। কিন্তু সৈয়দ গিন্নি তখন ছেলে রাসেদের বিলাতী আদর্শে সংসারকে উটকো লোকের বাইরে রাখতে চান। রাবু তখন কলেজে পড়ে। উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায় সবাই মিলিত হয়। রাবু ঢাকার বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে। জাহেদও গ্রামে ফিরে আসে, ফিরে আসে লেকু, হুরমতি। এ সময় রাবুর আব্বাজান নূতন করে রাবুকে প্রস্তাব দেয় সেই পীর মোজাদ্দেদী সাহেবের কাছে ফিরে যেতে। রাবু প্রত্যাখ্যান করে সে প্রস্তাব। এর আগেই রাবু মোজাদ্দেদী সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে স্বামীত্বের অধিকার দিতে অস্বীকার করে। এ সময় গ্রামে মহামারী এলে সবাই মিলে মহামারীতে আক্রান্ত গ্রামবাসীর সেবা করে চলে। পরিস্থিতি, জীবিকা, জীবনের অন্বেষণ সবাইকে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, আজ আবার সবাই ফিরে এসেছে সে শৈশবের গ্রামে, যেখানে সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকতো। সংক্রামক ব্যাধির সেবা করতে গিয়ে রাবু মহামারী

বসন্তে আক্রান্ত হয়। মালু-জাহেদ-হুরমতি-সেকান্দর মাষ্টার সকলে মিলে রাবুকে সুস্থ করে তোলে। এ সময় পুলিশ এসে জাহেদকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সমাপ্ত হয় 'সংশপ্তক' উপন্যাস।

এ উপন্যাসের মানুষেরা হচ্ছে, এ কালের সংশপ্তক সেনা। পৌরাণিক কাহিনীর সংশপ্তক অর্থাৎ নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধ করে যাওয়া সৈনিকের মতো সংগ্রাম করে যায় এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি। সমাজের নীচুতলার মানুষের জীবন সংগ্রামের বাস্তব রেখাচিত্র 'সংশপ্তক' উপন্যাস। উপন্যাসে বিস্তৃত সময় ও পট-ভূমিকার একটি বিশেষ বিষয় হচ্ছে পঞ্চাশের মন্বন্তর।

সংশপ্তকের পরিবেশবৈচিত্র্য এবং বিষয়টা মহাকাব্যিক। প্রাক দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ এবং এর পর স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট আলোড়িত প্রায় ঘটনাই এ উপন্যাসে এক সঙ্গে পাওয়া যায়। প্রায় পনেরো বছরের কালসীমায় বাকুলিয়া তালতলি এবং কলকাতা ও ঢাকা নগরের বিস্তৃত পট এ উপন্যাসে চিত্রিত। বাকুলিয়া তালতলি এবং ঢাকা ও কলকাতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের শিকার জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবন, তাদের আনন্দ বেদনা ও শোষিত রূপ সংশপ্তক-এ ফুটে উঠেছে। সমালোচক বলেছেন -

> "সংশপ্তক উপন্যাসের সূচনা হয়েছে হুরমতির লাঞ্ছনায়। ব্যাভি-
> চারিনী হুরমতির কপালে আগুনে তাতানো লাল পয়সাটা দিয়ে
> ছেঁকা দিয়ে দেবার যে বর্বর নিষ্ঠুর দৃশ্যটিতে উপন্যাসের সূচনা,
> সেখানেই নারীত্বের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহের ইঙ্গিত পাই।" [২]

সংশপ্তকে লেখক চরিত্র ও চিত্র নির্মাণে তীব্র সমাজ সচেতন। সমাজের শোষণ চিত্র দিয়ে উপন্যাসটি শুরু, এর জন্য লেখক জীবন্ত কিছু চরিত্র তৈরী করেছেন, সমালোচক বলেছেন -

> "শহীদুল্লাহ কায়সারের সৃষ্ট চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যহীন টাইপ
> চরিত্রে পরিণত হয়নি, রক্ত মাংসে গড়া।" [৩]

সংশপ্তকে পাই মন্বন্তর সৃষ্টির ভিতরের কথা, যে বৃহৎ মন্বন্তরকে আমরা দেখেছি

তার মূলে বাইরে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকের দুর্নীতি। তারা সৃষ্টি করেছে মন্বন্তরের, আর ভিতরের ব্যাপারটাকে ফাঁপিয়ে তুলেছে দেশীয় অর্থলিপ্সু ব্যবসায়ীরা। উপন্যাসে পাই যুদ্ধকালীন ব্যবসার এই চিত্রটা - "এই তবে রমজানের ব্যবসা ? সুলতান তার সহকারী ? শুনেছে মালু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বানিয়েছে রমজান। যুদ্ধের হাটে বিচিত্র পণ্যের কারবার তার। রামদয়াল তার দোসর। ঘরে ঘরে বুভুক্ষু কৃষক বধূরা, নিরাশ্রয়া কিষাণী কুমারী রমজানের পুঁজির কড়ি। অন্ধকারেই উঠে বসে মালু। দিয়াশলাই হাতড়িয়ে যোষ জ্বালায়। যোষটা কাত করে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বস্তাগুলোর দিকে। কোণের দিকে একটার পর একটা একেবারে ছাদ অবধি সাজানো বস্তায় সার, চাল ডাল লবনের। দোকানের মজুদ মাল।"(সংশপ্তক, পৃ.২১৫)।

যুদ্ধের বাজারে একদিকে সংকট মানবতার। অন্যদিকে সংকট খাদ্যের, অপর দিকে রাতারাতি ধনী, ধনী থেকে আরো ধনী হওয়ার মোক্ষম সুযোগ এবং এর লোভ কিছু মানুষকে করেছিল ক্রূর, নিষ্ঠুর। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যে হারে চড়েছে সে হারে কমেছে কিছু দ্রব্য, ভূমি, যুবতী নারী ইত্যাদির। সাধারণত অর্থশাস্ত্র মুদ্রাস্ফীতির যে ফলাফল ব্যাখ্যা করে এখানে তা নয়। এখানে নিম্নবিত্তের এবং মধ্য-বিত্তের অবস্থা হচ্ছে শোচনীয়, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি আঘাত করছে না ধনীকে। ফলে ধনীরা এ সুযোগে পাচ্ছে অকল্পনীয় সুযোগ। একটার পর একটা তল্লাট, ছোট দালান, কৃষকের বসত ভূমি, খন্ড আবাদী জমি এবার হস্তগত হয় মহাজনদের। নামমাত্র মূল্যে। যুদ্ধ এবং মন্বন্তর ছাড়া এ সুযোগ কি সম্ভব ছিল ? মন্বন্তর তাই বড় মাপের ধনীদের কাছে অর্থনৈতিক আরো উত্থানে সুযোগ হিসাবে কাজ করেছে দ্বিমুখী হয়ে। দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তর মানুষকে আবার ফিরিয়ে নিয়েছে আদিমতায়। প্রাক্ সভ্যতা যুগের মত অরণ্যচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ মানুষ। যেমন - "রাস্তার পাশে পাকুড় গাছটার নীচে অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়েছিল একটা লরী। সেই গভীর রাতে দেখা রমজানের মাল বোঝাই লরীগুলোর মতোই তেরপল দিয়ে ঢাকা। আচমকা তেরপলের পর্দা সরিয়ে তিনটি কি চারটে লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরন্নের কাফেলার উপর। ছোঁ মেরে তুলে নেয় দুই কিষাণী কন্যা। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে ছুট দেয় গাড়িটা।" (সংশপ্তক পৃ.২১৮)। জানোয়ারের মত এ শিকার ধরা অন্য সময় সম্ভব নয়।

চরম দুর্দিন। ফলে কোন আইন নেই। নীতি জ্ঞান নেই। চারিদিকে লুণ্ঠন। মন্বন্তর সব কিছুকে ভেঙে একাকার করে দিয়েছে। "ভয়ে আতঙ্কে ভেঙে যায় কাফেলার লাইন। কেউ পাশের ঝোঁপে, কেউ ক্ষেতে ছিটকে পড়ে। কেউ বা প্রাণ ভয়ে দৌড় দেয় ক্ষেতের আল ধরে। কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠে। হয়তো ওই কিশোরীদের মা। ... হাহাকার উঠে নিরন্নের কাফেলায়।" (সংশপ্তক, পৃ.২১৮)।

গ্রামের সে কৃষাণী বধূ এবং মেয়ে, যারা এত দিন সম্ভ্রমবোধ নিয়ে বেচে-ছিল, লজ্জা যাদের অলংকার ছিল, গ্রাম্যজীবনে পর্দা মানতে যারা ছিল অভ্যস্ত এখন তারাই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। তাদের আর লজ্জা নেই, পর্দা নেই, আত্মাভিমান নেই। ক্ষুধার জ্বালায় তারা এক পর এক সব কিছু ত্যাগ করেছে।

দুর্দিনে মানুষ এসে দাঁড়াবার কথা মানুষের পাশে, প্রসারিত করার কথা মানবতার হাত, বিশেষ করে অবস্থাপন্নরা। যারা খেয়ে দেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু না পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঘটেছে তার বিপরীত। মজুদদাররা অবতীর্ণ হয়েছিল পাষাণের ভূমিকায়। সংশপ্তক-এ তার চিত্র আমরা নিখুঁত ভাবে পাই। চিত্রগুলি বাস্তবের চেয়েও বাস্তব। এখানে কোন ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত চিত্র নয়। এখানে ঔপন্যাসিক বিচরণ করেছেন বাস্তবতার সত্যে। ইতিহাসের সত্যে।

এসময় জমিদারদের মানসিকতা আর তাদের অনুচরদের কূট পরামর্শ মানুষকে হতবাক করে দেয়। যেমন - "বলল রমজান : লেকু বসির, ট্যান্ডল, সেকান্দর মাস্টার, তাকু ব্যাপারী, হামিদ শেখ, কারি বাড়ি, খতিব বাড়ি আরো অনেকে - কেউ চার বছর, কেউ তার চেয়েও বেশী খাজনা বাকী ফেলেছে। ওদের ত্রেনক দিন উঠে যাক, গাছ গাছড়া ডিটিডুটি সমান করে ফেলি অন্তত দশ কানি জমি তো হবেই। ধান তোলা যাবে দুধন্দ, রবি ফসলও নেহাৎ কম হবে না।" (সংশপ্তক, পৃ.৫৮)।

সংশপ্তক উপন্যাসে দেখতে পাই যুদ্ধের বাজারে মুনাফালাভের দূরদর্শিরা বুঝেছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে, খেলতে হবে মানুষের সব চেয়ে দুর্বল দ্রব্যটা নিয়ে। দ্রব্যটা হচ্ছে খাদ্য। এটা যার হাতে সেই সাজবে যথাশক্তি। রামদয়াল পরামর্শ দিচ্ছে

ফেলুমিঞাকে - "আর যা অবস্থা তাতে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধ একটা লাগবেই। তা হলে তো কথাই নেই; ধান চাল মানেই কাঁচা সোনা, টাকা রাখবার জায়গা পাবেন না তখন।" (সংশপ্তক, পৃ.৫২)।

বিশ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে এ শতাব্দীতে জাপান এবং পূর্বে মার্কিনরা। খাদ্য সংকট কি তীব্র ভাবে আঘাত করেছে রাশিয়ান সাম্রাজ্যে তা আমরা দেখতে পাই এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে। জাপান বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করার পর। মজুদদার মহাজনদের নির্মমতায় ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায় তাদের, যারা এতদিন চোখ বুঝে অনেক অত্যাচার হজম করেছিল। এখন পিঠ ঠেকেছে দেয়ালে। এবার তারা বাঁচতে চায় প্রতিবাদ করে - "অকালে কোত্থেকে খাজনা দেব ? কেমন অসহায় ভাবে বলল কসির। খাজনা দেব না, ডিটিও ছাড়ব না, দেখি কি করতে পারে মিয়ার পুত। যেন কসিরের অসহায়তার প্রতিবাদে বলল লেকু। চমকে উঠে সেকান্দর মাষ্টার। বলে কি লেকু ? ওরা খুঁজছে একটা ভদ্রস্থ রফা। কিন্তু লেকুর মতো গোয়ার্তুমি দেখালে তো যে কোন রফারই দফা রফা।

ওই শুয়রের জাত রমজান, সব তারই শয়তানী। সে ব্যাটাই বুদ্ধি দিয়েছে মিঞাকে। আমাদের গেরাম ছাড়া করবে এই তার মতলব। ফুলে ফুলে উঠে লেকুর ঘাড়ের পেশীগুলো।

ওরা কেউ ভাবেনি অমন আচমকা একটা নোটিশ দিয়ে বসবে ফেলু মিঞা। যায় ফাল্গুন কৃষকদের ঘরের কাজের সময়। এই দুটো মাসে সেরে ফেলতে হয় সারা বছরের বকেয়া কাজ।এ সময় আবহাওয়াটা থাকে ওদের অনুকূলে, বৃষ্টি নেই, প্যাঁক নেই, শীতের নির্মল রোদ-ঝকঝক আবহাওয়া, কাজ করে শ্রান্ত হয় না ওরা। ফসল তোলা শেষ করেই হাজার গণ্ডা টুকিটাকি কাজে মন দেয়, মজুর অবসরে হাত পা ছড়িয়ে ছন বাছে, ছোট বড় নানা আকারের গুছ বেঁধে বেঁধে তুলে দেয় চালের উপর, দেখতে দেখতে ঘরের উপর ওঠে নতুন ছাউনি। ভাঙা বেড়াগুলো মেরামত করতে হয়, পাল্টাতে হয় বর্ষার উইয়ে খাওয়া পালা। ডোবাটা প্যাঁক তুলে আর একটু গভীর করে রাখতে হয়

যাতে বর্ষার পানির সাথে মাছ পড়ে আবার পালিয়ে না যায়। এ সব কাজে টাকা লাগে। এমন সময় বকেয়া খাজনার নোটিশটা বাজের মতো পড়েছে ওদের মাথায়। (সংশপ্তক, পৃ·৬৬)।খাজনা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে এই মন্বন্তরের সময়েও। ঔপনিবেশিক শাসকের খাজনা এবং তাদের তৈরী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা হয়েছে জমিহীন। তাদের প্রধান সমস্যা জমির। জমি তাদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। তারা কৃষক কিন্তু তাদের জমি নেই। জমি থাকলে আজ এ অবস্থা হতো না। কিন্তু কে নিয়েছে তাদের জমি কেড়ে ? "এই বাংলাদেশটা, তামাম হিন্দুস্থানটা কাদের ছিল জান ? ··· সেই যে আকবর বাদশা, তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা ছিলেন আর ওই যে নবাব আলিবর্দী তিনি ছিলেন সুবে - বাংলার হর্তা কর্তা মালিক, তাঁদেরই বংশধর আমরা, এই দেশতো আমাদের। ··· কিন্তু ওই শুয়োরখোর ইংরেজ ? কেড়ে নিল আমাদের বাদশাহী তখ্ত বাদশার জাত, আমরা এখন ভিখারীর জাত। পোয়া বারো, ওই মালাউনদের, জমি জিরাত সবই লুটে পুটে খাচ্ছে ওই ব্যাটারা।" (সংশপ্তক, পৃ·৫৪)। যতীন্দ্রচন্দ্র সরকার বলেছেন -

"এই ফোড শুধু একক ব্যক্তি ফেলু মিঞার নয়, ফেলু মিঞাদের শ্রেণীর"।[৪] ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভূমিহীন কৃষক বলে একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে যারা ভূমি নির্ভর। "সারা বাংলাদেশেই জমির অভাব। জমির অনুপাতে মানুষ নাকি অনেক বেশী। মানুষ তো কাজ চায়, খেটে খেতে চায়। এক টুকরা ক্ষেতের পিছে কী অমানুষিক পরিশ্রম ঢেলে দেয় ওরা। তবু বছরে দুটো মাসের অন্ন জোটে কি ? জমি যে নেই। কাজই বা কোথায়। তথ্য নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করেন সে সব পন্ডিতরা বলেন - এক দিকে গারো পাহাড় অন্য দিকে ত্রিপুরা পর্বতের বেষ্টনী, আর ওই আরাকান পর্বতমালার সানুদেশ থেকে নাবতে নাবতে একেবারে মেঘনার বঙ্গোপসাগরের মোহনা অবধি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতি অঞ্চল। পৃথিবীর আর কোথাও এত ছোট এলাকায় এত বেশী মানুষ বাস করে না। কথাটা যে কত নির্মম ভাবে সত্য বাকুলিয়ার লাঙল-ঠেলা চাষীর মতো করে অন্যরা কি বুঝবে ? ওদের ছেলেরাই যে অল্প বয়সে মায়ের আঁচলের মায়া কাটিয়ে ঘর ছাড়ে। অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দেশ দেশান্তরে। এক

রাত্তি যে ছেলে, লুঙ্গিটা পড়ে যেতে চায় কোমর ছেড়ে, সেও বিদেশে ছোটে কামাই করবে বলে। দুমুঠো ভাত দিতে অক্ষম মা-বাবা ধরে রাখতে পারেনা কচি ছেলে গুলোকে। যারা থেকে যায় গ্রামে তারাও বছরের অর্ধেকটা সময়, কাটায় পাহাড়ে, আসামে অথবা ভাটি অঞ্চলে, শ্রমের বিনিময়ে টাকা অথবা শস্য নিয়ে ঘরে ফেরে।" (সংশপ্তক, পৃ·৬৭)।

ইংরেজরা এখানে এসেছিল ব্যবসা করার অভিপ্রায়ে। করেছে মজুদদারী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক খাজনা ব্যবস্থা এমন কি ভূমি লুট, জবর দখল। সংশপ্তকের এ চিত্রটা মোটেই আবেগী নয়। ফেলুমিয়া -"রমজানের সুমুখে নক্সাটি বিছিয়ে দিয়ে বলে : পেয়েছি, দেখ, এই যে মেঘনার মোহনা, ছোট ছোট দ্বীপগুলো দেখছ ? ওই সব দ্বীপ বড় বড় চর আর গোটা উপকূলটা তো আমাদেরই ছিল। তার পর ওই যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাবুর্চি না বেয়ারা ছিল একটা সাহেব, কার্জন নাম সে একশো বছরেরও আগের কথা হে। সেই ব্যাটা সাহেব, নিজের ঘাড়ে একটা বন্দুক আর দুটো ভাড়াটে বন্দুকধারী পেয়াদা নিয়ে এক দিন কোত্থেকে হাজির হয়ে বলল এ আমার জমিদারী। তখনকার দিনে এই দুটো বন্দুক আর সাহেবের সাদা চামড়া, এর উপর কথা কবার কথা ? ব্যাস রাতারাতি গোটা তল্লাটটা হয়ে গেল কার্জনের জমিদারী। সেই বছরই তো আমার আব্বা জানের দাদা এক রকম বিনা যুদ্ধেই কার্জনের হাতে ওই তল্লাটটা তুলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন হজ্বে।" (সংশপ্তক, পৃ·৮৬)।

শুধু মেঘনার মোহনা কিংবা বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ নয়, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাবুর্চী বেহারা এবং হর্তাকর্তারা বিভিন্ন ছলে বলে কিংবা অস্ত্রের জোরে একের পর এক কেড়ে নিয়েছে এ উপমহাদেশের তল্লাট থেকে প্রদেশ, প্রদেশ থেকে পুরো উপমহাদেশ।

বিপুলায়তনের এ উপন্যাসে অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। লেখক চরিত্রগুলিকে অভিজ্ঞতা থেকে উপন্যাসে তুলে এনেছেন। লেখক নিজেই (গ্রন্থ সংলগ্ন নিবেদন) বলেন -

> "ছোট বেলা থেকে এ দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে যেভাবে দেখেছি কলমের আঁচড়ে ঠিক তেমনি এঁকেছি।" [৫]

'সংশপ্তক' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জাহেদ। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রাবু, মালু,

ফেলু মিঞা। এছাড়াও রয়েছে লেকু, কসির, ফজর আলি, সেকান্দর মাষ্টার, রামদয়াল, রমজান, দরবেশ মোজাদ্দেদী, হুরমতি, সৈয়দ গিন্নী, মিঞা গিন্নী, রিহানা আরিফা, আমুরি প্রভৃতি চরিত্র। লক্ষণীয় যে, উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিক পরিচয় মুখ্য নয়, শ্রেণী পরিচয় আসল।

জাহেদ কলকাতায় আজাদী আন্দোলনে জড়িত হয়। কারণ সে বিশ্বাস করে যে জন সংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য নেই দেশে, সর্বত্র এই অভিযোগ, কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক, সেটাই বিদেশী শাসন আর শোষণের পরিণতি। ইংরেজ বিতাড়নের পাশাপাশি তার সুপ্ত মুসলিম স্বাধিকার চেতনা। একই চেতনায় সচেতন করার জন্য নিজ গ্রাম বাকুলিয়াতে আসে কর্মী সংগ্রহের অভিপ্রায়ে। মামা ফেলু মিয়া এবং সেকান্দর মাষ্টার তার মতাদর্শে সাড়া দিলেও জাহেদের রাজনৈতিক আদর্শের সাথে কিছুটা পার্থক্য রয়ে যায়। ফেলু মিয়া চায় মুসলিম লীগ সংগঠনের সেক্রেটারী হতে। মুসলমান আজাদী আন্দোলনের চেয়ে ক্ষমতা পাওয়াটা ফেলু মিয়ার কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য। ফেলু মিয়ার সাথে জাহেদের আদর্শগত এখানে পার্থক্য। জাহেদ ফেলু মিয়াকে বলে - "প্রেসিডেন্ট আপনি ? ও, কাজের নেই দেখা, আর এখুনি গদি ভাগাভাগি ? মামা আপনার মতলবটা তো বড় খারাপ। বিদ্রুপ তীব্র জাহেদের কণ্ঠে। জাগনের অতর্কিত স্পষ্টবাদিতায় অপ্রস্তুত হয় ফেলু মিঞা। ... শুনুন ফেলু মামা। দুশো বছরের ইংরেজ শোষণের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য লড়ছি আমরা। সে মুক্তির রূপ অতি স্পষ্ট : দেশের মাটি আমার, দেশের সম্পদ আমার, আমার মুক্তি কোটি কোটি মজলুমের পেটে দেবে অন্ন, গায়ে দেবে বস্ত্র আর মুখে ফোটাবে হাসির ছটা। আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখতে জেতে বসবেন সেটি হচ্ছে না কিন্তু। তীরের মতো কথাগুলো ছুঁড়ে মারল জাহেদ।" (সংশপ্তক, পৃ.১৩৪)।

সেকান্দর মাষ্টার কিন্তু হিন্দু মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। সে চায় শুধু ইংরেজ বিতাড়ন। এ বিষয় নিয়ে জাহেদের সাথে সেকান্দর মাষ্টারের বিতর্ক হয়। সেকান্দর মাষ্টার মনে প্রাণে চায় তাদের মুক্তি, যিধেয় যাদের পেট জ্বলে, অকাল মৃত্যু যাদের কপাল লিখন। জাহেদের আজাদী আন্দোলনে সেকান্দর মাষ্টার সহযোগী হয়।

উপন্যাসে জাহেদ চরিত্রের উপস্থিতি কম, যদিও জাহেদ এ উপন্যাসের নায়ক। তার চরিত্রের মধ্যে আছে উদারতা, ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম এবং রাবুর প্রতি আকর্ষণ। নায়িকা রাবুর প্রতি তার আকর্ষণ কিছুটা শিথিলতা হলেও উপন্যাসের শেষের দিকে চপলতা কাটিয়ে জাহেদ উত্তীর্ণ হয় সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কাছে হোঁচট খাওয়া একজন সংযত পরিপক্ব যুবক হিসেবে।

শ্রমজীবি মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং ইংরেজ বিদ্বেষী ভাব থেকে জাহেদের আজাদী আন্দোলনের জন্ম। জাহেদ সেকান্দর মাষ্টারকে বলে " জান ? যাদের হাতের মায়া আর শ্রমের ছোঁয়া পেয়ে এ জমি শস্যময়ী হয়েছিল তারা আর এ জমির কেউ নয় ? জানি। জান ইংরেজ আসবার আগে এ অবস্থা ছিল না।" (সংশপ্তক, পৃ.১৬২)।

উপন্যাসের শেষে রাজনৈতিক উৎসস্থল থেকে সরে জাহেদের আত্মপ্রকাশ ঘটে আর্তমানবতার সেবক রূপে। পুলিশের কাছে ধরা পড়ে জাহেদ। ধরা পড়ার সময় সে বলে যায় 'আমি ফিরে আসব। আমি আবার ফিরে আসব। জাহেদের মতো বিপ্লবীদের বার বার ফিরে আসার ইঙ্গিত। এখানে ঔপন্যাসিক তার মনের বাসনা প্রকাশ করেছেন প্রতীকী সংলাপ দিয়ে। দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী জাহেদের রাজনৈতিক আদর্শ নায়ক হিসাবে কিছুটা সংকীর্ণ মনার ত্রুটিতে প্রথম দিকে অবশ্য হলেও জাহেদ তার যুক্তি দিয়ে বার বার তার আদর্শের কারণ ব্যাখ্যা করে যায় - "অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মর্যাদা নেই, এর নাম কি বাঁচা ? কামালের তুর্কি, জগলের মিসর, বোখারা-সমরকন্দ, বোগদাদ দামেস্ক সর্বত্র মানুষের বুকে নতুন বল, নতুন জাগরণ। সারা মুসলিম জাহান জাগছে। স্বাধীনতার উত্তাল তরংগে ফুঁসে উঠেছে নীল নদ, ফোরাত-তাইগ্রীসের তীরে তীরে জেহাদের ডাক । ভারতের দশ কোটি মুসলমান কি ঘুমিয়ে থাকবে ? কাফের বিদেশী ইংরেজের হুকুমত আর কতদিন বরদাস্ত করবে ওরা ? (সংশপ্তক, পৃ.১৩৮)।

প্রেমিক হিসাবে দেখা যায় বালিকা রাবুকে প্রথম দিকে জাহেদ গভীর প্রেমে টানতে না পারলেও শেষের দিকে রাবুর মধ্যে নারীত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং প্রেমময়ী রূপটি জাগিয়ে দিতে সমর্থ হয়। রাবুর প্রতি তার অভিমান, দায়িত্ব, ভালোবাসার প্রকাশ সব মিলিয়ে তার চরিত্রের যে রূপটি ফুটে উঠে, রাজনৈতিক কর্মী জাহেদের চেয়ে রাবুর

মেজো ভাই জাহেদ এখানে কোন অংশে কম নয়। তবু সংশপ্তক উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাসের মর্যাদা দেয়া হলে স্বীকার করে নিতে হয় উপন্যাসের একমাত্র সফল রাজনৈতিক চরিত্র জাহেদ। মোজাদ্দেদী সাহেবের সাথে প্রথম দিন রাবুর বিয়েকে কেন্দ্র করে জাহেদ যে অঘটন ঘটিয়ে দেয় তাতে তার নায়কোচিত আচরণের চেয়ে বালকসুলভ চপলতা এবং কৌতুক প্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

জাহেদের রাজনৈতিক আদর্শের পিছনে কোন ব্যক্তি স্বার্থ নেই। সে চায় তার জাতিকে রক্ষা করতে, তাই তাকে বলতে শুনি - "দেশ জাগছে, স্বাধীনতা আসবেই। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে এদেশের মানুষ। কিন্তু স্বাধীনতার মন্ত্রে স্বাধিকার চেতনায় মুসলিম সমাজ এখুনি যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তবে তারা যে শুধু পড়ে পড়ে মারই খাবে, অশিক্ষিত দারিদ্র্যের অভিশাপ কোন দিনই যে ঘুচবে না তাদের, এ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে তোমার ?"(সংশপ্তক, পৃ-১৩৩)।
জাহেদের কাছে মুসলিম লীগের একমাত্র শত্রু ইংরেজ নয়, হিন্দু মহাজনরাও।
"আমাদের শত্রু যে এক নয়, আমাদের শত্রু যে দুই - এক ইংরেজ, দোসর হিন্দু বানিয়া মহাজন, তুমি কি মনে কর এ কথাটা বুঝতে মুসলিম সমাজের খুব দেরী লাগবে ?" (সংশপ্তক, পৃ-১৬০)।
এ মতবাদের পিছনে ধর্ম চেতনা নয়, শোষণ অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। চক্রান্তকারী ইংরেজ শাসকদের পদ্ধতি ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় জমিদার হিন্দু বানানো এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় জমিদার মুসলিম বানানো, তাই বৃহৎ জনগোষ্ঠির কাছে হিন্দু ছিল মুসলমান জমিদারের শোষণের শিকার, আর মুসলমান ছিল হিন্দু জমিদার মহাজনের শোষণের শিকার, ইংরেজ শাসকদের এই কুচক্রের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং কর আদায়ে জমিদার মহাজনদের নির্মম হতে সুযোগ দেয়া। কারণ স্বজাতীর প্রতি মানুষের যে সহজাত মানবিক দুর্বলতা থাকে, তা থেকে সরানোর পথ শাসক ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেয়া। জাহেদের কাছে ইংরেজ শোষকের সাথে হিন্দু মহাজন বানিয়াও তুলনীয়। কিন্তু সাধারণ হিন্দু জনগণ নয়।

উপন্যাসে জাহেদের নিষিদ্ধ রাজনৈতিক জীবনের কর্মতৎপরতা বিশদভাবে পাওয়া যায় না। এতে চরিত্রটি অনেকটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। তবে তা লেখকের অনবধানতা নয়।

সমালোচক বলেন -

> "লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবেই অস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের নির্মম নিষ্পেষণে বিপ্লবী চিন্তা ধারার অনুসারী কোন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকাশ্য কাজ করা সম্ভব ছিল না এবং কোন গল্প, উপন্যাস বা নাটকও সে রকম বাঞ্ছনীয় ছিল না।"[৬]

জাহেদ এ উপন্যাসের সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র।

রাবু চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় মুসলিম নারীর আকাঙ্ক্ষা। রাবু প্রগতির সোপান। পিতৃ আদেশে বিয়ের বিপর্যয়কে ভাগ্যলিপি বলে সে মেনে নিলেও প্রথমে, কলকাতায় এসে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা রাবু আর আগের মতো মোজাদ্দেদী সাহেবকে মেনে নিতে পারে না। রাবু কলকাতায় তাকে স্বামীত্বের অধিকার দিতে অস্বীকার করে। দরবেশ তাকে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বললে সে জানিয়ে দেয় - "কী সম্পর্ক আমার ওই বুড়োর সাথে। তাকে আমি স্বীকার করিনা, মানি না। কোন দিন মানিনি।" (সংশপ্তক পৃ.৫৩৫)।

রাবু চরিত্র সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন -

> "বাস্তবতা দিয়ে গড়া এমন একটি নারী চরিত্র সমগ্র বাংলা উপন্যাসের গতিধারায় বিরল দৃষ্টান্ত। ...'সংশপ্তক'এর স্রষ্টা এ উপন্যাসের নায়ক জাহেদ ও নায়িকা রাবু উভয়কেই নিগূঢ় বাস্তব চরিত্র রূপে গড়ে তুলতে পেরেছেন। তিনি তাদের অন্তরের অনুভূতিগুলিও নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাদের প্রেমে কিছুটা ভাবাবেগের আতিশয্য হয়তো রয়েছে। তবে এরা চরিত্র হিসাবে দুজনই বাস্তবের কাছে নিয়েছে শিক্ষা এবং এ কারণেই এদের চরিত্র জুলে পুড়ে বিকাশ লাভ করেছে। এরা তাই যুগান্তরের উত্তাল ও রক্তাক্ত ঘটনাবলীতে উৎক্ষিপ্ত না হয়ে সংহত ও আত্মস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য বিপ্লবের পথিকৃৎ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।"[৭]

মালু ভাববাদী চরিত্র। মালুর মধ্য দিয়েই লেখক উপন্যাসধৃত সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন। এই চরিত্রটি এ উপন্যাসে অধিক পরিসর পেয়েছে। সমালোচকের ভাষায় -

"যাদু প্রধানতঃ স্বভাবশিল্পী এবং এদিক দিয়ে সে গ্রামীণ লোক সাধারণের একজন। তার অবিনষ্ট চরিত্র বাংলাদেশের লোক সঙ্গীতের অমিয় ধারার প্রতিভূ রূপে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাংস্কৃতিক লোক জাগরণকেও সম্ভাব্য উপকরণ রূপে উপন্যাসে সৃষ্টিত করেছে।"[৮]

সেকান্দার মাষ্টার চরিত্র লেখকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের উজ্জ্বল সৃষ্টি। সেকান্দর মাষ্টার কৃষকের সন্তান হয়েও বি.এ পর্যন্ত পড়েছে। অভাবের তাড়নায় পড়ালেখা বেশী দূর হয় নি। এর পর তালতলির শ্যামাচরণ দত্ত হাইস্কুলের জুনিয়র শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে সে গ্রামেই থেকে গেছে। সেকান্দার মাষ্টার কোন রাজনৈতিক দলের লোক নয়। স্বাধীনতা সম্পর্কে সেকান্দর মাষ্টারের ধারণা "তোমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজ বিতাড়ন। আমার কাছে তার অর্থ আরও ব্যাপক। ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা জমি রুটি রুজি জীবনের নিরাপত্তা।" (সংশপ্তক, পৃ.২০১)। সমালোচকের মন্তব্য -

"সেকান্দর মাষ্টার বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেরই সাধক কর্মী চরিত্রের প্রতিভূ, সেকান্দর হচ্ছে সেই কর্মীদের একজন যারা মুক্তি সংগ্রামকে তার মহা বৈপ্লবিক বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের ও পল্লীগ্রামের সাধারণ মানব মানবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বশ্য সংগ্রাম বলে প্রমাণিত করেছে।"[৯]

ফেলু মিঞার চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক একটি সামন্ততান্ত্রিক ধনকুবেরের ধীরে ধীরে পতন এবং পতনের কারণটি চিত্রিত করেছেন। আধুনিক যে সমাজ কাঠামো জন্ম দিয়েছে যান্ত্রিক সভ্যতার, ফেলু মিঞা তার সাথে সমন্বয় রক্ষা করতে পারেনি। ফলে শত শোষণের পরেও তার অর্থনৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। মন্বন্তরের সাথে এ চরিত্রের পতন ঘটা বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। শেষ পর্যন্ত ফেলু মিঞা শূন্য গৃহে আশ্রয় নেয়। তার পতনের কারণ ছৈয়দ বংশের অহমিকা।

মুহাম্মদ ইদ্রিস আলীর ভাষায় -

"শেষ পর্যন্ত ফেলু মিঞার পতন ঘটে। তালুকদার সুদে জমিদার থেকে সে একে একে সম্পত্তি হারা হয়ে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এলে সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এ পতন সে যুগের সাথে তাল মিলাতে পারেনি বলে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বেই পরিবারের পড়তি অবস্থার জন্য ফেলু মিঞার বড় ভাই ফেলু মিঞাকে অবস্থা ফেরানোর জন্য যুগের দাবী মেনে নিয়ে কলকাতায় দোকান দেবার পরামর্শ দেন। কিন্তু আভিজাত্যগর্বী ফেলু মিঞার এ সম্পর্কিত মন্তব্য হল 'মিঞা বাড়ির ছেলে দোকান দার হবে ? ছিঃ ছিঃ।" [১০]

তাই বলে ফেলু মিঞা আদর্শে অটল নয়। মিথ্যা অহংকার এতদিন টিকে থাকলেও মন্বন্তরের ফলে সে শ্বশুর গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফেলু মিঞা সংশপ্তক উপন্যাসে একটি ট্রাজিক চরিত্র। লেকু সংশপ্তক উপন্যাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। মন্বন্তরের সময়ে চরম দুর্দিনে খাজনা দিতে বলায় সে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং রামদয়ালের প্রজা হয়ে থাকতে রাজী নয়। এমন কি গ্রাম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে সকল পুঁজিপতি এক। সকলে বুর্জোয়া। সকল শোষক একই। "মিঞার প্রজা অথবা রাম দয়ালের প্রজা কথাতো একই। চাষা ভূষোর আর কি ভবিষ্যৎ"। (সংশপ্তক, পৃ·৮৫)এই হচ্ছে লেকুর কথা। "ঘরে যার ভাত নেই সে কী মানুষরে আমুরি। সে যে অমানুষ, জানোয়ার নইলে তোর মত লক্ষ্মী বউকে এমন করে হেঁদাবার।"(সংশপ্তক, পৃ·৩৮)। এ সংলাপের মধ্য দিয়ে লেকুর চরিত্র প্রকাশ পায়।ঘরে ভাত নেই বলেই, এ শ্রেণীগুলি অমানুষ হয়।

রামদয়াল একটি অর্থলোভী চরিত্র। রামদয়ালের কাজ চাল, ডাল, সুপারীর আড়তদারী, রেশনের তেল চিনি কাপড়ের ডিলারী। বিচিত্র ধরনের কারবার রামদয়ালের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাজারে তাঁর ব্যবসা ফেঁপে ওঠে। রামদয়াল যে কোন পথে অর্থ উপার্জনে বিবেক ও মনুষ্যত্ব বিবর্জিত। দুর্ভিক্ষ চলাকালে পার্শ্ববর্তী বাকুলিয়া গ্রামের চোরাকারবারি রমজানকে সে দুঃস্থ নারীদের পণ্য হিসাবে চালান দেবার কাজে সহায়তা করে অর্থ উপার্জন করে।

রমজান সংশপ্তক উপন্যাসের একক ডিলেন চরিত্র। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ চরিত্রটির অশুভ তৎপরতা অন্যান্য সকল চরিত্রকে প্রভাবিত কিংবা আঘাত

করেছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ চরিত্রটি বিস্তৃত। ভিলেনের বৈশিষ্ট্য সকল এ চরিত্রটির মধ্যে রয়েছে। তবে ভীরুতা এবং দুর্বলতা চরিত্রটিকে এন্টিহিরো হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। নতুবা রমজানই হতো সংশপ্তকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার দুর্তপনা, ক্রুরতা, হিংসা, চাতুরি, অর্থলোভ, অশিক্ষিত হয়েও ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অন্য সকল চরিত্রকে ম্লান করে দিয়েছে।

এ চরিত্র সম্পর্কে বলা যায় - নায়েব হিসেবে সে যথেষ্ট দক্ষ, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা পত্র আদায়ে, তালুকদার ফেলু মিঞাকে পরামর্শ দানে তার জুড়ি আর কেউ ছিল না। এমন কি নিজ গ্রামবাসী দিন মজুর কসির, মজর আলী, লেকু এদেরকে বাকি খাজনার দায়ে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে সে কোন রকম দ্বিধা করে নি। তা ছাড়া দুর্ভিক্ষের সময় রমজানের অবস্থা আকস্মিক ভাবে স্ফীত হয়ে উঠে। রমজান চরিত্র সম্পর্কে ইদ্রিস আলীর এ অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য -

> "তালুকদার জমিদারের অধীনস্থ কর্মচারী বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রত্যক্ষ বাস্তবায়নকারী যে সব চরিত্র পাকিস্থান আমলের বাংলাদেশী উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে, তার মধ্যে শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'আলম নগরের উপকথা' গ্রন্থের সৈয়দ আসলাম ও শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক'এর রমজান উল্লেখযোগ্য।" [১১]

সংশপ্তক সম্পর্কে বলা যায় সকল চরিত্র সমান ভাবে উজ্জ্বল নয়। বিশেষত উপন্যাসটির ঘটনা মহাকাব্যিক ধর্মী বিস্তৃত হওয়ার কারণে ঘটনার সাথে সাথে কিছু চরিত্রও স্থূল হয়ে পড়েছে। অবশ্য এত দীর্ঘ পটভূমিতে প্রতিটি চরিত্র গাঢ়বদ্ধ হওয়া খুব কঠিন। তবে কিছু চরিত্রের প্রতি লেখক যে খুব সচেতন এবং আন্তরিক ছিলেন তা চরিত্র সমূহের বিকাশ দেখে অনুভব করা যায়। তার মধ্যে ফেলু মিঞা, রমজান, রাবু, জাহেদ, হুরমতি এবং মালু উল্লেখযোগ্য।

সংশপ্তকের প্রসঙ্গে ভূইয়া ইকবাল বলেন -

"কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি দানে, ঘটনার নতুনত্বে ও কুশলী বিন্যাসে, চরিত্র-রূপায়ণে, স্বতন্ত্র গদ্যরীতির প্রবর্তনে, আঞ্চলিক ভাষার দক্ষ ব্যবহারে, মানব-মনের অতল গভীরে প্রবেশ করে তার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব উন্মোচনে, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ও পরিবারের সমস্যাবলী উপস্থাপনে শহীদুল্লাহ যে শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন সে জন্য পূর্ব বাংলার একজন প্রধান ঔপন্যাসিকের শিরোপা তিনি অর্জন করতে পেরেছেন।" [১২]

প্রায় সমালোচক স্বীকার করে নিয়েছেন সংশপ্তক পূর্ব বাংলার সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে উৎকৃষ্টতম সার্থক উপন্যাস। জহুর হোসেন চৌধুরী ভূমিকায় লিখেছেন -

"সংশপ্তক যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা স্বীকৃত। রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসকে সার্থক করে তোলার কঠিন কাজে জীবনের অন্য ক্ষেত্রের ন্যায়ই শহীদুল্লাহ কায়সার সফল হয়েছে। এ দেশে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত জীবন নিয়ে এবং অসাম্প্রদায়িক জীবন বোধে অনুপ্রাণিত প্রথম সার্থক সৃষ্টি 'সংশপ্তক' বইটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, যতদিন যাবে বইটির অন্তর্নিহিত মূল্যের উপলব্ধি যে আরও ব্যাপক হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।" [১৩]

সংশপ্তক উপন্যাসে লেখকের সমাজ চেতনা এবং যুগ চেতনা দুটাই গভীর। যুগ চেতনা সম্পর্কে জনৈক আলোচক বলেছেন -

"স্থিতলক্ষ্য জীবনবোধে এবং যুগ চেতনার গভীরতায় আমাদের আরো কয়েকখানি উপন্যাস অনন্য সাদৃ। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক'(১৯৬৫) এবং সরদার জয়েন উদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা'(১৯৬)। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দাঙ্গার পটভূমিতে জাহেদ, রাবু এবং কালক্রমে বিবর্তমান সেকান্দরের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সাধনার প্রবল প্রতিপক্ষ ফেলু, রামদয়াল আর তাদের সমশ্রেণীর কিছু মানুষ ... সব মিলিয়ে এ গ্রন্থে বিষয়ের আর বক্তব্যের পরস্পর নির্ভর যে সম্পূর্ণতা পাই, আমাদের উপন্যাসে তা সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার্য, শিল্পবোধ আর রচনার

সংযমের অভাবে 'সংশপ্তক' দীন। পড়বার সময় অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, এ গ্রন্থ যেন বেহিসেবী নির্বাচনের এক রাশি ঘটনার বিশৃঙ্খল বিন্যাস।" [১৪]

প্রায় এক যুগের পরিধিতে সংশপ্তক উপন্যাস। বাকুলিয়া তালতলি গ্রাম, এর সাথে কলকাতা ও ঢাকার নগরজীবনকে উপজীব্য করে সংশপ্তক উপন্যাস গড়ে উঠেছে। পূর্ব বাংলার উপন্যাসের ধারায় এটি কলকাতার উপর ডকুমেন্টারী অনন্য সৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সাতচল্লিশ-এর দেশ বিভাগকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত পূর্ব বাংলার অন্য একটি উপন্যাস সরদার জয়েন উদ্দিনের 'অনেক সূর্যের আশা' সংশপ্তকের তুলনীয় হয়ে উঠে নি।

মাত্র দুটি উপন্যাস রচনা করেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার। অবশ্য সংখ্যায় নয় চিরঞ্জীবি হন ঔপন্যাসিক নান্দনিক শিল্প গুণে। তবু আক্ষেপ করে বলতে হয় স্বাধীনতার শত্রু হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদুল্লাহ কায়সারের অকাল মৃত্যু না হলে আমরা আরো কিছু উপন্যাস হয়তো তাঁর কাছ থেকে পেতাম। আমাদের এখানেই সান্ত্বনা সংখ্যায় না হলেও সাহিত্যের গুণে সমাদৃত-শহীদুল্লাহ কায়সার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে ভয় বিহ্বলতায় এক দুর্গম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সংশপ্তকে। সংশপ্তকের লেখকের চেতনায় সব সময় কাজ করেছে সে যুগের মানুষের অবিকল প্রতিচ্ছবিকে ধরার প্রয়াস। মূলত একজন সৃজনশীল লেখকের কাঠামো হচ্ছে জীবনের অনুকরণ। শহীদুল্লাহ কায়সার 'সংশপ্তক' উপন্যাসে তাই করেছেন।

ছোট খাট ত্রুটি বিচ্যুতি বাদ দিলে বলতে হয় মন্বন্তর বিপর্যস্ত একটি বিশিষ্ট সময়ের মানুষের ক্রিয়াকলাপের নিপুণ রূপকার শহীদুল্লাহ কায়সার। চরিত্র নির্মাণে সহায়ক হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মানুষের জীবনের জ্বলন্ত ও বিচিত্র প্রবাহ আবিষ্কার করেছেন তিনি।

সময়ের সাথে সমান্তরাল হয়ে এগিয়েছে 'সংশপ্তক'। যার সঙ্গে দিকবদল এবং মনোভঙ্গির ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শহীদুল্লাহর সংশপ্তক সব দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে গর্ব করার যোগ্য একটি উপন্যাস। একথা স্বীকার করার উপায় নেই পূর্ব বাংলার উপন্যাসে তার একটা প্রতিনিধিত্বমূলক স্থান রয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'সংশপ্তক', মুক্তধারা ঢাকা থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে। এর ষষ্ঠ সংস্করণ হয় ১৯৮৮ সালে। এগবেষণা পত্রে সেখান থেকে উদ্ধৃত করা হল।

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর', কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ·৩৮৪।

৩। ভঁইয়া ইকবাল : 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজ চিত্র, বাংলা একাডেমী ঢাকা, কার্তিক ১৩৯৮, পৃ·১৮১।

৪। যতীন্দ্রচন্দ্র সরকার, পাকিস্থান উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা, পৃ·৩৩ - বাংলা একাডেমি পত্রিকা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ·৩৩।

৫। শহীদুল্লা কায়সার : ভূমিকা, সংশপ্তক, পূর্বোক্ত সংস্করণ।

৬। যতীন্দ্রনাথ সরকার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ·৭।

৭। রণেশ দাশগুপ্ত : 'উপন্যাসের শিল্পরূপ', ২য় সংস্করণ কালি-কলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ·২২১।

৮। রণেশ দাশগুপ্ত : তদেব, পৃ·২৩৩।

৯। রণেশ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃ·২২৩।

১০। মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, (১৯৪৭-৯০) বাংলা একাডেমি। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ·১৩৪।

১১। মুহাম্মদ ইদরিস আলী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·১৩৮।

১২। ভূইয়াঁ ইকবাল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·১৮৫।

১৩। জহুর হোসেন চৌধুরী, সংশপ্তক, গ্রন্থ সংযুক্ত ভূমিকা।

১৪। আতাউর রহমান : 'আমাদের সাহিত্য', : (পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস। সম্পাদনা - সরদার ফজলুল করিম।) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ·১৬২।

খেলার প্রতিভা

পঞ্চাশের মন্বন্তরের যন্ত্রণাকে অনেক ঔপন্যাসিক উপলব্ধি করেছেন মর্ম হৃদয় দিয়ে। এ স্থানে তারা অভিন্ন। কিন্তু প্রকাশভঙ্গি তাদের স্বতন্ত্র। তবু নির্মাণশৈলীতে উপন্যাসগুলির মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। একটি উপন্যাস ছাড়া। সে ব্যতিক্রমী উপন্যাসটি কমলকুমার মজুমদারের(১৯১৪-১৯৭১) 'খেলার প্রতিভা'(১৯৭৭)।[১] 'খেলার প্রতিভা' লেখা হয় পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকা নিয়ে। ঘটনা ঘটে যাবার প্রায় চৌত্রিশ বছর পর। কমলকুমার তখন পরিপক্ক, সিদ্ধহস্ত। 'অন্তর্জলী যাত্রা' নামক কমলকুমারের প্রথম উপন্যাস ১৩৫৬ অব্দের আশ্বিনে প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দেড় যুগ পর ১৩৮৪ অব্দের বৈশাখে প্রকাশিত এ উপন্যাসে এসে ও লেখক বৃহৎ পাঠক গোষ্ঠির জনপ্রিয়তা কুড়াতে পারেননি। "পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কমলকুমার কলকাতার মহীশূর রোডে একা একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন।"[২] এ সময় তিনি লাভ করেন মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণার কিছু মানুষ পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঘর গৃহস্থালি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে, তাদের জীবনের এই দুর্যোগ সময় 'খেলার প্রতিভা'র বিষয়বস্তু। কমলকুমারের অন্যান্য লেখার মতো খেলার প্রতিভা ও জনপ্রিয়তা সমৃদ্ধ লেখা নয়। যথা সম্ভব সর্বস্তরের জনপ্রিয়তা কমলকুমার নিজেই চাননি, কারণ তাঁর লেখার মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে তিনি একটা দুরূহতার বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে বলয় ভেদ করা সর্ব শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই কমলকুমারের অন্যতম সমালোচক রফিক কায়সার বলেছেন -

> "সুহাসিনী পমেটম', 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক', এবং 'খেলার প্রতিভা'র মতো উপন্যাস বাঙালী পাঠকের মর্মমূলে গেঁথে রাখতে দিলেন না কমলকুমার। লেখকের আরোপিত এবং সুসৃষ্ট গদ্যশৈলী - এই ক্ষেত্রে এক মাত্র বাধা। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নেই"।[৩]

সম্ভবতঃ এ কারণে প্রায় চল্লিশ বছর সাহিত্য চর্চা করেও কমলকুমার জনপ্রিয় শিল্পীর মর্যাদা পাননি। কমলকুমার মজুমদারের রচনাকে জয় করার জন্য দরকার, দুর্ভেদ্যকে ভেদ করার সাধনা। কিন্তু পাঠকের বৃহৎ গোষ্ঠি সে পরিশ্রমে নিরুৎসাহী। অন্যদিকে

যুগের সাথে কমলকুমারের রচনাশৈলীর তাল মিলেনি। তাঁর ভাষাভঙ্গি, ক্রিয়ারূপের সন্ধি, সমাসের ব্যবহার, ভাষার অবয়ব, বঙ্কিমের সমসাময়িক বলে মনে হয়। ফলে গদ্য-পদ্যের সীমান্তের ডামা দিয়ে কমলকুমার যে অনর্গল ভাব প্রকাশ করে গেলেন তার কাব্যময়তার চেয়ে দুরূহতা পাঠকের চোখে বড় হয়ে উঠল। বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর পরবর্তী কালের একজন লেখক তার রচনা শৈলীতে অস্বীকার করল বাংলা গদ্যের এগিয়ে আসা একশ বছরের বিবর্তনবাদ। যদিও কমলকুমারের প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভাষাই পাঠকদের আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তী কালে কমলকুমার সে ভাষারই উৎকর্ষতার চরম শিখরে উঠতে গিয়ে পাঠকদের থেকে সরে পড়েছিলেন।

'খেলার প্রতিভা'র কাল পঞ্চাশের মন্বন্তরের যাত্রার দিকের কিছু সময়। মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাস সমূহের মধ্যে এটিই একমাত্র উপন্যাস, যার কাহিনী খুব সংকীর্ণ। মন্বন্তর আশ্রয়ী অন্যান্য উপন্যাসে যেমন প্রেম, চরিত্রদের সমাজ জীবন, সময়ের মন্বন্তর বহির্ভূত অন্যান্য বিষয় এসে জায়গা জুড়ে নেয়, এখানে তা ঘটেনি। নিয়তি তাড়িত ঠাকুরাশ্রয়ী কিছু চরিত্রের, যাদের কোন নাম পরিচয় নেই, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাদের বাস্তু ত্যাগ করে বাঁচার উন্মুখ গতি এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মন্বন্তর শুরু হলে চব্বিশ পরগণার রিখিয়ার এ মানুষগুলি নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে পথে নেমে পড়ে। ক্রোশের পর ক্রোশ পথ তারা হাটে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর তারা দেখে এক দোতলা বাড়ী থেকে তাদের প্রতি ছুড়ে দেয়া এক ঠোঙা চাল। সে চাল নিয়ে শুরু হয় কাড়া কাড়ি, মারা মারি, এমনকি অনেকে মারা পড়িল। সেই সামান্য চাল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে যখন অনেকে মারা যায়, তখন বোঝা যায় মন্বন্তরের প্রকটতা কতটুকু। এর পর তারা মৃত দেহ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রথমে যারা বলতো ''মড়ার গন্ধে আর টাকা যায় না'' (খেলার প্রতিভা, পৃ.১৭)।
পরে ''ক্রমে তাহারা আকালের প্রচন্ড কোপ দর্শনে চোয়াল ঘর্ষণ করিতে শিখিয়াছে, এখন আর নাকে কাপড় দিবার মতি নাই''(খেলার প্রতিভা, পৃ.১৮)। কাদা জলে ডুবে থাকা পেছল পথ কোন রকমে পার হয়ে তারা ভেড়ীর পথে ওঠে। সাথে সাথে নীচে জমি থেকে হুঙ্কার আসে ''তোমরা যাহারা ভেড়ীতে, এখানে নামিবে না, জানিও রক্তগঙ্গা বহিবে'' (খেলার প্রতিভা, পৃ.১৮)।কিন্তু এই বাক্যবাণ এই হাভাতেদের মাঝে কোন

ভীতির সংস্কার করে না, তারা নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে গেলে শুনে "ভাল মানুষী করিতে হইবে না। আমাদের কুলায় কিনা সন্দেহ, সোজা চলিয়া যাও। ভেড়ী হইতে নামিবে না"। (খেলার প্রতিভা, পৃ-১৮)। ধমকের মূল কারণ এখানে - হুংকারকারীরা নিজেরাও হাভাতে, তাদেরই কুলায় কিনা সন্দেহ। ফলে তারা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। অপ্রত্যাশিত ধমকে দলটি একে অন্যের মুখের দিকে চায়। তারপর তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে বলে "আমাদের রাস্তায় নামিতে দাও, আমরা অমুক পূর্বের পথ ধরিব ... মা কালীর কিরা ... আমরা যদি অযথা বলি তবে তোমাদের বিষ্ঠা খাই।"(খেলার প্রতিভা, পৃ-১৯)।

এরপর তারা ভেড়ী থেকেই শুনে কেউ মাগিতেছে, মাগো একটু ফেন দাও। এবার তারা আতঙ্কিত হয় ভিক্ষাবৃত্তি দেখে। কারণ তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। তাদের এখনো আশা যে তাদের এ সাময়িক দুর্দশা কেটে যাবে, আবার ঠাকুর মুখ তুলে চাইবে।

ভিখারী শব্দ উচ্চারণেও এরা ঘৃণা বোধ করে। ভিখারীর গান "ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক" তাদের কেউ একজন উচ্চারণ করলে সকলে রেগে যায়। 'ভিখারী' শব্দটা উহ্য রাখতে বলে 'আমার শত্রুকেও' যেন উহা কোন সূত্রে বলিতে না হয়। ভিক্ষুক হতে তারা আতঙ্কিত। তারা আশা করে এ দুর্যোগ থেকে উদ্ধার হবে, কিন্তু আশার সাথে বাস্তবতার দূরত্ব বেড়ে চলে। খিদের যন্ত্রণায় পেটে হাত লেগে চমকে ওঠে। গভীর অবসন্নতার কোটরাগত চোখে জেগে ওঠে দীর্ঘদিনের অবচেতন মনের স্বপ্ন "ঐখানে ভারি ধুম, যজ্ঞী বাড়ী, সাতদিন চলিবে, পত্তনিদার বাবুর মেয়ের বিবাহ। বাবুর ইচ্ছা সবাই আসুক। ভেড়ী পথ দিয়া যাহারা যায়। খাইবে ছড়াইবে।"(খেলার প্রতিভা, পৃ-১০৪)। কিন্তু এ অলীক স্বপ্ন' মৃত্যু পথ যাত্রী মানুষের অলীক কল্পনা। এর মধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটে অনাহারে। চোখের উপর অনেকে দেখে সে দৃশ্য। ফলে জমিদার গিন্নির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পরম কাঙ্খিত ভাত পেয়ে স্বজন হারানো জীবিত বালকটি থু থু করে খাদ্য ছুড়ে ফেলে। জমিদারের নায়েব জানতে চায়, খাদ্য গ্রহণ যোগ্য নয় কিনা ? তীব্র ঘৃণায় বালকটি বলে "ওয়াক, বিষ্ঠা বিষ্ঠা মল মূত্র আমি খাইব না।" (খেলার প্রতিভা, পৃ-১৭০)। বালকটির অসহায় রাগ যা করুণ সুরে

বলে, "... আমাদের অনেক সন্তান আকাল লইয়াছে এই মাত্র জীবিত, যখন আমাদের কনিষ্ঠ সন্তান অনাহারে মরিল, মরিবার কালে পাওা না, ভাত খাইব বলে, সেই শুনিয়া এই বালক উদাস হইল"(খেলার প্রতিভা, পৃ·১৭১)। বলতে বলতে কান্নায় ডুকরে ওঠে শিশুটির মা। দলের মধ্যে এক ওঝা ছিল। তার ধারণা ছেলের এ আচরণ অশুভ শক্তির আক্রমণ এবং ভাতের অপমান। ওঝা'র ন্যায় হাভাতেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে 'কেন এল সংকট'? যদিও এরা সংকট সৃষ্টিকারী আসল ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার মতো দুঃসাহসী হয়নি। কিন্তু ক্ষোভ যে কত তীব্র তা বোঝা গেল। কারণ ভাত বিষয়ক সমস্ত কিছুকে তারা সংস্কার এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। তাই ওঝা ধরে নেয়, এ যে ভাতের অপমান। এ অপমান হচ্ছে বলেই, আজ এ দশা। এখানে মূলত লেখকের ইঙ্গিত, মন্বন্তরের মূলে ভাতের অপমানই। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যেছা-তার, খাদ্যের অপব্যয়, খাদ্য পাচার, খাদ্য নিয়ে জুয়োচুরির ফল। অমর্ত্য সেনের 'Exchange entitlement' ও যা ব্যাখ্যা দিচ্ছে তার সংকীর্ণ দৃশ্য কমলকুমারের এ প্রতিকী রূপ। এর বিরুদ্ধে ওঝার প্রতিরোধ, "ভাতের অপমান, তাইত আমাদের এই দশা, আমি উহাকে খাওয়াইব আকাল ছাড়াইব, এরপর ওঝা এমন মার মারে যে ফিনকী দিয়ে রক্ত বের হয়। বালকটির বিশীর্ণ মাতা পিতা বলল, 'মহাশয়, আর মারিবেন না। আমরা উহারে লইয়া অন্যত্র যাই'।(খেলার প্রতিভা, পৃ·১৭১)।

'আকালের কূট বাস্তবতায় এমন করুণ অভিজ্ঞতা বাংলা গল্প উপন্যাসে খুব বেশী নেই।'[৪] উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সেই আকালগ্রস্ত মানুষগুলির শ্রেণী চেতনার এক নজির। সে আকালিদের দল কিছু খুদ চাল রান্না করতে গিয়ে জ্বালানী হিসাবে এক পা কাটা এক মৃত ভিখারীর ঠ্যাঙা গাছ-লাঠিটি জ্বালানী হিসাবে নেয়। ভিখারিটি মরেছে, অতএব তার জিনিষ গ্রহণ নিয়ে মত বিরোধ হয়। একজন বলল, "তোরা জাতে কি। ছিঃ ঘেন্না পিত্তা নাই," (খেলার প্রতিভা, পৃ·১৮২)।

অল্প বয়সি বালকটি বলল, -'হা হা আমার বাপের শ্রাদ্ধের জন্য লই। কিন্তু হয়ে ঠ্যাঙা গাছটি সে ফেলে দেয়।

মেয়েটি গম্ভীর সুরে বলল 'ভিখারীর জিনিসত বটে।" (খেলার প্রতিভা, পৃ·১৮২)।

অন্ন সংগ্রহের আশা ছেড়ে দ্বারে দ্বারে ক্ষান খুঁজে বেড়াচ্ছে যারা, এখনও তাদের মধ্যে প্রখর হয়ে জেগে আছে শ্রেণী বৈষম্য, এ বৈষম্য ভিক্ষাবৃত্তির সাথে তাদের পেশার। প্রচন্ড ভয় তাদের ভিক্ষাবৃত্তিকে। ঠাকুরের কাছে তাদের অনেক মিনতি, যেন তাদেরকে কখনো ভিক্ষুক না করেন। এদিকে ভাত তখনো পুরো সিদ্ধ হয়নি জ্বালানীর অভাবে। তারপর কে যেন সেই ভিক্ষুকের ঠ্যাঙাটা এনে উনুনে ঢুকিয়ে দিল। সকলে খেতে বসে। এমন সময় কেমন এক গন্ধ। নাভি ওঠে আসে এমন এক পচা দুর্গন্ধ। অল্প বয়সী বলেছে যে, ঠ্যাঙা বেশ গরম। সবাই গম্ভীর হয়ে যায়, তবে কি উহা রক্ত মাংসের পাতে পরিবর্তিত হয়েছে। এমন সময় উপস্থিত অন্য এক ভিখারী, তারও পা নাই, অনুনয় করে বলল 'আমারে দিবে না ?' লেখকের ভাষায় "আকালে যারা আৎকায় নাই, এই ঈষৎ কাতোরোক্তিতে তারা পিন্ডে, দলা পাকিয়ে গেল। সেই বিশ্রী গন্ধ নাকে আসছে। ক্ষণেকে ঘোর কাটলে হুঙ্কার দিল 'শালা। আহার্য সকল আমরা জলে ধোত করি।"(খেলার প্রতিভা, পৃ০১৮১)।

আহার্য পড়ে থাকে। কেউ দ্রুত পদে উনুনের দিকে গিয়ে ঠ্যাঙা তুলে নিলে গন্ধ চলে যায়। এতক্ষণ মৃত ভিখারীর ঠ্যাঙাটিকে তারা তার ছিন্ন পদখন্ডই মনে করে। তাদের মনে হয় ভিখারীর পা'টাকেই যেন তারা রান্নার জন্য জ্বালানী বানিয়েছে, তাহলে তাতো নরমাংস ভোজনের তুল্য হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কাজটি যে করতে হয়নি এ ভেবে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ভাবে আমরা এই আকালেও পাপ খন্ডন করেছি। বিজলি সরকার এই বোধের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুন্দরভাবে -

> "আকালের প্রচন্ড ঝাপটে এই নিতান্ত তুচ্ছ মানুষগুলির মানবিক মূল্যবোধ সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবারই কথা। আর শুধুই তো আকালের আক্রমণ নয়, গ্রাম বাংলার অবতল বাসী এই মানুষদের স্থায়ী দুর্দৈব নানা ভাবে ভোগ করতে হয় জমিদার উচ্চ বিত্তদের হাতে। এদের সমবেত শোষণ অত্যাচারে ঘনিয়ে আসা দৈনদশা আকাল প্রতিতার চেয়ে কিছু কম নয়। তবু দীন দরিদ্র এই নরনারায়ণদের লজ্জা, দয়া, সহবৎ একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায় না। বেঁচে থাকার চরম সংকটেও মনুষ্যত্ব বোধে, চারিত্রিক দৃঢ়তায়, বীরত্বে, আত্ম মর্যাদায় আর অম্লান নৈতিক বোধে 'খেলার প্রতিভা'র এই সব চরিত্র আমাদের সশ্রদ্ধ আদায় করে নেয়।" ৫

'খেলার প্রতিভা'র বৈশিষ্ট্য আত্মকথনের মধ্য দিয়ে বর্ণিত উপন্যাসে, লেখক নিজেই আকালীদের কেউ। তাঁর অনুভূতি প্রকাশ পায় - আমাদের চেতনাতেও। ঘটনার গভীরে মোহাচ্ছন্ন করে আমাদেরকে। লেখক সামগ্রিক চেতনা প্রবাহের সৃষ্টি করেন তাদের মনে, এই অসময়েও যাদের চেতনায় আদর্শ টিকিয়ে রাখাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। খেলার প্রতিভার চরিত্রগুলির নির্দিষ্ট নাম নেই। মনুষ্যের স্থল থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা তখন অবস্থান করছে এক ইতর প্রাণীর পর্যায়ে, তাই ইতর প্রাণীর মত তাদের আলাদা কোন পরিচিতি নেই। তারা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরছে, খাবার পেলে ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। কখনো খাবার নিয়ে গুতোগুতি বা কাড়াকাড়ি করছে। এ সমস্ত চিত্র কমলকুমারের নির্মাণ শৈলীর গুণে মনে হয়, এই আকালীরা মানুষের জীবন যাপন ভুলে গেছে। মন্বন্তরের পরিণতির এমন বীভৎস দিক আর কোন ঔপন্যাসিক দেখাননি। এই ইতর প্রাণী রূপী মানুষদের কাতর উক্তি আমাদের মনে আঁচড় দেয়। তাদের উক্তি - "ফেন দাও তেঁতুল পাতা দিয়া খাইব, তোমাকে দুষিব না মা। এ হেন অমায়িক প্রতিজ্ঞা, যাহা ঐ সেই দরজার নিকট হইতে আসে, স্বর যে তাহা হাওয়াতে উড়িয়া যাইতেছিল।" (খেলার প্রতিভা, পৃ-২২)।

অন্য ঔপন্যাসিকদের সাথে কমলকুমারের তফাৎটা এখানে, তাঁর 'খেলার প্রতিভা'র চরিত্রগুলি আমাদের সহানুভূতি বেশী কাড়ে। মন্বন্তরের চিত্র দেখাতে কমলকুমার যে বিবরণ দিয়েছেন, যেমন "ঐ ধার বরাবর শ্বেত কচু গাছও নাই, লোকে খাইয়াছে কাঁটা নটে নাই, তাহাও লোকে খাইয়াছে, কাঁঠাল হয় নাই, শুধু খুব ছোট আমরুল শাক দুলে - (খেলার প্রতিভা, পৃ-২৪)।

এই বিবরণ আমাদেরকে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের কথা স্মরণ করায়। অশনি সংকেতে অনঙ্গ বৌ, মতি মুচিনী, কাপালী-বউ জঙ্গলে মেটে আলু তুলতে যায়, আলু জঙ্গলে লুকিয়ে রাখার কথায় বলে, কেউ এসে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ মানুষ খাদ্যের সন্ধানে হন্যে হয়ে বন জঙ্গলে খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাবাড় করে দিচ্ছে ছড়ানো ছিটানো অখাদ্য গুলিও।

খেলার প্রতিভা'য় তথ্য আছে "এখানে ছ-আনায় আড়াই পালি চাল।" (খেলার প্রতিভা, পৃ-২৪)।

বর্ণনার জন্য বিভিন্ন কৌশলের দ্বারস্থ কমলকুমার। কখনো হতভাগ্য দলের কেউ, কখনো তাদের জীবন যাপনের দুর্যোগের মন্তব্যকারী, কখনো কথক। যেমন নীচে কথকের ভূমিকায় দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে বলছেন, "এই সব দুর্দশার ঘটনা লিখিতে আমাদের যারপর নাই খারাপ লাগিতে আছে, ইহা শক দিবার জন্য না, ... ভারতে ত বটেই, অদ্য আছে, অনন্তকাল অবধি ইহা রহিবে, দুর্ভিক্ষ সর্বত্রই।" (খেলার প্রতিভা, পৃ.২৫)। সমস্ত উপন্যাসে বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কমলকুমার বার বার ফিরে গেছেন আবহমান গ্রাম বাংলার সুখের ঐতিহ্যের দিনগুলোতে। দেখিয়েছেন একদিন এই নাম গোত্রহীন মানুষগুলোর একটা নিজস্ব সমাজ, পরিবেশ ছিল। তারা বিভিন্ন ধরণের গল্প জানতো। নাম ডাক ছিল তাদের ছেলে গরুর লক্ষণ সমূহ জানার। বকনার ছেলের তফাৎ তারা বুঝতে পারতো। মেয়েরা গাত্র বর্ণের জন্য হলুদ মাখতো। বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে এলে, পাত্রী সাজ-গোজ করে বুট জুতা পরে বরপক্ষের সামনে যেতো। আর সজ্জিত কন্যা, নিজ বর্ষীয়সীদের আজ্ঞায় আঙুলের টিপে একটু হলুদ ছোপ লাগিয়ে নিতো, প্রমাণ যে সে রন্ধনেও নিপুণা।

আজ তারা নিজের ভাগ্যকে মিলিয়ে দেখছে, তা মানুষের ভাগ্য নয়। ভাবছে এটা কি ধরণের মানুষের জীবন। সমাজবদ্ধ মানুষ কিভাবে অনাহারে মরে, তাই তাদের ক্ষোভ, "হা হাটে মাঠে, শুনিলাম অনেক পুণ্যতে মনুষ্য জীবন।"(খেলার প্রতিভা, পৃ.৩৪)। ভাগ্য নির্ভর এই মানুষদের নিয়ে তাই লেখকের শ্লেষোক্তি- "আঃ ইহারা যখন জন্মায় - তখন সকল নক্ষত্রই কি খলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।"(খেলার প্রতিভা, পৃ.৩৪)। লেখকের এবং চরিত্রের ভাবনায়, এবং ভাষায় লেগে আছে গ্রাম বাংলার সংস্কার এবং সংস্কৃতি। তাই সমালোচক বলেছেন, '

> "কমলকুমারের দুষ্প্রাপ্য কথাশিল্প দুষ্পাঠ্যও বটে। দুষ্পাঠ্য গদ্যশৈলীর অন্তরালে হীরক বিন্দুর মতো আলোকিত করে আছে আবহমান বাঙলা এবং বাঙালী।" [৬]

তবে খেলার প্রতিভা উপন্যাসের বড় দুর্বলতা হচ্ছে এ উপন্যাসে কাহাযান বা উপাদানের অভাব। বুদ্দক এবং বক্তব্য প্রধান এ উপন্যাসে অপ্রতুল কাহাযান কোন চারিত্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। কেবল একটা জীবন দৃষ্টি, শত দুর্যোগেও আদর্শচ্যুত না হবার একটা

মহৎ লক্ষ্য তাদের আঁকড়ে রাখে। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায় উপন্যাস, জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়েও সৎ থাকার অভিপ্রায়।

এ ছাড়া সমস্ত উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় না কারা কিভাবে মন্বন্তর সৃষ্টি করেছে। এমন কি এ বিষয়ক কোন চরিত্রও নেই। তৎস্থলে তাদের সান্ত্বনা, 'ধনী নাই ফলে আমরা হাভাতে হইলাম' - বাস্তবে কিন্তু এটা পুরো বিপরীত।

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'খেলার প্রতিভা' প্রথম প্রকাশ হয় জানুয়ারী ১৯৭৭ সালে 'জার্নাল ৭০'এ। একই বৎসর বই আকারে প্রকাশিত হয় তাম্রলিপি, কলকাতা থেকে। এ গবেষণা পত্রে উদ্ধৃত করা হল সে তাম্রলিপি সংস্করণ থেকে।

২। হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়: 'উত্তরাধিকার', ষষ্ঠ বর্ষ : চতুর্থ-সপ্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭।

৩। রফিক কায়সার: 'কমল পুরাণ', প্যাপিরাস প্রেস, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ.২৬।

৪। বিজলী সরকার : 'খেলার প্রতিভা : হাভাতে অথবা 'মহান স্বভাব মানুষের গল্প', উত্তরাধিকার, ষষ্ঠ বর্ষ : চতুর্থ-সপ্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, জুলাই ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ.৪১।

৫। তদেব, পৃ.৫০।

৬। রফিক কায়সার : পূর্বোক্ত গ্রন্থ সংযুক্ত ভূমিকা।

আকালের সন্ধানে

উনিশশ আশি সালে খ্যাতনামা একজন পরিচালক একটি ছবি করতে যায় এক প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে। ছবির নাম আকাল। ঐতিহাসিক পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনাবলী নিয়ে নির্মিত হবে ছবিটি। সেই ছবির চিত্রনাট্য, পঞ্চাশের মন্বন্তরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে কিছু ছবির বাইরের সংলাপ এবং ছবি করতে গিয়ে, পরিচালক এবং তার ইউনিট যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার সংমিশ্রিত কথারূপ অমলেন্দু চক্রবর্তীর (১৯৩৪-)'আকালের সন্ধানে'(১৯৮২)[১] উপন্যাস। অমলেন্দু চক্রবর্তী পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় একেবারেই বালক। মন্বন্তরের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁকে আপাতঃ সর্ব কনিষ্ঠ বলা যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব বাংলার অন্য দুজন ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ(১৯৩২-) এবং আবু ইসহাক (১৯২৬-) বয়সে অমলেন্দু চক্রবর্তীর অনেকটা কাছাকাছি হলেও তাঁরা তাদের উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন মন্বন্তর সংগঠিত হওয়ার দুই দশকের মধ্যে। অপরদিকে অমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর আকালের সন্ধানে রচনা করেছেন, মন্বন্তর সংগঠিত হওয়ার প্রায় চার দশক পর। অবশ্য কমল কুমার মজুমদারের খেলার প্রতিভা উপন্যাসটিও এর কিছু দিন আগে (১৯৭৭ সালে) প্রকাশিত হয়েছে। তবে কমলকুমারের 'খেলার প্রতিভা' আধুনিক যুগে রচিত হলেও সেখানে কোন আধুনিকতার ছোঁয়া নেই। যা রয়েছে অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'আকালের সন্ধানে' উপন্যাসে। আকালের সন্ধানে শুধু যে আধুনিক যুগে রচিত তা নয়, সেখানে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে সেতু তৈরী করে এমন এক সংযোগ দেয়া হয়েছে, যাতে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে বিচরণ করতে কোন বিঘ্ন ঘটে না। চার দশক পরে পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে উপন্যাস রচনা করে অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমান করে দিলেন, শিল্পীরা এখনো মর্মবেদনশীল মন নিয়ে স্পর্শ করতে চায় - মন্বন্তরের সেই ভয়াবহ দুর্যোগকে। অবশ্য উপন্যাসটির জন্ম একটি চিত্রনাট্য থেকে। পরিচালক মৃণাল সেনের ছবি আকালের জন্য যে চিত্রনাট্য রচিত হয় - পরে তাইই উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়। আকাল ছবিটি শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের দুর্লভ সম্মান অর্জন করে।[২] এর আগেও পঞ্চাশের মন্বন্তরের কাহিনী নিয়ে ছবি নির্মিত হয়েছে, এবং

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কাহিনী নিয়ে নির্মিত অশনি সংকেত, সূর্য দীঘল বাড়ী প্রভৃতি ছবি চলচ্চিত্র জগতে আলোড়ন তুলেছে। অনেক পরে নির্মিত না হলেও মৃণাল সেনের 'আকাল' ছবি এ সব ছবির পরে নির্মিত। কিন্তু বিদগ্ধ দর্শকের কাছে এ ছবির আবেদন কোন অংশে কমে নি, সম্ভবতঃ শুধু তার পটভূমির কারণে।

'আকালের সন্ধানে' উপন্যাসের আগে মাত্র দুটি উপন্যাস রচনা করলেও এ উপন্যাসে অমলেন্দু চক্রবর্তীর লেখার ধার, ভাষার তীক্ষ্ণতা সুস্পষ্ঠ হয়ে ফুটে উঠে। আঞ্চলিক ভাষার সুদক্ষ প্রয়োগ এবং লেখকের বাগ্‌ভঙ্গি - মানিক, আলাউদ্দিন আল আজাদ বা কমলকুমারের ভাষার সাথে তুলনীয় হবার অধিকার রাখে। ঔপন্যাসিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন -

> উপন্যাসটির আঙ্গিক পরিকল্পনার প্রেরণা তিনি অনুভব করেন ফেডেরিকো ফেলেনির। এইট এন্ড হাফ ছবিটি থেকে। ফেলিনীর 'এ ফিল্ম উইদিন ফিল্ম, এই আঙ্গিকটি আমাকে আকর্ষণ করল, আকালের সন্ধানে লেখার জন্য আমি এই কাঠামোটি বেছে নিলাম। তবে এইটুকুই - বাকি সব কিছুই দীর্ঘ দেড় বছরের ঐকান্তিক প্রয়াস।"[৩]

অমলেন্দু চক্রবর্তীর আকালের সন্ধানে শুধু যে রচনাকালের দিক থেকে আধুনিক সময়ে রচিত তা নয়, কাহিনীর উপস্থাপনা এবং গল্পের বিন্যাসের দিক থেকেও এটা মন্বন্তরের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় আধুনিক। উপন্যাসটিকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়, এক, উপন্যাসের মধ্যে মূল গল্প মন্বন্তরের চিত্রনাট্যটি, দুই, সেই চিত্র নাট্যটির দৃশ্যায়নের ইতিহাস। বিনতা রায়চৌধুরীও লেখকের কথা অনুযায়ী উপন্যাসটা ত্রিকৌণিক, লেখক নিজে বলেছেন -

> "উপন্যাসটা ত্রিকোণিক (ক) প্রত্যক্ষ পটভূমি উনিশশ আশির গ্রাম (খ) ভাবনার জমি তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ (গ) আধার একটি ফিল্ম ইউনিটের বহু বিচিত্র মানুষজন, সুদূর গ্রামে তাদের দলবদ্ধ ক্যাম্পজীবন, চিত্র নির্মাণের অনুপুঙখ খুঁটিনাটি।" [৪]

আমরা উপন্যাসটিকে যে দুটি পর্বে ভাগ করেছি তার ঔপন্যাসিক কথিত ভাবনার জমি অর্থাৎ উনিশশ তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ পর্বটিকে একটা পরিচ্ছন্ন চিত্রনাট্য হিসাবে দেখে থাকি। এ পর্বকে দিয়ে ঔপন্যাস শেষ হলে, এটা উপন্যাস হিসাবে দাবী করার অধিকার হারাত। কারণ উপন্যাসে অনেক বিষয়ের বিস্তারিত থাকে, যা চিত্রনাট্যে প্রয়োজন হয় না, আবার চিত্রনাট্যে অনেক নির্দেশনা থাকে, যা উপন্যাসে অপ্রাসঙ্গিক এবং বেমানান। কিন্তু আমরা এই উপন্যাসে সেই কথারূপকে দৃশ্যায়ন করতে গিয়ে যে সমস্যা এবং অভিজ্ঞতা লাভ হয় শুধু যে তা পাই তা নয়, তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমাদের ঘটে, সেই উনিশশ তেতাল্লিশের আকালের উপর ছবি করার জন্য বাছাইকৃত গ্রামে যখন ফুটে উঠে, উনিশশ আশিতে ও অন্য তেতাল্লিশের উপস্থিতি, তখন গল্পটা আমাদের চেতনায় একটা কষাঘাত করে। একই শতাব্দীর সেই তেতাল্লিশ এবং আশির মাঝে সমাজ ব্যবস্থার কত মিল। একই শোষণ পদ্ধতি, একই সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া দাপট। তেতাল্লিশের মতো আশি'তেও গ্রামের অসহায় মানুষের বেচে থাকার সংগ্রামে গ্রামে পরাজিত হয়ে এবং বিশ্বাস হারিয়ে আবার শহরের পথে পা বাড়ানো। তবে পার্থক্যটা কি ? পার্থক্যটা,সেকালে শোষণের প্রাচীন পদ্ধতি। একালে শোষণের আধুনিক পদ্ধতি। সেখানে দুর্ভিক্ষ ছিল মন্বন্তর, একালে দুর্ভিক্ষটা নেপথ্যে। তেতাল্লিশে ছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, আশিতে চলছে নীরব দুর্ভিক্ষ। তখন অভাব ছিল অন্নের, বস্ত্রের। এখন অভাব সভ্যতার, সংস্কৃতির। তখন দুর্ভিক্ষকে কিছু সচেতন বোদ্ধা মানুষ বিষয় করেছে রাজনৈতিক উত্থানের, এখন সচেতন বোদ্ধা মানুষ তাকে বিষয় করছে - বিদেশী পুরস্কারের আশায় সমাজে প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য, কালো টাকার ইতিহাস পাল্টাবার জন্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপন্যাসের আলোচনায় চিত্রনাট্যের দৃশ্যায়ণ সমস্যা আমাদের আলোচ্য বিষয় হত না, যদি তা নিছক ছবি করার সমস্যা নিয়ে গল্প তৈরী হত। কিন্তু আমরা সে গল্পে পাই আধুনিক কালেও গ্রামে সেই সংকটের ইঙ্গিত, যে সংকট পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে ছিল। ছবির পরিচালক বা বর্ষীয়ান অভিনেতা জেনে রাখেন পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে অনেক তথ্য, এই তথ্যের অনেকখানি ছবির প্রয়োজনে নয়, বাস্তব আগ্রহের কারণে। ঔপন্যাসিক ছবির পরিচালক পরমেশ

মিত্র এবং বর্ষীয়ান অভিনেতা কিরণময় ভট্টাচার্যের কথোপকথন দিয়ে তথ্যগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি তথ্যগুলিকে কেন্দ্র করে আধুনিক মানুষের চেতনায়, সেই ঐতিহাসিক মন্বন্তরের যে বিশ্লেষণ, তাও আমাদের সামনে তুলে ধরেন, যা সবচেয়ে মূল্যবান। এর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি, ঔপন্যাসিক এ যুগে এসে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ববোধ প্রশংসনীয়। গ্রামীণ সংস্কার এবং গ্রামীণ দলাদলির রাজনীতি থেকে পরিচালক অভিনেতা চরিত্র পর্যন্ত রূপায়ণে অমলেন্দু চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান, এই নিষ্ঠা ছিল বলেই আমরা লাভ করেছি একটি বাস্তব নিষ্ঠ গল্প।

আকাল চিত্রনাট্যের গল্প সংক্ষিপ্ত হচ্ছে - উনিশশ তেতাল্লিশের জানুয়ারী। জাপানী যুদ্ধ বিমানের আক্রমণ চলছে। কলকাতা শহর ছেড়ে লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে গ্রামে। যুদ্ধের কথা বলে চাষীদের থেকে থানার মাধ্যমে ধান চাল কিনে নিচ্ছে সরকারের লোকজন। সরকারের সাথে পাল্লা দিয়ে ধান চাল কিনতে থাকে গ্রামের মজুতদার কেলো সামন্ত। থানা পুলিশের ভয়ে এবং ভাল দাম (মণ প্রতি দশ টাকা) পেয়ে চাষীর ঝোলা যখন শূন্য হাতে আছে কিছু নোট, তখন চাষীরা, টের পায় টাকার মূল্য অনেক পড়ে গেছে। বাজার থেকে ততদিনে আধা-পয়সা, এক পয়সা উধাও। এর পর শোনা যায় - নুন নাই, তেল নাই, কাপড় নাই - এমন কি হাট বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের লোকজন কিছুদিন পর অন্য উপায় না দেখে কলকাতায় লঙ্গর খানার উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকে। তারপর দেখা যায়, মন্বন্তর প্রকট, ঔপন্যাসিক কিছু খন্ড দৃশ্য তখন দেখান। যেমন - 'বেড়ালের মতো মাটি আচড়াচ্ছে মেয়েরা। হঠাৎ কিছু আবিষ্কার একজনের। কচু। হামলে পড়ল সবাই। কেড়ে খাবার আক্রোশ। নিঃসঙ্গ দাওয়ায় মৃতদেহ। পরিধানের বস্ত্র কেড়ে নিতে ব্যস্ত একজন জ্যান্ত মানুষ।"(আকালের সন্ধানে, পৃ-৬৬)।

তারিণী ভট্টাচার্য ওকেলো সামন্ত'র মতো লোকগুলি গ্রামে রয়ে যায়, চাষাদের অভাবের সুযোগ নেয়ার জন্য। নাম মাত্র মূল্যে তারা কিনে নেয় সোনাদানা, কাঁসা পেতল, জমি। শুধু তাই নয়, গ্রামের যুবতী মেয়েদের উপর -তাদের লোলুপ অত্যাচার শুরু হয়। গায়ের কায়েত পাড়ার অযোধ্যা চক্রবর্তীর মেয়ে মালতী বাবলা

কাঁটা তোলার পর সাঝের আধারে অন্য দশটা মেয়ের সাথে কাছারি বাড়ি যায় - কাজের বুঝ দিতে। মজুরীর বার্লি আর বাজরা নিয়ে যখন ফিরছিল, এক বাবু পিছন থেকে ডাক দেয়, পিছনে গিয়ে দল থেকে বিচ্ছেদ হয়ে পড়লে. একা পেয়ে তাকে সেখানে সারা রাত আটকে রাখে। মালতীকে অত্যাচার করা হলেও গ্রামের মুরব্বী মাতব্বররা খড়্য উঁচিয়ে শাসন করে যায় তার বেচারি বাপকে। মালতি শেষ পর্যন্ত কাছারিবাড়িতে দেহ পসারিনী বণে যায়। এ ছাড়া তার আর উপায় ছিল না। কারণ তাকে ঘরে তোলা হলে তার বাপকেও সমাজচ্যুত করা হবে।

সাবিত্রীকে নিয়ে অর্জুনের সংসার, ঘরে বৃদ্ধ বাপ চন্দ্রধর আর অর্জুনের শিশুপুত্র। চন্দ্রধরের তিন বিঘা জমি আছে, তা ছলে বলে আদায় করতে চায় কেলো সামন্ত। কেলো সামন্ত কাছারিতে আসর বসায়, কলকাতা থেকে আগত শহুরে বাবুদের নিয়ে। সেখানে ফুর্তি চলে। চন্দ্রধরকে হাতের মধ্যে পেয়ে যখন, জমি বিক্রির টিপ সই আদায় করতে পারল না, তখন শহুরে বাবুদের একজন কেলো সামন্তকে বলে, "ওর যা অবস্থা, এ তো আজ হোক, কাল হোক, কদিনের মধ্যেই মরে যাবে। একটু টরে টরে থাকুন - কালিবাবু। কাগজ পত্তর রেডি রাখুন। মড়ার আঙুঁলে কালি লাগিয়ে ছাপটা তুলে নেবেন। যা দিন কাল এ বাজারে কে আর কার খবর রাখে। আর উইটনেস ? সেও তো হাতের পাঁচ আপনার।" (আকালের সন্ধানে, পৃ.১০০)। মন্বন্তরের সামাজিক সমস্যা এ সময় দেখা যায়। অভাবের তাড়নায় জিন্নাত বেগমকে স্বামী তালাক দেয়। উপায় না দেখে চন্দ্র ধর জমি বিক্রির কথা বললে, সাবিত্রী চমকে উঠে বাধা দেয়। পুষ্টির অভাবে সাবিত্রীর শিশু সন্তান মৃত্যুর মুখোমুখী হলে সাবিত্রী কাছারি বাড়ি গিয়ে খাবার ও দুধ আনে নিজের সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে, অর্জুনের কাছে তা ছিল নিষ্ঠুর ত্রোধের উদ্রেককারী। উত্তেজিত অর্জুন লাঠি হাতে নিলেও, তার চোখে সাবিত্রীর আনা কাছাড়িবাড়ি থেকে এক কাড়ি শাদা ভাত বাবা ঠাকুরের শ্বেতপাথর - শিবলিঙ্গ হয়ে উঠে। পরদিন চন্দ্রধর জমি বিক্রি করে আসে। তিন মণ চালের বিনিময়ে কথা করে -. তিন বিঘা জমির টিপ নিলেও আধ মণ চাল দিয়ে কেলো সামন্ত বাকি চাল আর দেয় না। কারণ দেখানো হয় - সামন্তের ঘরেও চাল নেই,

ধানের দর নভেম্বরের দিকে এত চড়া হল, লোড সম্বরণ অসম্ভব হেতু গ্রামের মজুত চালও শহরের দিকে গড়ায়। শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরেও খোরাকিতে টান পড়ে। পর্দায় দেখানো হয়, এই মহা মন্বন্তরের পিছনে ভারত সচিব মিঃ আমেরির বক্তব্য -

"THE FAMINE WAS A ACT OF GOD.
L.S. Amery, Secretary of State for India
- Amrita Bazar Patrika - Tuesday, December
14, 1943'. (আকালের সন্ধানে, পৃ-১০২)

বাপ ঠাকুরদার চৌদ্দপুরুষের ভিটে ঘর ছেড়ে, সাবিত্রী চন্দ্রধর আর নেংটিপরা অর্জুন বেরিয়ে পড়ে পথে, অজানার উদ্দেশ্যে। মারা পড়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত অর্জুন, পুষ্টি-হীনতায় আগেই পৃথিবী ছেড়েছে তাদের শিশু সন্তান। এরপর অজানার পথে নেমেই রেল চাপা পড়ে চন্দ্রধর হতহলে সাবিত্রী গিয়ে কলকাতার ফুটপাতে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের ক্ষুধার মিছিলে সামিল হয়। সাবিত্রীকে পাওয়া যায় কলকাতার বেশ্যাপল্লির নোংরা ঘিঞ্জি গলিতে আর সব মেয়েদের সঙ্গে দরজায় দাড়িয়ে। সাবিত্রী বেচে থাকে, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় - আর একবার ধর্ষিতা সে। এর পর সাবিত্রীকে পাওয়া যায় একত্রিশে আগস্ট উনিশশ উনষাট এ রাজভবনের সিংহ দ্বারে ক্ষুধামিছিলে, পুলিশের লাঠির নীচে রক্তাক্ত অবস্থায়, উনিশশ একাত্তরে সীমান্ত শরণার্থী শিবিরে - এনামেলের বাটি হাতে সাবিত্রী আবার লঙ্গর খানায়, অনেক আকাল পেরিয়ে তখাপি বেচে থাকে সাবিত্রী।
- এ হচ্ছে 'আকাল' ছবির কাহিনী। উপন্যাসের অন্য কাহিনী গড়ে উঠেছে, এ আকাল চিত্রনাট্যটির ছবি নির্মাণের ঘটনা নিয়ে যার পটভূমি উনিশশ আশি সালের একটি গ্রাম, সে গ্রামে 'আকাল' ছবিটির সেলুলয়েডে ধারণ করতে এসেছেন পরিচালক পরমেশ মিত্র তার ইউনিট নিয়ে। গ্রামের নাম মোহনপুর। এ অঞ্চলে আর কেউ কখনো ছবি করতে আসেনি, ফলে গ্রামে একটা উত্তেজনাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীদের কিছু তরুণ এসে যেচে সহযোগিতার হাত বাড়ায়, আর কেউ সিনেমা কোম্পানীর পিছনে লাগে। ছবির একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র মালতি। মালতি চরিত্রের শিল্পী বিশ-বাইশ বছরের আরতী পরিচালকের অনুমতি না নিয়ে শখ করে চোখের ভ্রু কেটে ফেললে পরিচালক রেগে যায় কারণ এ ভ্রু কাটা আধুনিকতা আরতীকে যেকাপ করিয়েও মানিয়ে নেয়া যাবে না। এ নিয়ে

উদ্ধত পরিচালক ক্রুদ্ধ হলে মেয়েটি পরিবেশের সাথে সহজ হতে পারে না। ফলে সে কাজ না করে গোঁ ধরে চলে। পরিচালক তাকে ছবি থেকে বাদ দেয় এবং কলকাতা পাঠিয়ে দেয়। এ নিয়ে এক সমস্যা সৃষ্টি হয় - কারণ সে গুরুত্বপূর্ণ নির্যাতিত নারী চরিত্র করার মতো কাউকে পাওয়া যায় না। এ নিয়ে পরিচালক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে। গ্রামের এক ভদ্র পরিবারের মেয়েকে এ চরিত্রের জন্য আনতে গেলে সেখানে সৃষ্টি হয় আর এক উত্তেজনাময় পরিবেশ। গ্রামের সুবিধাবাদী কিছু মানুষ সিনেমা কোম্পানী থেকে অর্থ স্বার্থ আদায় করতে না পেরে তাদের বিরুদ্ধে এ সময় গ্রামের মানুষদের ক্ষেপিয়ে দেয়। এ জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রামের দলাদলি, কিছু ধূর্ত মানুষের নোংরা রাজনীতি, গ্রামীণ কুসংস্কার এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। পরিচালক পরমেশ মিত্রকে ছবির অগোছালো অবস্থায় গ্রাম ত্যাগ করতে হয় ইউনিট নিয়ে। গ্রামের হাত কাটা পরান এবং তার স্ত্রীর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান এখানেও মনুন্তরের কালো থাবা রয়েছে। তবে তা নীরব দুর্ভিক্ষ, যার খবর অনেকে রাখে না, সাবিত্রীর ন্যায় দুর্গা ও তার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য ক্যামেরার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীর কাছে ধিক্কারের পাত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সে গ্রামবাসী তার অপুষ্টির শিকার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসে না। ছবির একজন প্রবীণ অভিনেতা, কিরণময় ভট্টাচার্যের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির গভীরে ঔপন্যাসিক আলোকপাত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে, পরিচালক পরমেশ মিত্র, অভিনেতা কিরণময় ভট্টাচার্য, হরেন আওন, পরান, দুর্গা, মাণিক চাটুজ্জে, অভিনেত্রী আরতি। পরিচালক পরমেশ মিত্রকে শিল্পের স্রষ্টা হিসাবে তার চারিত্রিক উজ্জ্বলতা না দেখিয়ে ঔপন্যাসিক তাকে এঁকেছেন দাম্ভিক, গ্রাম্য-সংস্কৃতি এবং গ্রাম্য মানুষের প্রতি উদারতাহীন। দেখিয়েছেন ছবির আদর্শ এবং তার ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ এক নয়। পরমেশ মিত্র দুঃখী মানুষের দুঃখ নিয়ে ছবি করলেও বাস্তবে 'মেট্রোপলিটন বৈকুণ্ঠের এলিট দেবতা', বিনতা রায় চৌধুরী বলেছেন -

> "... পরমেশ দুর্ভিক্ষের ছবি করতে এসেছেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি নয়, তাঁর লক্ষ্য বিশ্বের দরবারে

কৃতি চিত্র-পরিচালকরূপে খ্যাতি অর্জন ও পুরস্কার গ্রহণ, একথা কিরণময় দ্বিধাহীন ভাবে পরমেশকে শুনিয়েছেন। ঠিক তখনই পরমেশের চিত্র-পরিচালনাগত বাস্তবনিষ্ঠার পশ্চাতে উদ্দেশ্যমূলকতা ও ফাঁপা শিল্পপ্রীতি ধরা পড়ে যায়। চিত্রনির্মাণের খুঁটিনাটিতে তাঁর বাস্তবতা রক্ষণের প্রচেষ্টাকে শিল্পের প্রতি আনুগত্য নয়, স্বার্থের প্রয়োজন বলে মনে হয়।" [৫]

উপন্যাসের প্রথম পর্বের 'আকাল' ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র সাবিত্রী চরিত্রটির ট্রাজেডি নির্মাণে আমরা একজন দক্ষ চরিত্র নির্মাতাকে লক্ষ্য করি। এ চরিত্রটি বহু মাত্রিক পরিবেশে ব্যাপ্ত। সাবিত্রী বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় বিধৃত একটি চরিত্র। দারিদ্র এবং পরিবেশের সাথে লড়াইয়ে গিয়ে সাবিত্রী চরিত্র বিসর্জন দেয় বেঁচে থাকার হাতিয়ার হিসাবে। কিন্তু বাঁচাতে পারে না তার সন্তানকে, স্বামী অর্জুনকে, কিন্তু ঔপন্যাসিক সাবিত্রীকে বাঁচিয়ে রাখেন, বা সাবিত্র বেঁচে থাকে, তার কার্যকারণ সূত্র দিতে ঔপন্যাসিক তথ্য এনে দেখিয়েছেন- "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের এক সমীক্ষার সিদ্ধান্ত - মৃত্যুহারে পুরুষ হারিয়ে দিয়েছে মেয়েদের, প্রতি এক হাজার মৃত বস্তিবাসীর মধ্যে ছ'শত একান্নজন পুরুষ এবং তিনশত উনপঞ্চাশজন নারী অথবা প্রতি এক হাজার মৃত পুরুষের বিপরীতে নারীদের সহমরণ সংখ্যা পাঁচশ ছত্রিশ। ... গৃহলক্ষ্মীরা ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে এল বেশী, মরল কম। কোথায় গেল তারা ? কোথায় সাবিত্রী ?

সেহায়দের জন্য অনাথ আশ্রম তৈরী হয়নি তখনও। কিছু সংখ্যক গড়ে উঠেছিল অনেক পরে যুদ্ধ শেষে। স্থির চিত্রে বেশ্যাপল্লি। নোংরা ঘিঞ্জি গলিতে আরো সব মেয়েদের সঙ্গে দরজায় দাড়িয়ে সাবিত্রী।"(আকালের সন্ধানে, পৃ.১১৭)।

উপন্যাসে পরমেশ মিত্র, অভিনেতা কিরণময় এবং শিল্পীদের আড্ডার সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় দুর্ভিক্ষের কারণ গুলি। যেমন কারণ দেখানো হয়, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। এসময় ইংরেজরা আগষ্ট আন্দোলনের পর কোন রাজনৈতিক দলকেই বিশ্বাস করছিল না তথ্য পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ টন মোটা চাল বার্মা থেকে

আমদানী হতো। বার্মার পতনে সে চাল আসা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ দেখানো হয়, ব্রহ্মদেশ হাত ছাড়া হবার পর ইংরেজরা ধরে নিয়েছিল আসাম, বাংলাদেশ আর রাখা যাবে না। অতএব চাষ আবাদের প্রচন্ড ক্ষতি কর, অন্যদিকে এলাকায় যা ফসল আছে লুটে পুটে নাও। এক,ডিনায়েল পলিসি, দুই,টাকার ইনফ্লেশন রাজভক্ত ইস্পাহানী, বা মজুতদার হনুমান বখ্রা তুলে নিল লাখ লাখ টন ধান। কলকাতায় যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদনকারী ফ্যাকটরী শ্রমিকদের যে করে হোক খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধান চাল সংগ্রহে নেমে পড়াতে এভাবে উধাও আরো হাজার হাজার টন। মৃত্যুর পরিমাণ হিসাবে বলা হয় পঁয়ত্রিশ কি পঞ্চাশ লাখ। মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী কিরণময় বলেন, "নিউক্লিয়ার যুদ্ধের আগেই আধুনিক নিউট্রন বোমার কনসেপচুয়াল প্রয়োগ ঘটে গিয়েছিল এ দেশে - ঘরদোর ব্যাংক-ট্রেজারি শস্য ভান্ডার সভ্যতা সবঅটুট থাকে, শুধু পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মরে যায় নিঃশব্দে"(আকালের সন্ধানে, পৃ-২১৩)।

সমালোচক বলেন -

> "শিল্পের বাস্তবতা ও বস্তুজগতের সত্য - এই দুয়ের দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্ক এই উপন্যাসের প্রধান প্রসঙ্গ, এবং এই সমস্যা জটিলতার চমৎকার রূপায়ণেই উপন্যাসটি মর্যাদা পেয়ে যায়।"[৬]

এ উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ ব্যাখ্যা করে ঔপন্যাসিক বলেন -

" ... এ ক্ষেত্রে কোন নৈসর্গিক হেতুকে দায়ী করা চলে না। ... বরং সর্বাধিক লজ্জাজনক ঘটনা, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ সরকারগুলোর কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক প্রশাসন কর্তাদের সীমাহীন অদূরদর্শিতা এবং পরিকল্পনাবিহীন কর্মকান্ড।" (আকালের সন্ধানে, পৃ-১১০)।

এ মন্বন্তরে যারা বলি হল, তারা জানে না কি তাদের অপরাধ ? তারা জানে না "বড় লাট - লর্ড লিনলিথগো কিংবা ওয়াভেল, ছোট লাট স্যার জন হাবার্ট অথবা স্যার টমাস রাধার ফোর্ডকে বা কেমন দেবতা তুল্য আকৃতি"।(আকালের সন্ধানে, পৃ-১১১)

পরিচালক পরমেশ মিত্র'র কিছু উদ্ধত আচরণ অসংগতিপূর্ণ মনে হয়। মানিক চাটুজের বাড়ীতে কিংবা হরেনের আনা মালতি চরিত্রের জন্য গ্রাম্য আর্টিস্ট স্বর্ণার বাবা শঙ্কা বাকুলির সাথে পরমেশ যে ভাষায় কথা বলে, তা দৃষ্টি কটু। একজন বোম্বা পরিচালক মনে হয়, এ রকম অর্থহীন আচরণ সচরাচর নিরাপরাধ মানুষের সাথে করে না। এ সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি বাদ দিলে উপন্যাসটি পুরো উপভোগ্য।

----- 0 -----

উল্লেখপঞ্জী :-

১। 'আকালের সন্ধানে' প্রথম প্রকাশিত হয় - দে'জ পাবলিসিং, কলকাতা থেকে, বৈশাখ ১৩৮৯, এপ্রিল ১৯৮২ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ হয় একই প্রকাশনী থেকে জুলাই-১৯৮৯ সালে। এ গবেষণা পত্রে সে সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি নেয়া হল।

২। আকালের সন্ধানে উপন্যাসের শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন, পূর্বোক্ত সংস্করণ।

৩। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্যের গবেষক ড. বিনতা রায়চৌধুরীর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (১৯ জুলাই ১৯৯০)এর সময় ঔপন্যাসিক বলেন।
সূত্র ড. বিনতা রায়চৌধুরীর গ্রন্থ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য' সাহিত্য লোক, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.১১৫।

৪। অমলেন্দু চক্রবর্তী, 'আকালের সন্ধানে' পরিচয়, মার্চ ১৯৮১, পৃ.৭৭।

৫। ড. বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৯৭, পৃ.১৫৯।

৬। অশুকুমার সিকদার : 'আয়নার মধ্যে আয়নায় একা', 'আজকাল', কলকাতা, ১৩ মার্চ, ১৯৮৩, পৃ.৩

কত ক্ষুধা

পঞ্চাশের মন্বন্তরকে পটভূমি করে ভবানী ভট্টাচার্য (১৯০৬-৯৯) So Many Hungers (১৯৪৭) নামে ইংরেজীতে একটি উপন্যাস লিখেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়(১৯১৯-) উপন্যাসটির বাংলা রূপান্তর করে নাম দেন 'কত ক্ষুধা' (১৯৫৩)[১]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে। নায়ক রাহুলের শহরের পরিবার এবং নায়িকা কাজলীদের গ্রাম্য পরিবারের কাহিনীর মধ্য দিয়ে - শহর এবং গ্রাম দুয়েরই মন্বন্তর কালীন চিত্রে দুই সমাজ এবং পরিবেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। পোড়া-মাটি নীতি, যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি মজুতদারী এবং নারী-ব্যবসার লোমহর্ষক চিত্র পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। কাজলী এবং তার ভাই অনুর বাল্য জীবনের মধ্যে বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দুর্গা এবং অপু চরিত্রের প্রতিরূপ দেখা যায়। আবার কাজলী এবং অনু চরিত্রের প্রতিচ্ছবি যেন আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের জোহা ও জহু। উপন্যাসের কাহিনীর প্রথম দিকে রাহুলের পরিবারের ঘটনা দেখানো হয়। সেখানে আদর্শবাদী নায়ক রাহুলের এবং তার ধূর্ত-ব্যবসায়ী পিতা সমরেন্দ্র বাবুর ব্যবসা, যুদ্ধ ঘিরে অশুভ তৎপরতা, রাহুলের আদর্শ নিষ্ঠা ইত্যাদি দেখানো হয়। এখানের ঘটনাগুলি মূলত যুদ্ধকে ঘিরে। মন্বন্তরের কোন প্রকট উপস্থিতি এখানে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের প্রায় অর্ধেক কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘিরে রচিত। অন্য পর্বে কিশোরী কাজলী এবং তার পরিবারের কাহিনী ঘিরে মন্বন্তরের প্রকট উপস্থিতি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন থেকে উপন্যাসটি শুরু। যুদ্ধ ঘিরে সংশয়, দ্রব্যমূল্য বাড়বে এই আশংকায় নয়, সম্ভাবনায় কি কিনে রাখা দরকার, রাহুলের বাবা মায়ের এই কথোপকথন এবং রাহুলের প্রথম সন্তানের জন্মগ্রহণ দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী শুরু। যুদ্ধের কথা শুনে - রাহুলের মার প্রথম চিন্তা "বলিস কি ? লড়াই শুরু হল ? কথাটা মুদির কানে ওঠবার আগেই তো তা'হলে মাগ ছয়েকের মত চাল আর তেল কিনে রাখতে হয়। বেজায় চড়ে যাবে জিনিসের দর।"(কত ক্ষুধা, পৃ.৩) ।

শিল্পীর চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে কর্তা সমরেন্দ্র বাবু। যুদ্ধের কথা শুনে ছেলে রাহুলকে বলে, "কাল ফড়কাবাজার তোলপাড় হবে। বাজার দর অসম্ভব চড়ে যাবে। বিন্দু মাত্র মন্দার ভাব থাকবে না। ইস্পাতের দর ধাপে ধাপে বাড়বে, সোনাও তাই অবস্থা দাঁড়াবে, কাকে ফেলে কাকে রাখি ? এমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে। ... আর্থিক দুনিয়ায় এখন নেপোলিয়ন হতে হবে বুঝলি তো ?" (কত ক্ষুধা, পৃ•১১)।

রাহুলের বাবার চোখের দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায় তিনি খুব চতুর। বাবার সাথে রাহুলের আদর্শগত মিল নেই, রাহুল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে ঘৃণা করে, জাপান-জার্মানের চেয়ে ইংরেজের উপর তার ক্ষোভ বেশী। কারণ রাহুল ভাবে - "যুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে তাদের ঠকান হয়েছে। লড়াই একবার কতে করে নিয়েই রাঘববোয়াল দেশগুলো কলা দেখাল। মিত্র শক্তি যদি এবার কিছুটা আন্তরিক হয়, তাহলে ভারতবর্ষ মনে প্রাণে তাদের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু তাদের যে আন্তরিকতা আছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিতে হবে। যুদ্ধে বলছ গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের জন্য এই লড়াই - কিন্তু সেই স্বাধীকার থেকেই যখন কোন দেশকে বঞ্চিত করে রাখো, তখন কেন সে দেশের লোক লড়বে ? ভারতবর্ষের নিজের নেই স্বাধীনতা, তাকে বলা হচ্ছে দুনিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়তে" (কত ক্ষুধা, পৃ•১৬)।

ধূর্ত সমরেন্দ্রবাবু যুদ্ধের ফটকাবাজার ধরতে শেয়ার ব্যবসায় গিয়ে লাভ-ক্ষতির মাঝে দৌড়াদৌড়ি করেছেন, কিন্তু লাভ করতে পারেননি। তবে লাভ করেছেন যুদ্ধবাজার থেকে অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন : লোহা, ইস্পাত, সুর্পের ব্যবসা ছেড়ে হাতে নিলেন চালের মজুতদারী।

জাগতিক রশ্মি নিয়ে রাহুলের গবেষণা। তার বাবাই তার মধ্যে জাগিয়েছেন বৈজ্ঞানিক চেতনা। না মানুষের উন্নতির জন্যে নয়, যুদ্ধের বাজারে ছেলে নাম করার জন্য। ব্রিটিশ শাসকদের তাবেদারী করে, অর্থ-ঐতিহ্য, নাম কুড়াতে যারা আগ্রহী ছিল, সমরেন্দ্রবাবু তাদের প্রতিনিধি। সমরেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় ছেলে কুণাল যুদ্ধের পক্ষে

নাম লেখায়। পোড়ামাটি নীতি শুরু হয়। যে নৌকা জেলেদের জীবন বাঁচন সেই নৌকা কেড়ে নেয়াতে তাদের মৃত্যুর পথ তৈরী হয়। চাষীদেরও নৌকা ছাড়া চলে না। তা নিয়ে সরকার ভাবছে না। পোড়ামাটি নীতির এক পর্যায়ে দেখা যায় -
''নৌকা বলতে নেই এ অঞ্চলে, নৌকার অভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছে গ্রাম'(কত ক্ষুধা, পৃ.১৬) ।
এর সাথে শুরু হয় সরকারের চাল সংগ্রহ বা ধান চাল সরিয়ে ফেলা নীতি। সরকারের লোক এসে গ্রাম থেকে চাল কিনে নিয়ে যায়। দালালের পরামর্শ, বাড়তি টাকা, নিজেদের অজ্ঞতা, সরকারী লোকদের তৎপরতা ইত্যাদির ফলে চাষীরা ধান বিক্রি করে ফেলে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -''ভারত ছাড়ো প্রস্তাব ইংরেজের বিভীষিকা। ... এক গতায়ন শতাব্দীর মৃত দেহের ওপর সগর্বে দাড়িয়ে আছে বিদেশী শাসক বর্গ - যুদ্ধে জিততে গিয়ে সাম্রাজ্য খোয়াতে তারা রাজী নয়।'' (কত ক্ষুধা, পৃ.১০৪) । এ কাহিনীতে কলকাতার বিভিন্ন ঘটনা দেখানো হয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনী হচ্ছে, কাজলী নামে একটি চরিত্রকে ঘিরে।এ উপন্যাসে নায়ক হিসাবে আমরা রাহুলকে দেখলেও নায়িকা হিসাবে পাই 'কাজলীকে'। দুজনের মধ্যে কিন্তু ঘনিষ্ট কোন সম্পর্ক নেই। কারণ যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে সামান্য পরিচয় আছে মাত্র।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রাখার প্রতীক'দেবতাধ নাতনী কাজলী। অন্য দিকে আরেক সম্পর্ক ধরে দেবতার নাতী হয় রাহুল 'দেবতা' গ্রামে থাকে। কাজলী এক জীবনসংগ্রামী কিশোরী এবং নারীর প্রতীক। মন্বন্তর যখন শুরু হয়েছে তখন কাজলীর বাবা জেলে। কাজলীর মাও এক সময় জেল খেটেছে। তার দাদা কানুর জন্ম জেল-খানায়। কাজলীর স্বামী কিশোরও বিপ্লবী হয়ে জেলে ছিল। দেখা যাচ্ছে, পুরো পরিবারটাই বিপ্লবের প্রতীক। মন্বন্তরের অন্য কোন উপন্যাসে এরকম কোন বিপ্লবী পরিবারকে তুলে ধরা হয়নি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনীতে আমরা মন্বন্তরকালীন গ্রাম বাংলাকে প্রত্যক্ষ করি। কাজলী, কাজলীর ভাই নাবালক অনু এবং তার আদর্শময়ী মাকে ঘিরে এই কাহিনী।

গ্রামে আমরা দেখি গিরিশ মুদি কোম্পানীর দালাল হয়ে গ্রাম থেকে চাল কিনে ফেলে। কৃষককে গিরিশ মুদির মত দালালরা পুরোচিত করে ধান চাল বিক্রি করে ফেলতে, 'বারুণী', নামক কাজলীদের এ গ্রামের মধ্য দিয়ে সারা বাংলার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে। আস্তে আস্তে খাদ্যের জোগান কমে যায় খোলা বাজারে। আমরা উপন্যাসে দেখি " গায়ের কিষাণ ক্ষেত মজুররা হাটে চাল কিনতে গিয়ে শুধু হাতে ফিরে এল। যে হাটে চাল স্তূপকার হয়ে থাকত, হঠাৎ কি হল সেখানে এক কণা চাল নেই"।(কত ক্ষুধা, পৃ•১১৮)।

অতএব খালি পেটের জ্বালা মিটাতে কলকাতার পথে পাড়ি। লেখক লছেন - "তাদের খালি পেট কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নয়, ফসল হানির জন্য নয়। মানুষের তৈরী এ আকালই কেন না ফসল ভালই হয়েছিল, ••• ঠিক মতো রেশন প্রথা থাকলে সকলেরই খাওয়া জুটত।" (কত ক্ষুধা, পৃ•১৬৩)।একই বক্তব্য রয়েছে পরে অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'আকালের সন্ধানে' উপন্যাসে। আরো লক্ষ লক্ষ দিশেহারা মানুষের মত কাজলী, তার মা এবং বালক ভানু কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। কাজলীর স্বামী কিশোরকে এর আগে কিছু না বুঝে গুলি করে মেরে ফেলে এক পুলিশ। আর কলকাতায় যাবার পথে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা কাজলী ক্ষুধায় মোহচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্ষিতা হয় এক পাঞ্জাবী কামুক সৈনিকের। সৈনিকটি কামুক হলেও দয়ালু। তার পশুত্ব যখন জেগে উঠেছিল তখন সে ভাবেনি তার বিশাল আকার দেহের কাছে ক্ষুদ্রাকৃতি দীর্ঘদিনের অনাহারী, পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা একটি মেয়ের কি পরিণতি হতে পারে। মুমূর্ষ কাজলীকে সৈনিকটি তাদের হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেখানে কাজলীর আশ্রয় এবং খাবার জোটে। অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্য নিশ্চিত।হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কাজলী মা আর ভাইকে নিয়ে আবার ফুটপাতে আশ্রয় নিতে হয়। দেবতা যাকে 'ভারতবর্ষের চিরকালের ঐতিহ্যের প্রতিরূপ একটি সরলচিত্ত কন্যা' হিসাবে নাতি রাহুলের কাছে পরিচিত করেছিলেন, সে কাজলী মা, ভাইকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং নিজে বাঁচার জন্য এক পানওয়ালির কুটনিপনায় গণিকা হবার দিকে পা বাড়ায়। তার দেহটার জন্য সত্তর টাকার কথা শুনে কাজলী ভাবে - "তার এই দেহটার দাম অত টাকা ?" (কত ক্ষুধা, পৃ•২৮৭)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজলী দেশপ্রেমিক বাবা এবং স্বামীর কথা স্মরণ করে দেহ বিক্রি না করে খবরের কাগজ বিক্রি করার কাজ নেয়। কাজলীরা

কলকাতায় আসার পিছনে বাঁচার একটা ক্ষীণ আশা দেখেছিল, কলকাতায় 'দেবতা'র নাতি রাহুল থাকে। তার সাথে দেখা হলে একটা আশ্রয় জুটবে। রাহুল তখন পুরোপুরি দেশ সেবকে পরিণত। ছাত্রদের এক বৈঠকে সে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেয়। সে বলে "যে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যেত, সেই দুর্ভিক্ষে বিশ লক্ষ ইংরেজ প্রাণ-বলি দিচ্ছে, আর তাদের সরকার নির্বিকার হয়ে, আত্মসন্তুষ্ট হয়ে বসে আছে, লোক লজ্জার বালাই নেই, অনুশোচনার বালাই নেই - একথা ভাবাও যায় না"। (কত ক্ষুধা, পৃ·৩০৪)। রাহুলের উপর নিপীড়ক সরকারের নজর ছিল, এবার গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এটাই কতক্ষুধা'র কাহিনী। বলা বাহুল্য, এ উপন্যাসটি যথার্থ মূল্যায়ন পায় নি। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পঞ্চাশ বছর পরে এসে জনৈক সমালোচক তাই বলছেন -

> "তাঁর সো মেনি হাঙ্গার'স' যখন বেরোল তখন কিন্তু ভবানীর লেখক হিসাবে উত্তরণ ঘটে গেছে অনেকখানি। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সামাজিক মূল্যবোধের আতীব্র আলোড়ন এই বিরাট ক্যানভাসটাকে পিছনে রেখে তিনি যে কাহিনী গড়েছিলেন এর মধ্যে, তার সামগ্রিক আবেদনটা হয়তো 'নবান্ন'র চেয়ে কিছু কম নয় - কিন্তু ওই নাটকের তুলনায় এই উপন্যাস প্রায় কিছু গুরুত্ব পায়নি পাঠক মহলে। সেটা না হয় বুঝি ভাষাটা ইংরেজী হবার কারণে স্বভাবই সেটা ঘটেছে। কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচকরা কেন উদাসীন রইলেন, বুদ্ধিজীবীরা ?"[২]

'সো মেনি হাঙ্গারস' বা কত ক্ষুধা সমালোচক বুদ্ধিজীবী মহলে মূল্যায়িত না হলেও উপন্যাসটির সংগ্রামী চেতনা অনুপ্রেরণার মূল্য অপরিসীম। কারণ লেখক এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে দাঁড় করিয়েছেন -

> "স্বাধীনতা আকাশ থেকে পড়ে না, সাগর পারের দেশে হাত পাতলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না - অশেষ নির্যাতন আর নির্ভীক, সংগ্রামের - কাদাপাঁকের মধ্যে ফুটে উঠবে স্বাধীনতার পদ্মফুল, মনের জ্বালার বীজে তা অঙ্কুরিত হবে।" (কত ক্ষুধা, পৃ·৩০৯-৩১০)।

মন্বন্তরের অন্যান্য উপন্যাসের মত এ উপন্যাসেও পাওয়া যায় দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থায় বীভৎস বেশ কিছু চিত্র। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর ছেলের কান্না সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে জীবন্ত কবর দেবার একটি চিত্র আছে, চিত্রটি বাস্তবের একটি ঘটনা থেকে নেয়া চিত্র পাওয়া যায় পুলিশী নির্যাতনের, পোড়ামাটি নীতি'র, মুখ বাজারে ব্যবসা নায়ক মজুতদারীর নারী দেহ সহজলভ্য হওয়ার, তথ্য আছে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও মহাজনরা গ্রাম আঁকড়ে আছে। কারণ এ সময়েই তো সব জমি কিনতে হবে। লেখকের শ্লেষোক্তি - "... একধার থেকে জমি কিনবে, সম্পত্তি কিনবে। সাধারণ মানুষের সে কেউ নয়। শকুনিরা মানুষের দুঃখ দুর্দশার ওপর বেঁচে থাকে।" (কত ক্ষুধা, পৃ.২০১)। গ্রামে দেখা যায় নারী-ব্যবসায়ী, তাদের দালাল। গ্রামের মহাজনের মুখ দিয়ে লেখক প্রকাশ করেন ঔপনিবেশিক শাসকদের মনোভাব, গ্রামের মানুষ যখন হা হুতাস করে ডাকছে গোরমেণ্ট কোথায় ? যারা দেশের লোকের মা বাপ ? তখন মহাজন বলে, "তোমরাই গোরমেণ্টকে খাওয়াবে। গোরমেণ্ট তোমাদের খাওয়াতে যাবে কেন ? এক বছর আগে তোমরাই গোরমেণ্টের বিরুদ্ধে হাত উঠিয়েছিলে, মনে নেই ?"(কত ক্ষুধা, পৃ.২০৪-২০৫)। এ বিষয়টা অনেক উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়েছে। গোরমেণ্টের বিরুদ্ধে হাত উঠিয়েছিল, মানে লেখক ওখানে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা বলছেন। এ কথাটা আর একটা উপন্যাসে ক্ষীণ অভিযোগের মতো পাওয়া যায় 'আকালের সন্ধানে' উপন্যাসে। সেখানেও লেখক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলান, যদি বলি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনই পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ ? - এ কথাটা সাহস করে জোরালো ভাবে কোন উপন্যাসে বলা হয়নি। কিন্তু এ বিষয়টা যে কত সত্য তার পক্ষে প্রধান উদাহরণ, যে শাসক এদেশের শ্রমজীবী মানুষের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত ফসল দিয়ে বিলাতের চেহারা বদলাচ্ছে, সে শাসক এত অমানবিক হলো কেন ? মানুষের মৃত্যুতে মানুষ যেখানে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে না, সেখানে, প্রজাদের মৃত্যুতে, রাজারা কিভাবে নির্লিপ্ত থাকে। এরকম কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র আছে ভবানী ভট্টাচার্যের এই উপন্যাসে। তাই সমালোচক বলেছেন -

"কিন্তু এ-ও তো আবার স্বীকার না করে পারা যায় না যে, আর পাঁচটা যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ-স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসের চেয়ে এর মধ্যে শাশ্বততর কিছু সত্যের অনুভবকে বেশী করে স্পর্শ করা যায়।"[৩]

তবে উপন্যাসটির চরিত্রচিত্রণরূপকধর্মী এবং অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। 'দেবতা' কাজলী, চরিত্রগুলি প্রতীক চরিত্র। এ চরিত্রগুলি বলিষ্ঠ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও কোথাও কোথাও জটিল হয়ে পড়েছে। রাহুলের বাবা সমরেন্দ্র বাবু চরিত্রটি খল চরিত্র হিসাবে স্পষ্ট, তবে বলিষ্ট নয়। লক্ষ্মীকান্ত চরিত্রটি বার্ধত পরিসরে চিত্রিত হলে ভাল হত। বারুণীর জমিদার বিপিন ঘোষ সম্পর্কে একই কথা খাটে। এ খল চরিত্রগুলি গুরুত্ব পেয়েছে কম। রাহুল এবং কাজলীর মধ্যে প্র্যেম সমন্বয় বা যোগাযোগ গড়ে একটা আন্দোলনের একই পথের দ্বৈত শক্তি গড়ে উঠলে - দুটি চরিত্রই সার্থক হয়ে উঠত। তাই রাহুল নায়ক হলেও নায়কোচিত যে গুণ তার মধ্যে লেখক প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছেন - সে সব স্বাভাবিক এবং স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে না। কুণাল জুনিয়ার অফিসার হয়ে মিলিটারীতে যোগ দেয় - চরিত্রটির আর কোন গতি-বিধি জানা যায় না। রাহুলের স্ত্রী যজ্ঞও পরে যে বিদ্রোহী মনোভাব গ্রহণ করে তাও সুগ্রথিত নয়। চরিত্রগুলিকে সামগ্রিক বিচার করে দেখা যায়, উপন্যাসটির কাজলী চরিত্র ছাড়া কোন চরিত্রই পরিপূর্ণতা পায় নি। ঘটনা-ধর্মী উপন্যাসে লেখক বাস্তব ঘটনাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, যেখানে বেশীর ভাগ চরিত্রগুলি স্বাভাবিকতা পায়নি। তত্ত্ব, তথ্য এবং বাস্তব সমস্যাই এ উপন্যাসের প্রাণ। স্মরণ করতে হয় সমালোচকের সেই কথা -

"ভবানীর কাহিনীর যতটা বাস্তব সমস্যামূলক, ঠিক সমান অনুপাতেই আবার তত্ত্বনিবিড় ও কাহিনীগুলোকে এগিয়ে গেছেন। ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্ক, আর একটা বিরাট পালা-বদলের প্রেক্ষিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের প্রতিভাস তাঁর কলমে চিত্রিত হয়েছে। এটা সুদক্ষ লেখক ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়, এ কথা না মেনে উপায় কী ?"[৪]

উল্লেখপঞ্জী :-

১। So Many Hunger's- এর বাংলা অনুবাদ 'কত ক্ষুধা', প্রথম প্রকাশ হয় র‍্যাডিকেল বুক ষ্টল, কলকাতা থেকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ গবেষণা পত্রে উদ্ধৃতি নেয়া হল সে সংস্করণ থেকে।

২। পল্লব সেনগুপ্ত: 'ভবানী ভট্টাচার্যের উপন্যাস, অজস্র ক্ষুধা এবং অন্যান্য', 'নন্দন', ৩৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৮, (নব পর্যায়ের অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ.৬৭।

৩। তদেব, পৃ.৬৮।

৪। তদেব, পৃ.৬৭।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপন্যাসগুলির আলোচনার পরিশেষে একথা বলা যায় - বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক উভয় বাংলার শিল্প সাহিত্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, সাতচল্লিশের দেশবিভাগ উভয় বাংলার জীবন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পঞ্চাশের মন্বন্তর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া প্রায় দুইশ বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো এ তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ শতকের এ সময়ের চিত্র শিল্প সাহিত্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ সময়ের প্রতিষ্ঠিত এবং নবীন উভয় পর্যায়ের লেখকরাই কমবেশী বিংশ শতাব্দীর বিশেষ 'সত' পঞ্চাশের মন্বন্তরকে তাদের সৃষ্টিতে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। কবি, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, সবাই যেন একটা সংযোগহীন মন্বন্তরের বিরুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য। মন্বন্তর যাদের চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল তাদের প্রত্যক্ষ ব অভিজ্ঞতার ফসল মন্বন্তরের সাহিত্য। সাহিত্যের অন্য শাখার মতো উপন্যাস শাখায়ও মন্বন্তর একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রেখাপাত করেছে। প্রতিষ্ঠিত খুব কম ঔপন্যাসিক এ বিষয়টাকে এড়িয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী তিন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভূতি, তারাশংকর, মানিক) এবং গোপাল হালদার মন্বন্তরের একের পর এক চিত্র এঁকে বাংলা সাহিত্যে তাদের স্থানটি আরো পাকাপোক্ত করেছেন। এঁদের অবদান বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মন্বন্তর নিয়ে পূর্ব বাংলার উপন্যাস শাখা প্রাচুর্যে ভরপুর নাহলেও একটু পরের প্রজন্মের আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং শহীদুল্লাহ কায়সার এ দু'জন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক মন্বন্তর ঘিরে যে উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন তাতে পূর্ববাংলার উপন্যাসে মন্বন্তরের অভাবটা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁদের 'ক্ষুধা ও আশা' এবং 'সংশপ্তক' দুটি উপন্যাসই নগর ও গ্রামের পরিব্যাপ্ত পটভূমিকায় রচিত। দুটি উপন্যাসেরই পটভূমি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিপর্যস্ত সময়ের হৃদয় বিদারী চিত্র। শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসে যুগচেতনা, শিল্পীচেতনা ও জীবনচেতনার সমন্বয় দেখা যায়। একই বিষয় দেখা গেছে

তার দেড় যুগ পরে রচিত অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'আকালের সন্ধানে' উপন্যাসে। মন্বন্তরের উপন্যাসের যে বিষয় লক্ষণীয়, শিল্পীরা পাশে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ শোষিত বঞ্চিত শ্রেণীর। তারা ছিল শোষণের প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাদের একাধিক চিত্রণ বার বার তাই তুলে ধরেছে। যুগত প্রকৃত শিল্পকর্মীরা হয় সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ অনুভূতির সহজাত দৃষ্টির। তারা জীবনকে পর্যবেক্ষন এবং বিশ্লেষণ করেন বাস্তবতার নিরিখে।

আমরা মন্বন্তর প্রসঙ্গে দেখতে পাই ঔপন্যাসিকরা মন্বন্তরের পিছনে যে কারণ এবং যে চিত্র খুঁজে পেয়েছেন কলমের তুলিতে তাকেই রূপদান করেছেন। তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল সাধারণ মানুষের অনুভূতির। অতি চিত্রণ কিংবা অতিরঞ্জিত কোন চিত্র আমরা দেখি না মন্বন্তর সম্পর্কিত উপন্যাস সমূহে। দু'একজনকে বাদ দিয়ে প্রায় শ্রষ্টাকে নির্লিপ্ত দেখি। বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য শিল্পীরা দায়ী করেছেন এক শ্রেণীর মজুতদার, অসৎ ব্যবসায়ী, ব্রিটিশ প্রশাসনের এদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকহীনতা। এদের সাথে হাতে হাত মিলিয়েছে দেশীয় মুর্জোয়ারা। বাস্তব কারণ এবং সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে যদি মানুষের মাঝে সচেতনতা জেগে না উঠে তবে দুর্ভিক্ষ যুগে যুগে হানা দেবে - বাঙলার শিল্পীরা যেন তাই বুঝাতে চেয়েছেন।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হচ্ছে মন্বন্তরের উপন্যাসগুলি বাজারে ক্রমান্বয়ে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। প্রকাশকরা জানালেন বইগুলি এখন এতো স্লো চলে বিনিয়োগ লাভবান নয়। জাতীয় গ্রন্থাগার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারের বাইরে যদি বই বইবাজারে না থাকে তা পাঠকের ঘরে ঘরে পৌছবে কিভাবে ? বাজারে বর্তমানে দুস্প্রাপ্যর তালিকায়, মন্বন্তরের বেশীর ভাগ উপন্যাস। উদাহরণ স্বরূপ গোপাল হাল-দারের মন্বন্তর ত্রয়ী। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কালো ঘোড়া' আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা', কমলকুমার মজুমদারের 'খেলার প্রতিভা'। এভাবে হলে হয়তো সবকটি উপন্যাসই একদিন দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। একাধারে মন্বন্তরের ইতিহাস, তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আমাদের এতো গুলি পূর্বপুরুষ হারানোর ঘটনা, মানব দরদী শিল্পীদের ভাষা ভঙ্গি, আঙ্গিক ইত্যাদি

এক সাথে জানার জন্য এ উপন্যাস গুলির অবদান অপরিহার্য। আজকের যুগের যান্ত্রিক মানুষ ভুলতে বসেছে, সে ঘটনা। এভাবে আপন জন হারানোর বড় বড় স্মৃতিগুলি সময়ে মানুষ ভুলে যায়। কিছুদিন আগে পূর্ণ হলো মন্বন্তরের পঞ্চাশ বর্ষ, এ উপলক্ষে কিছু সংগঠন, প্রকাশক, স্মরণ করেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের। প্রকাশিত হলো শ্রীপান্থ সম্পাদিত 'দায়'(মন্বন্তরের চিত্র সংকলন।) বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত 'লঙ্গরখানা'(মন্বন্তরের গল্প সংকলন), তসলিমা ও নাসরিন সম্পাদিত 'ফ্যান দাও'। (কবিতা সংকলন), সম্ভবত একই তাগিদে ড॰ বিনতা রায়চৌধুরীর গবেষণা পত্র 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য'। সাধুবাদ জানাতে হয়, এ সমস্তের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট গুণীজনদের।

উপসংহার

সমস্ত বিশ্লেষণের পর এ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, দুর্ভিক্ষের মূলে জোরালো কারণ, জনগণের প্রতি আন্তরিকতাহীন একটা শোষণ রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা। খাদ্যের উৎপাদন-সংকট স্থান বা দেশ বিশেষে যে কোন সময় ঘটতে পারে। সভ্য মানুষ অর্থশাস্ত্রের সৃষ্টি করেছে সীমাবদ্ধ সম্পদের সুষম বন্টণের রীতি নীতি নির্ধারণ এবং বিশ্লেষণের জন্য। পৃথিবীতে খাদ্য কখনো আলো, বাতাস, পানির মতো সুলভ এবং পর্যাপ্ত ছিল না। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যখন মুষ্টিমেয় ছিল তখনো দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট ছিল। এখন পাঁচ ছয়শ কোটি লোক। এখনো খাদ্য আছে এবং কখনো দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। এ পর্যন্ত যতো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে কখনো বিশ্ব-ব্যাপী খাদ্য সংকট বলে কোন শব্দকে নির্ধারণ করা হয়নি। তাহলে দুর্ভিক্ষের মূলে কি ? মূলে হচ্ছে অর্থ সংকট, এবং এ অর্থ সংকট এসেছে শোষণ, মজুতদারী, লোভী এবং মানবতাহীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। ফলে পরাধীন এবং অর্থনৈতিক সুষম বন্টনহীন অবস্থাতেই প্রায় দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। এর সাথে আরেকটা বিষয় বলার প্রয়োজন, এসব মানুষের সৃষ্টি। প্রকৃতি কিংবা ঈশ্বর দুর্ভিক্ষের জন্য যে উপ-করণ তৈরী করে মানুষই সেখানে কারিগরের ভূমিকা নিয়ে দুর্ভিক্ষটার বাস্তবায়ন করে। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে-ঈশ্বর একটা নকশা তৈরী করল দুর্ভিক্ষের জন্য। সে নক্শাতে কিছু যায় আসে না, যদি না মানুষ নামক কিছু কারিগর দলবদ্ধ হয়ে (টিম ওয়ার্ক করে) এক একজন এক একটা দায়িত্ব নিয়ে কাজের ভূমিকাটা পালন না করে। জ্বালানী এবং লাইটার পাশাপাশি রাখলে আগুন জ্বলে না। এক্ষেত্রে একজন মানুষের দরকার হয়। দুর্ভিক্ষের মূলে প্রকৃতি যখন জ্বালানী এবং লাইটার তৈরী করে মানুষ তখন এগিয়ে এসে বাকি কাজটা শেষ করে বলেই দুর্ভিক্ষ হয়। মানুষের এই ভূমিকাকে দমানো গেলেই দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এর অন্যথা হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে। পৃথিবীতে এখনও অনেক মানুষ না খেয়ে মরে কিংবা অর্ধাহারে থাকে। তাদের পরিমাণ এবং নির্মমতা আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকলে আমরা তাকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ দুর্ভিক্ষ বলি, আর পরিমাণটা

গা সওয়া ধরণের হলে তাকে এড়িয়ে চলি। অনাহারে অর্ধাহারে যে মৃত্যু বাস্তবে উপস্থিত কিন্তু খাতাপত্রে নেই, তা হচ্ছে পরোক্ষ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ অনেক সময় দুর্ভিক্ষ বলে স্বীকৃতি পায় না। এছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় পরিবহন ব্যবস্থা খাদ্য সরবরাহে বড় ধরণের বাধার সৃষ্ট করেছে। এটাও এ 'মন্বন্তরের' একটা মুখ্য কারণ। কখনো কখনো দেখা যায়, যে সময় প্রত্যন্তকলে গ্রামের হাটে কৃষক ফসলের মূল্য না পেয়ে বাজারে ঢেলে দিচ্ছে, তখন সেই একই ফসল শহরে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে, এর মূলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা এবং পরিবহন সংকট দায়ী, এই ব্যবস্থা ভাঙার উদ্যোগ নিতে হবে রাষ্ট্রকেই। পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে রাষ্ট্রীয় শস্য ক্রয় কেন্দ্র থাকে, যেখানে একটা নির্ধারিত দরে কৃষকের উৎপাদিত শস্য কিনে নেয়া হয়। দরটা অবশ্যই উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশী থাকে। শুধু মাত্র দেশে উৎপাদন টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিতে হয়। আর - ভাবতে অবাক লাগে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব থেকে গম কিনে দুর্ভিক্ষ-গ্রস্থ বাঙলাকে সরবরাহ করেছিল এক কোটি টাকা লাভ রেখে। কি শাসক ! কি রাষ্ট্র এবং শাসন ব্যবস্থা ! কিছু মানুষ এবং সংগঠন এদের বিরুদ্ধে ছিল বলেই বাকি মানুষগুলি বেঁচে ছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, তবে এটুকু বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ -

> "এ মন্বন্তরে মানুষের ঘর-গৃহস্থালী ভাঙিয়াছে, জীবন ব্যবস্থা, অর্থনীতিক বুনিয়াদ উল্টাইয়া গিয়াছে। বাঙালী পরপ্রত্যাশী ভিখারির জাতি হইতে চলিয়াছে।"[১]

পরিশেষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে একমত পোষণ করে আমাদেরও বলা দরকার -

> "মন্বন্তর সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে বহু রহস্য প্রকাশ হইবে, এইরূপ দুর্দৈব যাহাতে আর ঘটিতে না পারে, দেশবাসী সে বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্ক হইতে পারিবেন। যাহাদের শক্তি ও অবসর আছে, পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।"[২]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপন্যাস আমাদের সচেতন করে, আমাদের সতর্ক হতে প্ররোচিত করে। এই দিক থেকে এইসব উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

আজকের যুগে বাংলা সাহিত্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে উপন্যাস শাখা। বাংলা গদ্যের প্রবর্তনের পর পৌনেদুশ বছরে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখা এতো প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে, যা বিশ্বের খুব কম ভাষাতেই পাওয়া যায়। ড· বিনতা রায়চৌধুরী বলেছেন -

> "মন্বন্তর-আশ্রয়ী গল্প অসংখ্য রচিত হয়েছে, সেই তুলনায় উপন্যাসের সংখ্যা অল্প। কারণ ছোটগল্প রচনা অপেক্ষা উপন্যাস রচনা আয়াসসাধ্য।"৩

মন্বন্তর-আশ্রয়ী উপন্যাস খুব একটা কম নয়। তা ছাড়া মন্বন্তরের গুরুত্ব উপলব্ধি শুধু মাত্র সংখ্যা দিয়ে না করে করা উচিৎ সৃজন-বৈচিত্র্যতা দিয়ে। বিভিন্ন লেখকদের মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাস দাবী করে, উপন্যাস আজ বিচিত্র রূপে প্রবাহিত। জীবনকে এবং সমাজকে সব চেয়ে বেশী স্পর্শ করেছে এসব উপন্যাস। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আনন্দ উল্লাস, ব্যক্তি· যন্ত্রণা, ব্যক্তি· জীবনের খুঁটিনাটি থেকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং শোষণ জগতের বিস্তৃত বিষয় ঐতিহাসিক আত্মিকধর্মী বর্ণনার দায়িত্ব বহন করেছে এসব উপন্যাস। তাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঔপন্যাসিকরা শুধু স্রষ্টা নন, আর্থ-সামাজিক দার্শনিক, ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষক, জীবনের আর্থ সামাজিক সমস্যার মূল স্রোতের অনুসন্ধিৎসু গবেষক। এসব উপন্যাসের শুধু নান্দনিক সার্থকতা বিচার করলে তার পরিপূর্ণ রূপ উদঘাটিত হয় না কারণ লক্ষ্য এবং দর্শনহীন উপন্যাস, উপন্যাস নয়। একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য এবং একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন বা সমাধান যদি ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে না দেখান, তবে সে উপন্যাস হয়ত আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ। আজকে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সে যুগের বিচারে উপন্যাস হলেও, আজকের বিচারে আরব্য উপন্যাস বা নিছক প্রেমকাহিনী কোন সার্থক উপন্যাস নয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাস নিয়ে পাঠকের এবং সমালোচকের অভিযোগ কম নেই। বঙ্কিমের সময়ে বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ছিলেন। অপ্রতুল উপন্যাসকে তুলনামূলক বিচার করার সুযোগ তখনকার পাঠকের ছিল না। আধুনিক

কালে পাঠকরা সে সুযোগ পাচ্ছে। তাই প্রাচুর্য এবং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকরা এগিয়ে যাচ্ছেন নিজস্ব বাগরীতি এবং স্বতন্ত্র চিন্তায়। কোন ঔপন্যাসিকের জীবনেই বিখ্যাত উপন্যাস খুব বেশী থাকে না। নিজের অজান্তেই হয়তো কোন লেখা স্থান-কাল উত্তীর্ণ হয়ে যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপন্যাসের গর্বনীয় একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বাস্তববাদ। কল্পনাশ্রয়ী, ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে সৃষ্ট উপন্যাস যতই তার গল্প আকর্ষণীয় হোক তাকে শিল্প রসোত্তীর্ণ রচনা বলা যায় না। মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাসগুলি বাস্তবতাকে সবচেয়ে বেশী স্পর্শ করেছে। এখানে লেখকের দায়িত্ববোধ প্রশংসনীয়।

পূর্ব বাংলার সাহিত্যে কবিতার তুলনায়-উপন্যাসে শূণ্যতা বেশী। খ্যাতিমান যে ক'জন লেখক দেশবিভাগ উত্তরকালে সাহিত্য চর্চা করেছেন তাদের কারোরই সৃষ্টি খুব বেশী নয়। ওয়ালী উল্লাহ, আবু ইসহাক, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, কাজী ইমদাদুল হক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখদের সৃষ্ট উপন্যাস পরিমাণে খুবই কম। আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান এবং পরবর্তী সময়ের কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া।

মন্বন্তরের সমস্ত উপন্যাসের একটি নির্দিষ্ট দুর্বলতা চোখে পড়ে। বেশীর ভাগ উপন্যাসই সত্যিকার পরিপূর্ণ রসোত্তীর্ণ উপন্যাস নয়। যে সমস্ত শক্তিমান লেখক, যাঁরা তাদের যুগের সাহিত্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলো, তারাও সার্থক শিল্পোত্তীর্ণ মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাস পাঠককে উপহার দিতে পারেননি। একে লেখকের দুর্বলতা জ্ঞান করলে ভুল হবে। এর মূল কারণ নিহিত অন্যখানে। বাস্তব আঘাত তাদেরকে এমন বিপুল বিভ্রান্ত করেছিল শিল্প রসের এবং পাঠকের মনোরঞ্জনের প্রতি তাদের দৃষ্টিক্ষেপ ছিল কম। ফলে সুস্থ শৈল্পীক পরিকল্পনায় রসাশ্রয়ী উপন্যাস লেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। সে স্থান দখল করেছে, মনুষ্যত্বের আকালের প্রতি ক্ষোভ, আর্থ-সামাজিক শোষণ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা, কটাক্ষ, স্পষ্ট বক্তব্য, সাংবাদিকীয় ধর্মী পরিস্থিতি বর্ণনা। তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক, গোপাল হালদার, আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্রমুখ শক্তিমান লেখকরা মন্বন্তরকে পটভূমি করে উপন্যাস রচনা করলেও মন্বন্তর আশ্রয়ী তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাটি সৃষ্টি করতে পারেননি। ফলে 'পথের পাঁচালি,' 'অপরাজিত,' 'আরণ্যকের' 'মর্যাদা পায়নি 'অশনি সংকেত'। কবি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতির মর্যাদা পায়নি 'মন্বন্তর'। 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', প্রভৃতির মর্যাদা পায়নি 'চিন্তামণি'। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'কর্ণফুলী', 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি 'ক্ষুধা ও আশা '। 'একদা', 'আরেকদিন', 'অন্যদিন'এর মর্যাদা পায়নি 'উনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ','তেরশ পঞ্চাশ"। এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম 'তিলাঞ্জলি'। তিলাঞ্জলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এটি সুবোধ ঘোষের প্রথম উপন্যাস। মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে নতুন একজন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। বাঙলা সাহিত্যে আর একটি সমৃদ্ধতার দ্বার উদঘাটন। কিন্তু 'তিলাঞ্জলি'ও যতো প্রচারধর্মী, শিল্পকর্ম হিশেবে ততো সার্থক নয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রায় উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ রূপে মুখ এবং মজুতদারীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মন্বন্তরের ইতিহাসবিদ বা গবেষকরাও এ দুটি কারণকে স্বীকার করেছেন। মন্বন্তরের কারণের সপক্ষে বিপক্ষের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদেরও এ দুটি কারণকে প্রধান কারণ রূপে মনে হয়েছে। এর সপক্ষে নিচের বিবৃতিগুলি পড়া যেতে পারে -

> "১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জাপানীদের হাতে বর্মার পতন ঘটলে সেখান থেকে চাল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। মিত্রশক্তির বিরাট নৌবহর রয়েছে সিংহলে। এক সিংহলেই যে বাংলার কত চাল রপ্তানী হয়, সে হিসাব পাওয়া যাবে বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে।" [৪]
>
> "রেঙ্গুনের পতন ১৯৪২ সালে ১০ মার্চ। সুতরাং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ। ঘাটতি আরও সে কারণেই। ... উনিশশ বিয়াল্লিশ সালে যা আমদানি করা হয়েছিল, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়

তার চেয়ে অনেক বেশি। সৈন্যদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল মজুত ভান্ডার।"[৫]

"তাহা ছাড়াও চাষের উপযুক্ত বহু সহস্র বিঘা জমি বিমানপোত, অবতরন ক্ষেত্র, সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উদ্দেশ্যে দখল করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে ... ১৯৪২ অব্দের ফসলের পরিমান হ্রাস পায়।"[৬]

"মন্বন্তরের কারণ মূলত দুটি প্রকৃতিসৃষ্ট কারণ ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। ... মনুষ্যসৃষ্ট কারণ - প্রথমত, যুদ্ধ বা যুদ্ধের আশঙ্কায় শস্য বাজেয়াপ্তকরণ বা শস্য - উৎপাদন বন্ধ হেতু দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিস, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারশ, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নাইজেরিয়া এবং ১৯৭৫-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কাম্পুচিয়া যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দুর্ভিক্ষে যুদ্ধের ভূমিকা ছিল মুখ্য।

দ্বিতীয়ত, মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের মজুত কৌশলেও অনেক সময় ব্যাপক অন্নাভাব ঘটে থাকে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের এও আর একটি কারণ।"[৭]

মন্বন্তরের উপন্যাস সমূহেও এ দুটি কারণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'মন্বন্তর', 'অশনি সংকেত', 'চিন্তামণি', 'ক্ষুধা ও আশা' উনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথ, 'তেরশ পঞ্চাশ', কালো ঘোড়া' প্রভৃতি উপন্যাসে, মন্বন্তরের মূলে যুদ্ধ এবং মজুতদারীটা এসেছে। লক্ষণীয় মন্বন্তরের সব কটি উপন্যাসে যে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে তার মধ্যে যুদ্ধ এবং মজুতদারী কিংবা মজুতদারীর ইঙ্গিত প্রধান। এ ছাড়া এসেছে যুদ্ধ সম্পর্কে এদেশের মানুষের একটা অস্পষ্ট ধারণা, নারীকেন্দ্রিক যৌন ব্যবসা, নিজের প্রয়োজনে পোষ্য বা আপনজনদের সাথে স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিষয়। এখানে 'পল আর গ্রীনো'র দুর্ভিক্ষ তত্ত্বের 'পোষ্যদের ত্যাগ' প্রায় ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এছাড়া ফুটে উঠেছে সমাজব্যবস্থা ও প্রচলিত রীতিনীতির বড় ধরণের ভাঙ্গন বা পরিবর্তন। ঔপন্যাসিকদের রচনায় দেখি তাঁরা সবচেয়ে বেশী আলোকপাত করেছেন সামাজিক পরিবর্তনের উপর। মৃত্যুর চেয়েও

যে পরিবর্তন যন্ত্রণা দায়ক এবং চিন্তাদায়ক। 'অশনি সংকেত', 'মন্বন্তর', 'ক্ষুধা ও আশা', 'চিন্তামণি' প্রভৃতি উপন্যাসে দেখা যায়, বিরাট পরিবর্তন ঘটে সামাজিক মূল্যবোধের। উল্লেখ করা যেতে পারে এ সমস্ত উপন্যাসে মন্বন্তরের ফলে লক্ষ লক্ষ যে নরনারীর মৃত্যু ঘটে তার শুধু বর্ণনা বড় নয়। সূক্ষ্ম ভাবে চিত্রিত পোষ্য-দের ত্যাগ করে গৃহস্বামীর পলায়ন, বাবা-মা মেয়েকে তুলে দিচ্ছে নারী ব্যবসায়ীর হাতে, দীর্ঘ দিনের বন্ধু এবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। গৃহবধূ সামান্য কিছু চালের জন্য শরীর বিকিয়ে দিচ্ছে। মন্বন্তরের সাথে সাথে সবাই হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে স্বার্থপর। যে ধর্ম ছিল পশুর, - গুতোগুতি বা কামড়াকামড়ি করে নিজে খাওয়া, মানুষ সে ধর্মকে বাঁচার অবলম্বন মনে করেছে যদিও মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্য, কিন্তু ঔপন্যাসিকদের এ উপলব্ধি এতো বেশী বাস্তব যা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের উপন্যাসে দেখা যায়, সামাজিক এ পরিবর্তন এতো দিনের ঐতিহ্যময় বাংলার সমাজ এবং গৃহ ব্যবস্থাকে সে যে ভেঙে দেয়, পরবর্তী সময়ে মানুষ সচ্ছল হলেও সমাজ ব্যবস্থা আগের স্থানে আর ফিরে আসে না। লক্ষ লক্ষ মেয়ে সে যে দেহ ব্যবসায় নামে তাদের আর ফিরে আসা হয় না সমাজে, হয়তো সমাজ ও আর তাদেরকে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দেখা যায় সম্ভ্রম হারানো গীতাকে কানাই গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেও কানাইকে নিয়ে গীতা ঘর বাধার স্বপ্ন দেখতে সাহস পায় না। বিভিন্ন উপন্যাসে দেখা যায়, মন্বন্তর ছোট পরিবার থেকে একান্নবর্তী পরিবার পর্যন্ত ভেঙে লন্ডভন্ড করে ফেলেছে। পরিবারের সদস্য অনেক কমে যায়। কেউ মারা যায়, কেউ হারিয়ে যায়। 'ক্ষুধা ও আশা', 'মন্বন্তর', 'চিন্তামণি', 'কালো ঘোড়া', 'সংশপ্তক', 'তিলাঞ্জলি' প্রভৃতি উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে মন্বন্তরের কারণে পরিবার ভাঙার কাহিনী। বাস্তবে মন্বন্তরের পরে বেড়ে উঠে ছোট পরিবার ব্যবস্থা। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে হয়তো দেরীতে হলেও কেউ কেউ চাকরি বা ছোট ছোট ব্যবসা থেকে আস্তে আস্তে উন্নতি করে সচ্ছল হয়, কিন্তু ভেঙে যাওয়া সমাজ, যে সমাজে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ছিল তা আর

গঠন হয় না। সৃষ্টি হয় ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা। মন্বন্তরের কয়েকটি উপন্যাসে কিছু কিছু চরিত্রের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং তৎপরতার জোরালো উপস্থিতি দেখা যায়, যথা - 'ক্ষুধা ও আশা', 'উনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ', 'তেরশ পঞ্চাশ, 'তিলাঞ্জলি' প্রভৃতি উপন্যাস। তবে পরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ক্ষমতার উৎস বিন্দু মানুষ হওয়াতে স্বাধীন পরবর্তী সমাজে মানুষকে নিয়ে রাজনীতি চর্চা এবং এর ফলে মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। পলাশীর ঘটনায় জনগণ তখন যে অচেতন ছিল, ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে এবং স্বাধীনতার পরে তারা আর সে অসচেতন থাকে না। রাজনৈতিক সামাজিক পরিবর্তনে এটা একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দিক।

মৃত্যুর চেয়েও যে বড় ট্রাজেডী থাকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় দেখা গেছে সে সবের ভূরি ভূরি দৃশ্য। যেমন - 'ক্ষুধার্ত ছেলের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা ছেলেকে জীবন্ত কবর দিচ্ছে। কিংবা 'নিজের বাচ্চাকে না দিয়ে মা নিজে খাচ্ছে।' এর চেয়েও ক্ষতিকর দিকে মৃত্যু ঘটেছে ভালোবাসার। 'মন্বন্তর', 'সূর্য দীঘল বাড়ী', গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ীতে দেখা যায় ভালোবাসার মানুষকে মানুষ ত্যাগ করে যাচ্ছে।

'In one centre regarding 1,000 out of 1,400 women, the husbands had left them behind in search of food and had not returned' [৮]

এর পাশাপাশি দেখা যায় আপন মেয়ের সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দেখা যায় গীতার বাবা-মা গীতাকে পণ্য করে তুলে, 'ক্ষুধা ও আশা'য় জোহাকে বাবা হয়ে নারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করার কথা বলে হানিফ। মন্বন্তরের ফলে মানুষ যে নীতিবোধ হারিয়ে বসে তার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষণীয় আর একটি বিষয় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে অসহায় মানুষের শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহরে ছুটাছুটি।

----- ০ -----

উল্লেখপঞ্জী :-

১। ড· বিনতা রায়চৌধুরী, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, পৃ·২
২। অনুরাধা রায়, অনুষ্টুপ : পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্পসাহিত্য, পৃ·১
৩। তসলিমা নাসরিন, ভূমিকা, ফ্যান দাও (সম্পাদিত - কবিতা সংকলন)
৪। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, পৃ·১০২
৫। ড· বিনতা রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·৩
৬। Hindustan Standard, 12 Dec. 1943 INDIA.
৭। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'
৮। তদেব

পরিশিষ্ট ঃ

পরিশিষ্ট - ১

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে রচিত গল্প, কবিতা, নাটকের তালিকা

(এ তালিকার বাইরেও কিছু শিল্পকর্ম রয়েছে, অসম্পূর্ণ তালিকার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী- গবেষক।)

শুধু উপন্যাস নয়, পঞ্চাশের মন্বন্তর শিল্পের প্রতিটি শাখায় ছড়িয়ে আছে। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, তৈলচিত্র, জলছবি, ক্যামেরার ফটোগ্রাফি, শিল্পীর আঁকা ছবি সমস্ত নান্দনিক শাখা মন্বন্তর থেকে কাঁচামাল নিয়ে প্রাচুর্যে ভরে তুলেছে ভান্ডার।

গল্পের তালিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০)'ভিড়', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৩-১৯৮৭)'বীরুর প্রশ্ন', আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯)'লঙ্গরখানা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১)'পৌষলক্ষ্মী', 'বোবাকান্না', 'ইস্কাপন', পরিমল গোস্বামীর (১৮৯৯-১৯৭১)'শেষের হিসাব', 'ভাঙ্গন', 'পরিচয়', 'কৃষ্ণহরির চাল', 'তারিণী মাস্টার', মনোজ বসুর (১৯০১- ১৯৮৭)'মন্বন্তর'(পরিবর্তিত নাম : 'দ্বীপের মানুষ'), সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২)'ক্ষুধা', 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', 'ছন্ন-ছাড়া', 'আগুন', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬)'কালনাগ', 'কাক', 'কেরোসিন', 'হাড়', 'বস্ত্র', প্রবোধকুমার সান্যালের(১৯০৫-১৯৮৩)'অঙ্গার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা', 'গোপাল শাসমল', 'তারপর', 'রাঘব মালাকর', 'নেড়ি', 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণ', 'অমানুষিক', 'প্রাণের মূল্য', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের(১৯০৮-) 'ন্যায় ক্ষুধা হুঁ', 'মহাকালের নিশ্বাস', সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০)'কতটুকু ক্ষতি', সোমনাথ লাহিড়ীর (১৯০৯-১৯৮৪)'১৯৪৩', কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) 'নিম অন্নপূর্ণা', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫)'আবরণ', 'রসাভাস', 'রূপান্তর', 'নষ্ট', 'মদনভস্ম', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০)'নক্ত-চরিত', 'দুঃশাসন', 'কালো জল', 'পুষ্করা', 'হাড়', 'কবর', 'নিশাচর', 'ডিনার', 'ভাঙা চশমা', নবেন্দু ঘোষের (১৯১৭-)'কাক', 'বাঁকা আলোয়ার', 'বস্ত্রং দেহি', 'ছিন্নমস্তা', 'ত্রিশঙ্কু', 'এই শীতান্তে', মনী ভৌমিকের 'হটাবাহার', 'একটি দিন ১৯৪৪', 'কাফের', 'খুনীর মেলে', সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১)'নয়ন চারা', সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭)'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য ইত্যাদি।

কবিতার তালিকা

অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬)'অন্নদাতা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮)'জনৈক', 'ফ্যান', 'রাত জাগা ছড়া', বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪)'শ্রাবণ', বিষ্ণু দের (১৯০৯-১৯৮২)'১৯৪৩ অকাল বর্ষা', 'এক পৌষের শীত', 'চতুর্দশপদী'। অরুণ মিত্রের (১৯০৯-)'জঠর', 'একটি নিবেদন', 'রাস্তা বোঝাই তোমরা', বিমলচন্দ্র ঘোষের (১৯১০-১৯৮২)'১৩৫০', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের (১৯১১-১৯৭৭)'আমাদের গান', দিনেশ দাসের (১৯১৩-১৯৮৫) বাংলা ১৩৫০', 'ভুখ-মিছিল', 'ডাস্টবিন', 'নববর্ষের ভোজ', 'গ্লানি', সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭)'নষ্টনীড়', 'শহরে', 'নাচিকেত', '২২শে জুন', 'গৃহস্থ বিলাপ', 'আকাল', 'বিকলন', ' ক্রান্তি', কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের (১৯১৬-) 'মেঘমুক্ত', মনীন্দ্র রায়ের (১৯১৯-)'অনুভব', 'পঞ্চাশের প্রেত', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯২০)'চিরকুট', 'বর্ষশেষ', 'গ্রাম্য', 'এই আশ্বিনে', 'স্বাক্ষর', 'স্বাগত', সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭)'ঐতিহাসিক', 'এই নবান্নে', 'বিবৃতি', 'বোধন', 'ডাক' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য কবিতা এই পটভূমিকায় রচিত।

নাটক ও একাঙ্কিকার তালিকা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২-১৯৬১)'রাজধানীর রাস্তায়', তুলসী লাহিড়ীর(১৮৯৭-১৯৫৯)'ছেঁড়া তার'(১৯৪৪) ও'দুঃখীর ইমান'(১৯৪৬) বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯) 'নমুনা', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৯০)'দীপশিখা', বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৭-১৯৭৮)'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী'(১৯৪৩) ও 'নবান্ন'(১৯৪৪) প্রভৃতি নাটক ও একাঙ্কিকাও মন্বন্তর-আশ্রয়ী রচনা।

চিত্রকরদের তালিকা

প্রাণকৃষ্ণ পাল, ভবেশ স্যানাল, গোপেন রায়, রামকিঙ্কর,চিত্তপ্রসাদ,, গোবর্ধন আশ, অতুল বসু, পরিতোষ সেন, সুধীর খাস্তগীর, সুনীল মাধব সেন প্রমুখ শিল্পীরা এঁকেছেন মন্বন্তর নিয়ে অনেক চিত্র।

পরিশিষ্ট - ২

চিত্র - ১

সৌজন্যে - জয়নাল আবেদিন

চিত্র - 2

সৌজন্যে - জয়নাল আবেদিন।

চিত্র - ৩

সৌজন্যে - জয়নাল আবেদিন

চিত্র - ৪

সৌজন্যে - চিত্ত প্রসাদ।

চিত্র - ৫

সৌজন্যে - চিত্ত প্রসাদ।

পরিশিষ্ট - ৩

'নানাবতী পেপার্স' পঞ্চাশের মন্বন্তরের অপ্রকাশিত গোপন দলিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অনেক তথ্য সেই 'ব্ল্যাক বক্সে' বন্দী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের গবেষক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও নানাবতীর অপ্রকাশিত দলিল' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংস্কৃতি ও সমাজ' পত্রিকায় প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৩ তে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য নানাবতীর দলিলের গুরুত্ব অপরিসীম। নানাবতী দলিল নিয়ে রচিত নিরঞ্জন সেনগুপ্তের এ প্রবন্ধটির প্রতিলিপি কোন রূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে এখানে সংযোজন করা হল।

— গবেষক।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও নানাবতীর অপ্রকাশিত দলিল

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

গত দু'শ বছরের ইতিহাসে ভারতে দুর্ভিক্ষের বা মন্বন্তরের ঘটনা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। দুর্ভিক্ষের কারণ দর্শাতে গিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ ভারতের কৃষককেই দায়ী করেছেন। আর করেছেন এদেশের আবহাওয়াকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে আজ অবধি অসংখ্য ছোট বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এদেশে। সাম্প্রতিককালে তের'শ পঞ্চাশের মন্বন্তর গণমৃত্যু ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে অন্য সব মন্বন্তরকে ছাড়িয়ে গেছে। আনরিসড্-ইউনিসেফ-ক্রেসিডা (UNRISD-UNICEF-CRESSIDA) গবেষণা প্রকল্পের পক্ষে পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে মনিলাল নানাবতীর দলিল দেখতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য সেই অপ্রকাশিত বিশাল দলিলের অনেক কিছুই আমার দেখা হয়নি কম সময়ের স্বল্পতা। যেটুকু দেখতে পেরেছি তা থেকে অংশ বিশেষ বাঙলায় অনুবাদ করে এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। একেবারে অপরিহার্য না হলে কোন মন্তব্য না করেই। তবে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য যেখানে হস্তক্ষেপ একান্তই প্রয়োজন সেখানেই কিছুটা অদল বদলের স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে মূল তথ্যে হস্তক্ষেপ না করে।

নানাবতীর দলিলের গুরুত্ব বুঝতে হলে যে পটভূমিতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য উডহেড কমিশন তৈরি হয়েছিল সেই পটভূমি এবং সেই সঙ্গে মনিলাল নানাবতীর কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা দরকার। তাই গোড়াতেই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হচ্ছে।

উনিশশো চুয়াল্লিশের গোড়ার দিকে মন্বন্তরের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। অবশ্য সরকারের "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" মতে দুর্ভিক্ষ তখন একেবারেই অনুপস্থিত। ফলে, সরকারি পরিচালনায় যে সব লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল, 1943 সালের ডিসেম্বর থেকেই সরকারি নির্দেশে তা বন্ধ করে দেওয়া হল। বাঙলা সরকার মোট সাড়ে তিন হাজারের কিছু বেশি (3621 টি) লঙ্গরখানা চালাত এবং 1247টির মত বেসরকারি লঙ্গরখানাকে সাহায্য দিত।[1] সরকারের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে দুর্ভিক্ষের কিছু হের ফের হলনা বরং সমস্যা হল ক্রমবর্ধমান। রিলিফ এবং পুনর্বাসনের বোঝা বিরাট আকারে এসে চাপল বেসরকারি সংগঠনগুলির কাঁধে।

বাঙলা সরকার মন্বন্তরের ব্যাপারে 1943 সালের ডিসেম্বরেই পুরোপুরি হাত ধুয়ে ফেললেও বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। পরিসংখ্যানের স্থূল নামতা আউড়ে বাঙলায় মন্বন্তর ও তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে লণ্ডনে, ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বসে যে পণ্ডিতেরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন, চার্চিলের কাছে লেখা এক টেলিগ্রামে ওয়াভেল তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে লিখেছিলেন—আগামী বছর অর্থাৎ 1944 সালে "গত বছরের চেয়েও বিরাটাকার এক দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না"।[২]

ইতিমধ্যে বাঙলার গ্রাম থেকে যে এক কোটি দরিদ্র কৃষক পুরুষ রমণী ও শিশু খাদ্যের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে পথে নেমেছিল তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মন্বন্তরে কৌত হয়েছে। বাকি পঁয়ষট্টি লক্ষ নিরাশ্রয়, ভূমিহীন, জীবিকাহীন মানুষ শহরের ও গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উনিশশো চুয়াল্লিশের গোড়ায় এই ছিল বাঙলা ও তার আবহ।[৩]

মন্বন্তরের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গণসংগঠনের কাছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে বাঁচানোই ছিল একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। রিলিফ ছিল মূল লক্ষ্য। পিছন ফিরে তাকানোর সময় তখন ছিল না। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রথম ধাপ টাটা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ-সৃষ্ট' সেই মন্বন্তরের কারণ অনুসন্ধানের—অপরাধীদের খুঁজে বের করার—তদন্তের দাবি জোরালো হয়ে উঠল। গোড়ায় দিকে ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ তদন্তের জন্য কমিশন বসাতে রাজি ছিল না কারণ এ ধরনের কমিশন যে বীভৎস সত্য উদ্‌ঘাটিত করবে তাতে শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও ভারত সরকারের মাথা কাটা যাবে। প্রথম টায় তাই দুর্ভিক্ষ তদন্তের জন্য একটা 'রয়াল কমিশন' গঠনের ইচ্ছে ছিল ভারত সরকারের, যাতে নমো নমো করে কাজ সারা যায়। অর্থাৎ সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে।

কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তখন গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গেছে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোবিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলেছে। পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে আমেরিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটেন যে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভাগ্যরেখায় তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

শেষ পর্যন্ত দেশ ও বিদেশে জনমতের চাপে, বিশেষ করে সম্ভবত ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা ভেবেই, ভারত সরকারকে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয় স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে। 1944 সালের 24 জুন কমিশনের সদস্যদের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয়। উডহেড ছাড়া কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—ডা. ডি. আর আফ্রয়েড, এস. ভি. রামমূর্তি, খান বাহাদুর আফজল হোসেন, মনিলাল বি. নানাবতী এবং আর. এ. গোপালস্বামী (কমিশনের সেক্রেটারি)। ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসায়ীদের একজন প্রতিনিধিকে কমিশনে রাখার প্রস্তাব করেছিলেন ভারত সচিব আমেরি। কিন্তু কেউ রাজি হন নি। যুদ্ধের

সময়ে এরাই ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, এবং চুটিয়ে ব্যবসা করে মুনাফাও করেছে। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে, ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা তখন রাতারাতি দেশপ্রেমিক বনে গেছে। 1944 সালের 28 ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এক গোপন রিপোর্টে ভারতীয় বুর্জোয়াদের মতিগতি সম্পর্কে লিখেছিল যে "রুশ দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যেমন মেনশেভিকদের পক্ষে ছিল ভারতের বুর্জোয়ারাও তেমনি কংগ্রেসের পক্ষে গিয়ে ভিড়েছে"।[4]

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মনিলাল নানাবতী দীর্ঘকাল বরোদার দেশীয় রাজ্যের দপ্তরে কাজ করেছেন। 1942 সাল থেকে তিনি 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স' এর সভাপতি ছিলেন। এককালে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর ডেপুটি গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 1942 সালেই নানাবতী এবং সি. এন ভকিল-এর যৌথ সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশের কাজ শুরু হয়। বইটির নাম 'ইনডিয়া স্পিকিং'। ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সামরিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, এইচ. এন কুঞ্জরু, সি. এন ভকিল প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের লেখা প্রবন্ধের সংকলন ছিল গ্রন্থটি। নানাবতী এই গ্রন্থে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন তাতে ভারতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন যে এই অবস্থা চলতে থাকলে অচিরে এদেশে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে মনিলাল নানাবতীর ভূমিকা দুঃসাহসী এবং গৌরবজনক।

উডহেডের নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন কাজ শুরু করার আগেই স্থির হয় যে, কমিশনের সমস্ত সাক্ষ্য গোপনে গৃহীত হবে। ভারতে ইংরেজ সরকারের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য এটা প্রয়োজন ছিল।

1945 সালের আগস্ট মাসে তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট নামে একটি চটি বই ছাপা হয়ে বের হয়। যুদ্ধের বাজারে কাগজের দুর্মূল্যতার দোহাই দিয়ে অত্যন্ত কম সংখ্যায় ছাপান হয়েছিল এই রিপোর্ট। কাজেই প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে।

এতো গেল প্রকাশিত রিপোর্টের ইতিহাস। তদন্ত কমিশনের কাছে প্রায় আড়াই শ সাক্ষী—রাজনৈতিক দল, সেবা প্রতিষ্ঠান, কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসায়ীদের সংগঠন, মহিলা সংগঠন—প্রভৃতির প্রতিনিধি এবং সরকারী ও সামরিক বিভাগের বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সেই সব সাক্ষ্যের বয়ান ছাপার জন্য ছাপাখানায়ও গিয়েছিল। সরকারি ছাপাখানায় তা কম্পোজও করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের নির্দেশে আকস্মিক ভাবে সেই দলিল ছাপান বন্ধ হয়।

সরকারি প্রেসে কম্পোজ করা প্রুফ- দলিল- গুলো থেকে দিয়েছিলেন ,

শ্রী মনিলাল নানাবতী। এছাড়া কমিশনে যে সব অফ্ দা রেকর্ড (off the record) আলোচনা হয়েছিল তারও নোট রেখেছিলেন নানাবতী। পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো প্রায় হাজার দেড়েক পৃষ্ঠার সেই অসংশোধিত গ্যালি প্রুফ এবং অত্যন্ত গোপনীয় নোটের ছটি ফাইল আজ "নানাবতী পেপার্স" নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই নানাবতী দলিল দিল্লিতে মহাফেজ-খানায় রাখা আছে। বাঙলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর সেই বিস্ফোরক দলিল কিন্তু আজও অপ্রকাশিত। ভারতে ইংরেজ সরকার সেই দলিল প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছিল। কেন, তা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের বত্রিশ বছরের মধ্যে ভারত সরকারও সে দলিল প্রকাশ করেনি কেন? দলিল পড়লে সম্ভবত তাও বোঝা শক্ত মনে হবে না।

কমিশনের সামনে কি ধরনের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল, এখানে তার কিছু কিছু অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছে। অনুবাদ আক্ষরিক নয়।

বাঙলা সরকারের স্পেশাল অফিসার এল. জি পিনেল 1944 সালের 15 আগস্ট কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন: "জাপানীরা কেন যে আমাদের আক্রমণ করল না এ রহস্যের সমাধান আমি আজও খুঁজে পাইনি। আকিয়াবের পতনের পর জেনারেল আলেক-জাণ্ডারের বাহিনী উত্তর বর্মা থেকে পিছু হটতে শুরু করলে দলে দলে রেফিউজি এ দিকে চলে আসতে থাকে। সেদিন জাপানীদের অগ্রগতি আটকাবার মত কেউ ছিল না। চট্টগ্রামের উদাহরণ দিয়েই বলছি, সারা চট্টগ্রাম জেলায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। সামান্য কিছু ফৌজ ছিল চট্টগ্রাম শহরে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল পালাবার পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়ে যাওয়ার। নোয়াখালিতে জজ কোর্টের সামনে কয়েকটা মাত্র ফিল্ড গান বসান ছিল। আমি খুব খোলাখুলিই বলছি, ডিনায়াল লাইনের এপারে কার্যকর প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ডিনায়াল লাইনের অন্য পারে অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা সমস্ত নৌকা সরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম সেখানে যে কোন মুহূর্তে জাপানীরা এসে যেতে পারত।"

পিনেলকে একাধিকবার সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। শেষের দুবার তিনি কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। পিনেলকে প্রশ্ন করা হয়—সে সময়ে (1942 সালে) বাঙলা প্রদেশে জাপানীদের পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপের কোন ঘটনা তাঁর জানা আছে কিনা। পিনেল বলেন: "আমি শুনেছি যখন আমরা ডিনায়াল এরিয়া থেকে সব নৌকা তুলে আনছি অর্থাৎ যখন ডিনায়াল এরিয়াতে চাষ বাসের জন্য টাকা লগ্নি করা একেবারেই নিরাপদ ছিল না, ঠিক সেই সময়ে কিছু ব্যবসায়ী ডিনায়াল এরিয়াতে পরের বছরের চাষের ফসলের জন্য চাষীদের প্রচুর টাকা দাদন দিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি শুনেছি সে টাকা বিদেশী উৎস থেকে এসেছিল। আমাদের অর্থনীতিকে তছ্নছ করে দেবার এই একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ছাড়া পঞ্চম বাহিনীর আর কোন কার্যকলাপের কথা আমি জানিনা।"

কোন্ ব্যবসায়ী বা কে এই দাদনের টাকা বিলি করেছিল? পিমেল তাঁর সাক্ষ্যে কারো নাম করেন নি। কিন্তু নাম বলে দিয়েছিলেন ম্যাক ইনেস তাঁর সাক্ষ্যে।

ম্যাক ইনেসের বাড়ি স্কটল্যাণ্ডে। যুদ্ধের আগে চট্টগ্রামে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বড় কর্তা ছিলেন ম্যাক ইনেস। 1943 সালের জানুয়ারিতে বাঙলা সরকার তাঁকে 'গ্রেন পারচেজিং অফিসার' এর পদে নিয়োগ করে। ছয় মাস এই পদে কাজ করে ম্যাক ইনেস বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। ম্যাক ইনেস বলেছেন: "ইস্পাহানি কোম্পানির এক প্রতিনিধি ছিল তখন চট্টগ্রামে। ডিনায়াল পলিসি কার্যকর করা হলে আমি জানতে পারি যে ইস্পাহানি কোম্পানি বাখরগঞ্জ এলাকায় চাষীদের টাকা দাদন দিচ্ছে। উদ্দেশ্য 1942 সালের শীতের ফসল সব কিনে নেওয়া। জাপানীরা তখন এগোচ্ছে। এরকম একটা সময়ে কোন ব্যবসায়ী, যে ফসলের বীজ তখনও মাটিতে, সেই ফসল কেনার জন্য দাদন দেবে, তা ভাবতেও পারা যায় না। তাছাড়া সেবার বিশেষত জুন-জুলাই মাসে, খুবই কম বৃষ্টি হয়েছিল। ইস্পাহানি বোধ হয় আশা করেছিল, যাই হোক না কেন সে তার ফসল চড়া দামে বেচতে পারবেই। তা না হলে কেউ ঐ অবস্থায় অত টাকার ঝুঁকি নেয় না। কেন সে এই ঝুঁকি নিয়েছিল? এর উত্তর আমার দেওয়ার কথা নয়।" পিমেল বলেছেন এদেশের অর্থনীতিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে জাপানী পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপের একটি মাত্র ঘটনা তাঁর জানা ছিল, সে হচ্ছে ডিনায়াল এরিয়াতে জাপানী আক্রমণের মুখে প্রচুর টাকা দাদন দেওয়া। ম্যাক ইনেস কমিশনকে বলে দিয়েছিলেন ইস্পাহানিই সেই দাদনদার। তখন বাঙলা শাসন করছে মুসলিম লীগ। ইস্পাহানিকে তৎকালীন সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাবর্দি চাল কেনার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিলেন। ইস্পাহানি বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলা থেকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নামে বেনামিতে চাল কিনে, কম মূল্য থেকে খেপে খেপে দাম বাড়াতে বাড়াতে সর্বোচ্চ দামে বাঙলা সরকারকে চাল বেচতো। ইস্পাহানির এই ব্যবসা নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হওয়ায় তদন্ত কমিশন ই. সি. প্রাইস্ এর নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠন করেন। প্রাইস কমিশন ইস্পাহানির ব্যবসার যে ভয়াবহ তথ্য পেশ করেছিল কমিশন তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। শ্রীমণিলাল নানাবতী ও শ্রীরামমূর্তি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন। মাত্র এক ভোটের জোরে কমিশন ইস্পাহানি কোম্পানিকে রেহাই দেবার সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নেয়। ইস্পাহানিকে কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। তিনি সাক্ষ্য দিয়ে ছিলেন। ইস্পাহানি বাঙলার শাসকদল মুসলিম লীগকে টাকা যোগাতেন। প্রকৃতপক্ষে ইস্পাহানিই ছিলেন বাঙলায় মুসলিম লীগের কর্ণধার। ইস্পাহানিকে লীগ এর সাংগঠনিক নেতৃত্বে নিয়ে আসার জন্য জিন্না সাহেবের কাছে নাজিমুদ্দিনের আবেদনের দলিল মহাফেজখানায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফাইলে রয়েছে।

ইস্পাহানি ছিলেন রাঘব বোয়াল। ক্ষমতাসীন দলের মদতের অভাব তাঁর ছিল না। তবে বিরোধী দলের মদতে পুষ্ট চালের বেনামদার ব্যবসায়ীর অভাবও সেদিন ছিল না। হিন্দু

মহাসভা বা কংগ্রেস ইস্পাহানিকে নিয়ে যতটা হৈ চৈ করেছিল এইচ. দত্তকে অথবা রণদা প্রসাদ সাহাকে নিয়ে ততটা করেনি। সাম্প্রদায়িকতা ছিল তখন রাজনীতির অন্যতম অস্ত্র। সরকারী এবং বিরোধী দলেরা সে অস্ত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে সমানভাবে ব্যবহার করতেন। এই এইচ. দত্ত সম্বন্ধে ম্যাক ইনেস তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, "ইস্পাহানি, রহমান বক্স, হোসেন করিম দাদা—এরা ছাড়াও তৃতীয় এজেন্ট ছিল এইচ. দত্ত। ......লোকে বলত চালের ব্যবসায় তিনি ছিলেন অনেক রাজনৈতিক নেতার বেনামদার। ...কলকাতায় থাকার সময় আমি যে সব রেকর্ড পড়েছি তাতে দেখেছি ডিনায়াল এরিয়া থেকে গবর্নমেন্টের টাকায় তিনি বেশ ভাল পরিমাণে চাল কিনেছিলেন, এবং তার হিসেব দিতে তিনি ব্যর্থ হন।" সমসাময়িককালে সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতির অন্যতম অস্ত্র হলেও, পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে ব্যবসায়ীরা পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্থোপার্জন ও মুনাফার পাহাড় খাড়া করেছিল, তাদের না ছিল কোন জাত, না ছিল তাদের কোন সম্প্রদায়। ফলে তারা হিন্দু না মুসলিম এ প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়—বিভ্রান্তিকরও বটে। পিনেলের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সাক্ষ্য ছিল অফ দ্য রেকর্ড উক্তি। নানাবতী অস্পষ্টভাবে এসব টুকে রেখেছিলেন। নানাবতী পেপারস্ এর 6 নম্বর ফাইলে সেই দলিলটি পাওয়া যাবে। নানাবতী লিখেছেন: "আজকের সেশনে পিনেলকে ডাকা হয়েছিল 1943 সালের গোড়ার দিকে যুদ্ধকালীন 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর জন্য কি পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করা হয়েছিল তা জানার জন্য।"

পিনেল সেদিন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন: "সে সময়ে সমস্যাটা ছিল এই ধরনের: হয় কলকাতা এবং কলকাতাকে ঘিরে 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর জন্য প্রচুর খাদ্য মজুত রাখো, অথবা খাদ্য গ্রামাঞ্চলে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। কলকাতাতে আমরা প্রচুর খাদ্য-মজুত করেছিলাম। স্বভাবতঃই এর অর্থ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য লোকের অনাহার-মৃত্যু। অন্যথায় শহরাঞ্চলে গোলমাল ও বিক্ষোভ শুরু হতো। দুদিকেই বিপদ। শহরে 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর মানুষজনকে খাইয়ে রাখতে না পারলে গোলমাল, দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে—গবর্নমেন্টের যুদ্ধ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে কয়েক শতাংশ লোক না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে মরবে। শেষপর্যন্ত শহরের খাবার যোগানটা ঠিক থাকুক এটাই আমরা স্থির করেছিলাম।" এই সাক্ষ্যের নির্গলিতার্থ হচ্ছে—দুর্ভিক্ষ যে হবে সেটা সরকার জানতো এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যার মানচিত্র ভেবে চিন্তেই তৈরি করা হয়েছিল।

টোটাল ওয়র বা সামগ্রিক যুদ্ধের চেহারাটা আলাদা। এযুদ্ধে সামরিক উপকরণের উৎপাদনের মধ্যে পিন্-আপ গার্লদের ছবি ছাপাবার ছাপাখানাও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং তা 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর আওতায় পড়ে। কলকাতাকে ঘিরে সেদিন ভারতে যুদ্ধ-শিল্পের প্রধান প্রধান অংশ গড়ে উঠেছিল। গম থেকে মদ, চালের খাদ্য থেকে আটা

তৈরির কারখানা থেকে ছোট বড় নানা প্রকার 'যুদ্ধশিল্প' সবই ছিল 'এসেনশিয়াল সার্ভিস'। 1944 সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এম. বর্মন। শ্রী বর্মন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন :

"কলকাতার জনসংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যের ভীড় ক্রমশ বাড়ছে। বৃটিশ অথবা মার্কিন সৈন্য তাদের সামরিক ক্যানটিনের র‍্যাশান পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণের জন্য হোটেলগুলিতে ভীড় করছে, গোগ্রাসে খাবার গিলছে। কিন্তু কলকাতায় সাধারণের ভোগের জন্য খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই নেই। কলকাতা কর্পোরেশন দাবি করেছিল শহরে র‍্যাশনিং চালু করা হোক এবং অন্য প্রদেশ থেকে কর্পোরেশনকে খাদ্য আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হোক। সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়।"

কলকাতায় বোমা বর্ষণের পর পিনেলের সঙ্গে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের একটি গোপন বৈঠক হয়। তখন বোমার ভয়ে কলকাতা জনশূন্য। পিনেল সেই সভায় মন্তব্য করেছিলেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কলকাতায় বোমা বর্ষণ আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।"

বর্মন সাহেব কমিশনের সামনে প্রাণ খুলে কথা বলেছিলেন। রেখে ঢেকে নয়। "খাদ্য সংকট ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছিল কিন্তু তা হলেও খাদ্য রপ্তানির অদৃশ্য খেলা বন্ধ হয়নি। কলকাতার বন্দরে যে কোন জাহাজ এসে ভিড়লেই তারা প্রায় একবছরের জন্য নিজেদের জাহাজের তো বটেই, এমন কি একই লাইনের অন্য জাহাজের জন্যও, খাদ্য-রসদ মজুত করে তবে বন্দর ছাড়ত। চিনি, ঘি, আটা, চালের এক বছরের রসদ তারা নিয়ে যেত। যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্প প্রকল্পের চাহিদা খাদ্যের মজুত শুষে নিত। মদ ও আঠা তৈরীর শিল্পে দানা শস্য ব্যবহৃত হত।" মদ তৈরীর জন্য যখন গমের অবাধ ব্যবহার চলছে তখন কলকাতার পথে হাজারে হাজারে গ্রামের মানুষ এসে মরছে না খেতে পেয়ে। সেই সব মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে না। কারণ কঠিন আইন। বৃটিশ শাসনের আইন অনুসারে বেওয়ারিশ মৃতদেহ কারো ছোঁয়ার অধিকার নেই। বর্মন সাহেব তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন—"মৃতদেহ ছোঁয়া পর্যন্ত যাবেনা। কারণ আইন বলে, বেওয়ারিশ লাশের এক মাত্র জিম্মাদার হচ্ছে পুলিস।"

কলকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত স্কুল দুর্ভিক্ষের সময় বন্ধ ছিল। স্কুলগুলিতে যথা সম্ভব দুর্গতদের আস্তানা করে দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর দীর্ঘকাল কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা শহরের কোন অধিবাসী কি অনাহারে মরেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরে? না মরেনি। নানাবতী খুব কমিশনে বিস্তৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন—"1943 সালে বাঙলা সরকারের হাতে মোট 202,000 টন খাদ্য এসেছিল। তার মধ্যে

140,000 টন কলকাতায় মজুত রাখা হয়েছিল। মাত্র 62,000 টন মফস্বলে পাঠানো হয়। .....গ্রামাঞ্চলে আরও খাদ্য পাঠানো হলে হয়তো দুর্গতদের জীবন বাঁচত। বৃহত্তর কলকাতার স্বার্থই ছিল সেদিন সরকারের কাছে সবচেয়ে বড়।.....বৃহত্তর কলকাতার একজন অধিবাসীও সেই মন্বন্তরে খাদ্যাভাবে মরেনি। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক কলকাতার পথে অনাহারে মরেছে গ্রাম ছেড়ে এসে।" যখন কলকাতার পথে হাজারে হাজারে লোক মরছে তখন শহরের বিশাল হোটেলগুলিতে খাবারের অভাব ছিল না। ঠিক সেই সময়ে বটানিক্যাল গার্ডেনস এ 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর জন্য মজুত চালের বস্তা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম দ্বিতীয় শহর বলা হত তখন কলকাতাকে। এইচ. বি. এল ব্রাউও তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন—"শিল্পাঞ্চলের অধিবাসী নিয়ে কলকাতার জনসংখ্যা তখন 40 লক্ষ। কলকাতাকে ঘিরে শহর ও শহরের বাইরে চতুর্দিকে ভারতের যুদ্ধ শিল্পের পঞ্চাশ শতাংশ গড়ে উঠেছে। এই সব শিল্পে যারা কাজ করত তাদের পরিবারের লোকদের সংখ্যা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল 10 লক্ষ। এদের একটা বিরাট অংশ এসেছিল বাংলার বাইরে থেকে। বৃহত্তর কলকাতার মুখের গ্রাস যোগান দিতে তখন প্রয়োজন হতো প্রতি মাসে 50 হাজার টন খাদ্য। এর মধ্যে চালের চাহিদা ছিল 30 হাজার টন।"

কলকাতার এই রাক্ষুসে সামরিক ক্ষুধা মেটানো ছিল ভারত ও বাঙলা সরকারের সেদিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যেই তৈরী হয়—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ফুড স্টাফ স্কিম। এই পরিকল্পনা অনুসারে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সকে সরকার থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বৃহত্তর কলকাতার বিরাট শ্রমবাহিনীকে খাইয়ে রাখার জন্য চাল কিনে মজুত করার। কলকাতা, হাওড়া, বজবজ, কাশীপুর, টিটাগড়, জগদ্দল, ভদ্রেশ্বর এবং চেতলা এই পাঁচটি জায়গায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অসংখ্য গুদামে এবং গুদামের অভাবে অনেক সময় খোলা জায়গায় এই চাল মজুত করা থাকত। 1943 সালে সারা বছর ধরে এই মজুত চাল থেকে প্রতিমাসে গড়ে 1,20,229 মন চাল বিভিন্ন কারখানায় এবং ব্যবসায়িক সংস্থায় সরবরাহ করা হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের শ্রমিক, কলকাতার মধ্যবিত্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কর্মচারী, এদের যখন খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার এই নিপুণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তখনই কলকাতার ফুটপাতে গ্রাম থেকে আসা মানুষ হাজারে হাজারে মরেছে। মৃত্যুর জের চলেছে আরও দীর্ঘদিন ধরে। 1943 সালের 31 ডিসেম্বর বেঙ্গল চেম্বার অব কর্মার্সের উপরোক্ত গুদামে চালের 'ক্লোজিং স্টক' এর পরিমাণ ছিল তখন 1,77,679 মন। অর্থাৎ চাল ছিল, কিন্তু তা কলকাতাকে খাওয়ানোর জন্য।[৬] ব্যবসায়ীরা যেমন করেছে, সরকারও তেমনি চাল মজুত করেছে। এ যেমন একটা দিক

তেমনি লক্ষ লক্ষ মন চাল ও আটা গুদামের অভাবে পচে গেছে এবং তারপর তা ফেলে দেওয়া হয়েছে কলকাতা ও হাওড়ায়।

"...অধ্যাপক হিল দেখেছেন 'বটানিকাল গার্ডেনস' এ চালের বস্তার পাহাড় খোলা আকাশের নিচে জলে ভিজে পচছে। ...শালকিয়ায়, মন্ত্রী বরদা প্রসন্ন পাইন-এর পতিত জমিতে লরি বোঝাই করে 12 হাজার মন পচা আটা ও চাল ফেলে দেওয়া হয়েছে। ...বটানিকাল গার্ডেনস্ থেকে 500 টন পচা চাল ফেলে দেওয়া হয়েছে"—কলকাতা রিলিফ কমিটির সাক্ষ্য।[6]

ডিনায়াল এরিয়া থেকে কত চাল কেড়ে আনা হয়েছিল? এবং সেই চাল কোন্ খাতে খরচ করা হয়েছিল? ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারত সচিবকে সেই চালের যে হিসেব দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল মাত্র 40 হাজার টনেরও কম চাল সংগৃহীত হয় ডিনায়াল এরিয়া থেকে এবং তা মূলত অন্যত্র বিতরণ করা হয়েছে।[7] স্বভাবেই হোক অথবা অভাবেই হোক লিনলিথগো মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে মন্ত্রী শ্রী পি এন ব্যানার্জী ডিনায়াল এরিয়া থেকে তুলে আনা শুধু চালেরই যে হিসেব দেন তা হচ্ছে মোট 4,76,000 টন। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গে বিতরণ করা হয়েছে মাত্র 86,848 টন এবং বন্যাত্রাণে গেছে 52,716 টন। বাকি 3,36,436 টনের মধ্যে সিংহলে চালান গিয়েছে 52,716 টন। বাদবাকি খেয়েছে কলকাতার আশে পাশে শিল্পাঞ্চলের মানুষ এবং সৈন্য বাহিনী।[8]

এ শুধু গ্রামকে মেরে শহরকে বাঁচানো নয়। বৃটিশ সরকারের নীতিই ছিল মন্বন্তরের ঝাপটাটা গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র, অসংগঠিত কৃষকের কাঁধে চাপিয়ে শহরে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের বাঁচিয়ে রাখা। কারণ গ্রামের মানুষ নাকি চিরকাল অনাহারে ও অনশনেই অভ্যস্ত। কিন্তু শহর সম্পর্কে সে ধরনের মনোভাব রাখলে চলবেনা। কারণ শহরগুলি বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় একএকটি বারুদের স্তূপের মত—এই ছিল লিনলিথগোর ব্যাখ্যা।

বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেছিল কমিশনের কাছে। তাতে বলা হয়েছে: "1943 সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যবসায়ীদের এক সভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের ফুড মেম্বার এন. আর. সরকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বলেন যে ভারত থেকে এক কণা খাদ্য শস্যও বিদেশে চালান দেওয়া হবে না—1943 সালের 14 আগস্ট চেম্বার অব কমার্স গুলির কাছে এক টেলিগ্রামে ভারত সরকার জানান। 1937—38 সালে ভারত থেকে খাদ্য রপ্তানি করা হয়েছিল 900,000 টন। 1941—42 সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল 55,000 টন। কিন্তু 1942—43 সালে রপ্তানি দাঁড়ায় 3,70,000 টন। এই 3 লক্ষ 70 হাজার টনের মধ্যে 1 লক্ষ 85 হাজার টন রপ্তানি করা হয় সিংহলে। .....সরকার স্বীকার করেন যে 1943 সালের প্রথম সাত মাসে কলকাতা থেকেই 727 টন চাল

জাহাজে চালান যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, 2,000 টন যায় পারস্য উপসাগরে। ...1942—43 সালে ভারত থেকে মোট যে চাল বিদেশে রপ্তানি করা হয় তার 60 শতাংশই যায় বাঙলা থেকে।"

দেখা যাচ্ছে, ভারতসরকার তার ঘোষিত নীতি কাজে মেনে চলেনি। ঘোষণাটা ছিল নিতান্তই প্রচারের উদ্দেশ্যে—বানানো কথা। খাদ্যশস্য রপ্তানী হবে না প্রচার করেও লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য বাইরে পাচার করা হয়েছে দেশবাসীকে উপবাসী রেখে। 1944 সালের 12 আগস্ট ভারত সরকারের মিউনিশন প্রডাকশনের ডাইরেক্টর জেনারেল—মেজর জেনারেল ই. উড তাঁর সাক্ষ্যে বলেন: "বাঙলা গবর্নমেন্ট প্রায়ই অভিযোগ করত যে কোন কোন কন্ট্রোল বাজারে তাদের উচ্চমূল্যে খাদ্য দিতে হত এবং সস্তা খাদ্য শস্যের দোকানেও তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, ফলে তাদের দারুণ আর্থিক ক্ষতি হয়। আমার কিন্তু এ ব্যাপারটায় ঘোরতর সন্দেহ ছিল। ......আমার হিসেবে আমরা যে দামে বাঙলা সরকারকে খাদ্য দিতাম তার উপরে 6 টাকা বেশি দাম চড়িয়ে সরকার তা বেচত। ফলে প্রতি মাসে বাঙলা সরকার লাভ করত 75 হাজার টাকার মত।"

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারি আর. এইচ. হাচিংস, কমিশনের সেক্রেটারি গোপাল স্বামীকে 1944 সালের 2 আগস্ট তারিখে এক চিঠিতে জানান: "গত 27 তারিখে আমি যখন কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিই তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে ভারত থেকে এখনও বিদেশে সৈন্য বাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য চালান যাচ্ছে কিনা। উত্তরে আমি বলেছিলাম —না যাচ্ছে না। কমিশনকে সেদিন আমি ভুল তথ্য দিয়েছিলাম। তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ইতালি ও মধ্য প্রাচ্যে এখনও সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য যাচ্ছে।"

উড সঙ্গে হাচিংস একটি সারণি পাঠান। তাতে দেখা যায় গম, আটা, চাল, ময়দা, ডাল, ঘি, চিনি সব মিলিয়ে 1943 সালে 1,01,340 টন খাদ্য বিদেশে সৈন্যদের জন্য পাঠানো হয় এবং 1944 সালের মার্চ পর্যন্ত সেই রপ্তানি অব্যাহত ছিল—পরিমাণ 59,133 টন।

কিরবি, হাচিংস, পিনেল, ম্যাক ইনেস, যে যার নিজের অপরাধ স্খালনের চেষ্টা করেছে তাদের সাক্ষ্যে। চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিরাও যে যার হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেছে। এদের কারো সাক্ষ্যেই মন্বন্তরের ভয়াবহ চেহারার বিবরণ নেই। তা থাকার কথাও নয়।

মন্বন্তরের সেই কঙ্কালসার ভয়াবহ চেহারার বিবরণ পাওয়া যায় টমাস ম্যানযোর ডেভিসের সাক্ষ্য থেকে। ফ্রেণ্ডস্ অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট-এর ভারতীয় শাখার পক্ষ থেকে ডেভিস মেদিনীপুরে যেখানে ঝাঁকি মহকুমায় ত্রাণ কার্য পরিচালনায় গিয়েছিলেন। ডেভিস তাঁর

সাক্ষ্যে বলেছেন : "কাঁথি মহকুমার সাধারণ অবস্থার দিনে দিনে অবনতি ঘটছে। কাঁথি শহরে, তার আশেপাশে, বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী রামনগর থেকে খাজুরি পর্যন্ত অনাহার ও রোগের প্রকোপ বাড়ছে। একদিন যারা 'কৃষক' নামে পরিচিত ছিল তাদের বর্তমান পরিচয় 'ভিক্ষুক'। এই ভিক্ষুকেরা সপরিবারে কাঁথি মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই কঙ্কালসার। কাঁথি থানার আশে পাশে খালগুলিতে পচা, গলা মৃতদেহ ভেসে চলেছে। পথের ধারে কুঁড়ে ঘর—সেখানেও পচছে মৃতদেহ। সৎকারের কোন ব্যবস্থা নেই। কাঁথি থেকে পানিপিয়া পর্যন্ত নৌকোয় যেতে যে দৃশ্য চোখে পড়েছে তা ভয়াবহ। দুর্গন্ধে পেটের ভাত অবধি উঠে আসে। ক্ষেতে মাঠে সর্বত্র পচা লাশের গন্ধ।"

সরকারি রিলিফ ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখে ডেভিসের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এই রকম : "স্থানীয় লোকদের হাতে লঙ্গরখানা চালানোর ভার দেওয়ার এই নীতির অর্থ হচ্ছে দুর্গতদের হাতেই দুর্গতদের দেখাশোনার ভার দেওয়া। লঙ্গরখানাগুলিতে পরিচ্ছন্নতার অভাব প্রকট। সুপরিচালনার কোন ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে প্রচণ্ড দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার। সরকার নির্দেশ দিয়েছেন গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার। এই নির্দেশের পিছনে দূরদৃষ্টি বলে কিছু নেই। গ্রামে দুর্গতদের কারো বাড়িতে এক সঙ্গে বহু লোকের রান্না করার মত বাসন-কোসন পাওয়া যায় না। লঙ্গরখানায় যারা খেতে আসবে রান্নার কাঠ তাদেরই জোগান দিতে হবে।

"কাঁথি শহরে সরকারের খয়রাতী লঙ্গরখানা বেশিদিন টিকল না। বিপুল সংখ্যায় 'ভিক্ষুকের' দল আসতে শুরু করল। শহরের আবর্জনা অপসারণের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠল। শহরের বাজার অত্যন্ত ছোট। সেখানে গড়ে প্রতিদিন পনেরটি মৃতদেহ দেখা যেত। পরে ঠিক হল 4 মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে এক একটি অঞ্চলে 6টি করে লঙ্গরখানা খোলা হবে যাতে লঙ্গরখানাগুলিতে 'ভিক্ষুকদের' ভিড়ের চাপ বেশি না পড়ে। কিন্তু এবারেও সরকারের ভাগ্য বিরূপ। দাউলিতে একটি ক্যানটিন চালু হয়। প্রথম দিনেই সেই ক্যানটিনে 23 জন দুর্গত মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ত্রাণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে। মফস্বল অঞ্চলে লঙ্গরখানা ব্যবস্থার এইসব সমস্যা ছাড়াও সমস্ত ব্যবস্থাটার মধ্যেই গলদ ছিল। বিশেষ করে যে খাদ্য বিতরণ করা হত তা ছিল একেবারেই অখাদ্য। এই সব লঙ্গরখানায় খিচুড়িতে চাল প্রায় থাকতই না। যেমিন কোডে যে চালের পরিমাণের বিধান আছে তার আটভাগের এক ভাগ চালও থাকত কিনা সন্দেহ। খিচুড়ির মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকত জোয়ার এবং শাক পাতা—যা সেই অবস্থায়, অনাহারক্লিষ্ট লোকদের পক্ষে খাওয়াও ছিল বিপদজনক। গবর্ণমেণ্ট যে খাদ্য দিত তার খাদ্যমূল্য জীবন ধারণের পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না।

"এই অঞ্চলে লঙ্গরখানার খাবারের চেয়ে বাঁচা খাদ্যের খয়রাতী সাহায্যই সকলে পছন্দ

করত। কারো বাড়িতে অনাহারে কেউ মরলে ঘটনা চেপে যেত বাড়ির লোকে—যাতে মৃতের প্রাপ্য খাদ্যটুকু থেকে তারা বঞ্চিত না হয়।"

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। গণ-সংগঠনের মধ্যে অসংখ্য ত্রাণ সংস্থা, মহিলা সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, পি. আর. সি. সাক্ষ্য দিয়েছেন অথবা স্মারকলিপি পেশ করেছেন, কমিশনের কাছে। সাক্ষ্য দিয়েছেন মন্ত্রী, সরকারি কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা। সরকারি পদস্থ অফিসারদের মধ্যে সম্ভবত দীর্ঘতম স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন জাস্টিস এইচ. বি. এল. ব্রাউন। পূর্বাঞ্চলের তিনি ছিলেন 'রিজিওনাল কমিশনার'।[৭]

সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশই তাঁদের সাক্ষ্যে স্বীকার করেন যে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট খাদ্যনীতি ছিল না। এবং খাদ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল তাকে প্রাগৈতিহাসিক বললে ভুল করা হবে না। ভারত সরকারের এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন অ্যাডভাইসর ডি. আর. শেঠি তাঁর সাক্ষ্যে কৃষি পরিসংখ্যান সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন: "গ্রামের চৌকিদার সপ্তাহে একদিন থানায় আসত। থানার ছোট দারোগা তাকে জিজ্ঞেস করতেন—"তোমার এলাকায় কত ধান হয়েছে?" চৌকিদারের অবধারিত উত্তর হতো—"গত সনের মতই।" দারোগা জিজ্ঞেস করত—"কিন্তু কত?" উত্তর—"দশ আনার মত।" সেই হিসেব তারপর যেতো মহকুমা হাকিমের অফিসে। সেখানে কেরানিবাবু যদি দেখতেন গত কয়েক বছরের হিসেবের থেকে বর্তমান হিসেবে বড় রকম হেরফের হচ্ছে তাহলে তিনি বলতেন—"আগাগোড়া ভুল।" এরপর তিনি গত কয়েক বছরের ফলনের গড় পড়তা হিসেব কষে যে সংখ্যা পেতেন তাই সে বছরের ফলনের হিসেব বলে লিখে রাখতেন। সেই হিসেব সেখান থেকে কলেকটরের অফিসে গেলে সে অফিসের কেরানিবাবু আবার দরকার হলে একই রকম ভাবে সংশোধন করে পাঠাতেন। সেই পরিসংখ্যান তারপর যখন কৃষি বিভাগের ডাইরেকটরের কাছে যেতো, তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকতো না তখন।"

অধিকাংশ সাক্ষ্যই একটি কথার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে যে ভারত দীর্ঘকাল ধরে খাদ্য-ঘাটতি দেশ। এক নিঃশব্দ দুর্ভিক্ষ ভারতের গ্রামাঞ্চলে চিরস্থায়ী হয়ে ছিল। এই অবস্থাতেও ভারত যেমন খাদ্য আমদানি করত, তেমনি চাল রপ্তানিও করত বিদেশে। যুদ্ধ এবং পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারতের এই দুর্বল খাদ্য অর্থনীতির ভারসাম্য উল্টে দেয়। এমনটা যে হবে তা ভারতে ইংরেজ শাসকদের আগে থেকে বোঝা এবং বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ঘোর মুৎসুদ্দী অংশের উপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বোঝা বর্ধিত [illegible] থাকে

ঘাটতি যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডে না খেতে পেয়ে লোক মরেনি। কিন্তু বাঙলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে 35 লক্ষ লোক মরেছে। শুধু মরেছে তাই নয়, এই মন্বন্তর বাঙলার সমাজ ও অর্থনীতিকে আমূল উপড়ে ফেলেছে। সেই ছিন্নমূলের দায়ভাগ আজও আমরা বহন করে চলেছি। নানাবতীর দলিল উচ্চকণ্ঠে সাক্ষ্য দেয়—বাঙলার মন্বন্তরের জন্য দায়ী যুদ্ধের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সুপরিকল্পিত লুণ্ঠন ও কৃষক হত্যার নীতি, বেপরোয়া চোরা-কারবার ও মজুতদারি।

গ্রাম বাঙলার অসংগঠিত দুর্বল কৃষক সেদিন না খেতে পেয়ে মরেছে কিন্তু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারেনি। সংগঠিত প্রতিরোধের মত শারীরিক অথবা মানসিক অবস্থা তাদের ছিল না, আর ছিল না সেই চেতনা, যে চেতনা মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে শেখায়, শেখায় দাবী আদায় করতে।

বাঙলার কৃষক এই অভাব পূরণ করে নিয়েছিল মন্বন্তরের পর তিন বছরের মধ্যে। সমগ্র বাঙলা জুড়ে তেভাগার লড়াই জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যে মন্বন্তরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার পাঠও গ্রহণ করেছে তারা। ইতিহাসে প্রত্যেক সর্বনাশই সম্ভবত ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলময় কিছু সঙ্গে করে আনে।

তথ্য সূত্র :

1. পিপলস্ রিলিফ কমিটির স্মারকলিপি—নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 4
2. চার্চিলের কাছে ওয়াভেলের টেলিগ্রাম—9 ফেব্রুয়ারি, 1944—ট্রান্সফার অব পাওয়ার—খণ্ড 4, পৃ: 707 ; মানসার্জ সম্পাদিত : লণ্ডন।
3. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার স্মারকলিপি : নানাবতী দলিল : খণ্ড 1, পৃঃ 135
4. ট্রান্সফার অব পাওয়ার : মানসার্জ সম্পাদিত : খণ্ড 4, পৃঃ 765
5. নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 321
6. নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 74
7. ট্রান্সফার অব পাওয়ার : মানসার্জ সম্পাদিত : খণ্ড 4
8. নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 289
9. নানাবতী দলিল—5 নম্বর ফাইল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :-

বাংলা -

১। আখতার, শিরীণ : 'বাংলাদেশের - তিনজন ঔপন্যাসিক' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

২। আলী, ইদ্রিস মুহম্মদ :'বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫।

৩। কায়সার, রফিক : 'কয়ল পুরাণ', প্যাপিরাস প্রেস, ঢাকা, ১৯৮১।

৪। ঘোষ, উত্তম :'সুবোধ ঘোষ বড় বিস্ময় জাগে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।

৫। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : 'বিভূতিভূষণ জীবন ও সাহিত্য', সাহিত্যায়ন, কলকাতা, ১৯৯৫।

৬। চৌধুরী, নাজমা জেসমিন, 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৩।

৭। চৌধুরী, নারায়ণ :'মানিক সাহিত্য সমীক্ষা,' পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮১।

৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ :'ইতিহাস', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬৮।

৯। দাশগুপ্ত, রণেশ : 'উপন্যাসের শিল্পরূপ', কালি কলম প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৩।

১০। ধর, অমিয় : 'গোপাল হালদার জীবন ও সাহিত্য', অতএব প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯২।

১১। ফারুকী, রশীদ আল : 'বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান', রত্না প্রকাশন, কলকাতা ১৯৮৩।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর : 'আমার সাহিত্য জীবন', আকাদেমী সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৭।

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপশ্রী ও বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা 'বাংলায় মন্বন্তর', এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৮৪।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : 'লেখকের কথা', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৪ ।

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা ১৯৭৩ ।

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরিৎ : 'আমার পিতা তারাশঙ্কর', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৯৮ ।

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : 'দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫ ।

১৮। বসু, ড· নিতাই : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা' দে বুক স্টোর, কলকাতা ১৯৭৮ ।

১৯। তদেব, 'তারাশঙ্করের শিল্পি মানস', দে'জ, কলকাতা, ১৩৯৫ ।

২০। বিশ্বাস, ড· সৌরেন : 'বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০ ।

২১। ভট্টাচার্য, অরূপকুমার : 'সাম্প্রতিকতা ও বাংলা উপন্যাস', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৩৯৮ ।

২২। ভট্টাচার্য, জগদীশ : 'আমার কালের কয়েকজন কথা শিল্পী', ভারবি, কলকাতা ১৯৯৪ ।

২৩। ভট্টাচার্য, সুতপা : 'কথা সাহিত্যের একলা পথিক, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৫ ।

২৪। 'ভারতকোষ' (চতুর্থ খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৭৩ ।

২৫। ভূইয়া, ইকবাল : 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজ চিত্র'(১৯৪৭-৭১) বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১ ।

২৬। মজুমদার, সমরেশ : 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর'(১৯২৩-৪৭) রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৬ ।

২৭। মজুমদার, মানস : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা ছোটগল্প', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪ ।

২৮। মিত্র, সরোজ মোহন : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮৯ ।

২৯। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর (১৯২৩-৮২), দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯১ ।

৩০। তদেব : 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৭ ।

৩১। মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪ ।

৩২। মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : 'প্রাক-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭) কে·পি·বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৮২ ।

৩৩। রায়, সুপ্রকাশ : 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', বুক ওয়ার্ল্ড, তৃতীয় নতুন সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৩ ।

৩৪। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮৬ ।

৩৫। তদেব : 'বিভূতিভূষণ' মন ও শিল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৮

৩৬। তদেব : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি' জি·এ·ই· পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮৭ ।

৩৭। রায়চৌধুরী, ড· বিনতা : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্য-লোক, কলকাতা, ১৯৯৭ ।

৩৮। সিকদার, অশ্রুকুমার : 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৩ ।

৩৯। সুর, নিখিল : 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮২ ।

৪০। হক, হাসান আজিজুল : 'কথা সাহিত্যের কথকতা', 'একুশে' সংস্করণ, কলকাতা ১৯৮৯ ।

৪১। হাই, মোহাম্মদ আবদুল ও আহসান আলী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' আধুনিক যুগ) আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮২।

৪২। হালদার, গোপাল : 'রূপনারানের কূলে' (প্রথম খণ্ড), পুঁথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২।

৪৩। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

১। গোস্বামী, পরিমল : 'মহা মন্বন্তর' (গল্পসংগ্রহ), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪

২। চৌধুরী, বেলাল : 'লঙ্গরখানা (গল্প সংগ্রহ', পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৪

৩। নাসরিন, তসলিমা : 'ফ্যান দাও (কবিতা সংকলন)', পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৪।

৪। শ্রীপান্থ : 'দায়' (চিত্র সংকলন)', পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৪

সহায়ক পত্রিকা :

১। 'অতএব চেতনা', কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ১৯৯২।

২। 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, বর্ষা ১৩৯৬।

৩। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', কলকাতা, ১৩৫৩।

৪। 'উত্তরাধিকার', রায়গঞ্জ, ষষ্ঠবর্ষ চতুর্থ - সপ্তমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭।

৫। 'দেশ', কলকাতা, ১৩৫০-১৩৫১।

৬। 'নন্দন', কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৭।

৭। 'পরিক্রমা', ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫।

৮। 'পরিচয়', কলকাতা, ১৩৫০-১৩৫২।

৯। 'বাংলা কথা সাহিত্যে মন্বন্তর', বৈশাখ ১৪০৩।

১০। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৪।

১১। 'সংস্কৃতি ও সমাজ', কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৮।

১২। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭।

সহায়ক গ্রন্থ :-

ইংরেজী -

1. Ayakroyad, W.R. : 'The Conquest of Famine', Chatto and Windus, London, 1974.

2. Bhatia, B.M. : 'Famines in India', 1860-1965 2nd Ed., Bombay, 1967.

3. 'Encyclopedia Britannica', Vol.4, William - Benton, Chicago, 1974.

4. Ghosh, Kalicharan : 'Famines in Bengal 1770 - 1943' Indian Associated Publishing Co. Ltd. Calcutta, 1944.

5. Greenough, Paul, R. : Prosperity and misery in Modern Bengal, The Famine of 1943-1944. Oxford University Press, 1982.

6. Hunter, W.W. : 'The Annals of Rural Bengal', London, 1868.

7. Ravallion, Martin : Markets and Famines, Clardon Press, Oxford 1987

8. Sen, Amartya : 'Political Economy of hunger' Vol-I (Ed. by Jean Dreze and Amartya Sen), Clardon, Oxford, 1990.

9. Ibid : Poverty and Famines, 'An essay on entitlement and deprivation' Oxford University Press, Delhi, 1982.

সহায়ক ইংরেজী পত্রিকা :

1. The Amrita Bazar - 1942-44.

2. The Hindustan Standard - 1943-44.

3. The Statesman - 1943-44.

1. Famine Inquiry Commission, 1944, Report on Bengal, Government of India, Delhi - 1945.

2. Report of Great Famine of 1769-1770, Great Britain India Office, India, 1869.